শ্রীউপদেশ

চতুর্থ খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগৎগুরু
শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউপদেশ

(চতুর্থ খণ্ড)

অনন্তশ্রীবিভূষিত ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্ববরেণ্য জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের

পদ্মমুখের হরিকথামৃত

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ নদীয়া

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের তৃপ্তির জন্য ও তাঁর অহৈতুক কৃপায় শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে শ্রীভক্তি তিলক নিরীহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীগৌরাব্দ ৫৩৫, বঙ্গাব্দ ১৪২৬, খৃষ্টাব্দ ২০২০।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-বিশ্বপ্রচারক জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

বর্ত্তমান-সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

মূলমঠ :

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩০২
ফোন: ৯৭৩২১১৩২৮৫
Web: SCSMathInternational.com
Email: info@scsmathinternational.com

মুদ্রণ :

Giri Print Service, 91-A, Baithakkhana Road,
কলকাতা ৭০০০০৯

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুখবন্ধ

পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুপাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বর্তমান সভাপতি আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত বাণী ইতিমধ্যে শ্রীউপদেশ প্রথম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন উৎসবে ও গ্রামেগঞ্জে প্রচারে তাঁহার সঙ্গলাভ করার সুযোগ এই অধমের হয়েছে। তাই তিনি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক ও বিশ্বব্যাপী শ্রীভক্তি সিদ্ধান্তবাণী প্রচার সংস্থাপক আচার্য্য ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত গোস্বামী ঠাকুরের বিভিন্ন উপদেশাবলী ও শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের হরিকথামৃত ও মদীয় শ্রী পরম গুরুদেব শ্রীমঠের সেবায়েত আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজের হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সকল বিভিন্ন সভায় আলোকপাত করেছেন।

আজ শ্রী গৌরপূর্ণিমা তিথি—কৃপাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস। আমার মত অবিদ্যাগ্রস্ত জীব এই পরমমঙ্গলময়ী মুক্তি-স্বরূপিনী তিথির আরাধনা করে আত্মশোধনের অভিলাষ করে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মুখনিঃসৃত বাণী "শ্রী উপদেশ" ৪র্থ খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এই রকম একটি গ্রন্থে বহু পারমার্থিক মঙ্গলের সমাধান পাওয়া যাইবে। পারমার্থিক লাভেচ্ছু পাঠকগণ তাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্তির অনেক তুষ্টি ও পুষ্টি অবশ্যই লাভ করিবেন।

অদোষদরশী পাঠকবৃন্দ! আমার প্রকাশনায় অযোগ্যতা এবং পরম করুণায় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভক্তবৃন্দের সেবার প্রতি আসক্তির অভাব বশতঃ যে সমস্ত ভুল ত্রুটি এই গ্রন্থকে মলিন করেছে তাঁর জন্য আমাদের ক্ষমা করে কৃপা করবেন—এই প্রার্থনা। ইতি—

বিনীত দীনাধাম
প্রকাশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের প্রণাম মন্ত্র

পূজ্য-শ্রীগুরুবর্গ-বন্দিত-মহাভাবান্বিতায়া সদা
পৌর্বাপর্য্য পরম্পরা-প্রচলিত-প্রাজ্য প্রমূর্ত্তাকৃতেঃ।
ভক্তের্নির্ম্মল-নির্ঝরস্য নিভৃতং সংরক্ষকং সাদরম্
বন্দে শ্রীগুরুদেবম্ আনত-শিরা আচার্য্য-বর্য্যং নিজম্॥

অনুবাদ :— পূজনীয় শ্রীগুরুবর্গ-কর্ত্তৃক বন্দিত মহাভাব সমন্বিত রূপানুগ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত প্রভূত প্রমূর্ত্ত দিব্যাকৃতি ভক্তির নির্ম্মল ধারাকে নিভৃতভাবে সাদরে রক্ষণকারী আচার্য্যবর্য্য নিজ গুরুদেবকে অবনত মস্তকে বন্দনা করি।

প্রেরকং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-শিষ্যানাং ভক্তি-বর্ত্মনি।
ভক্তি-নির্ম্মলমাচার্য্য-স্বামিনং প্রণমাম্যহম্॥

অনুবাদ :— প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী শিষ্যগণকে ভক্তিপথে প্রেরণকারী পরমপূজনীয় স্বামী ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকে আমি প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের সহিত
শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

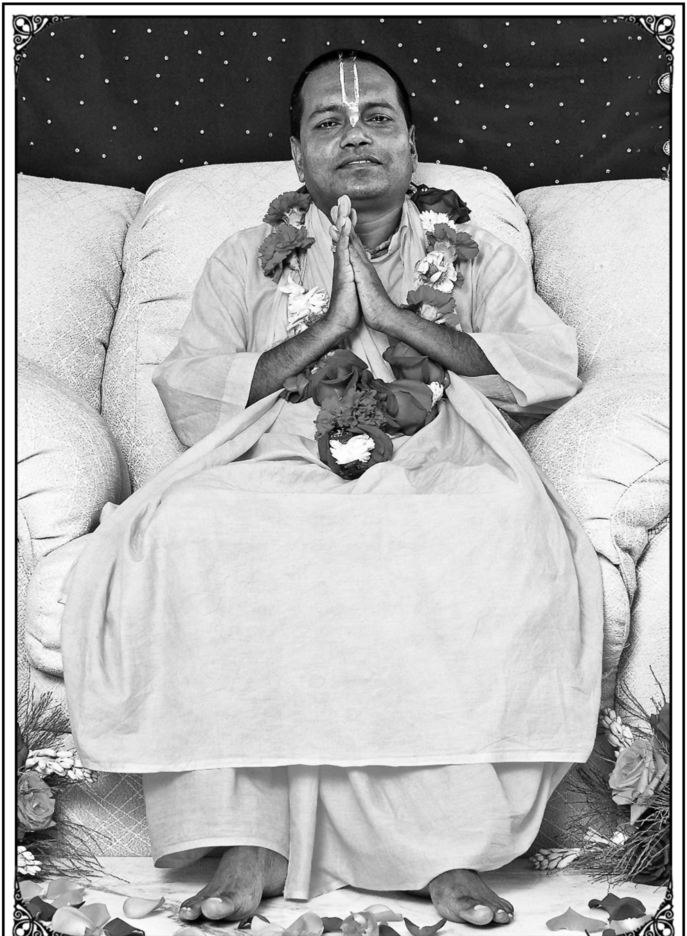

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

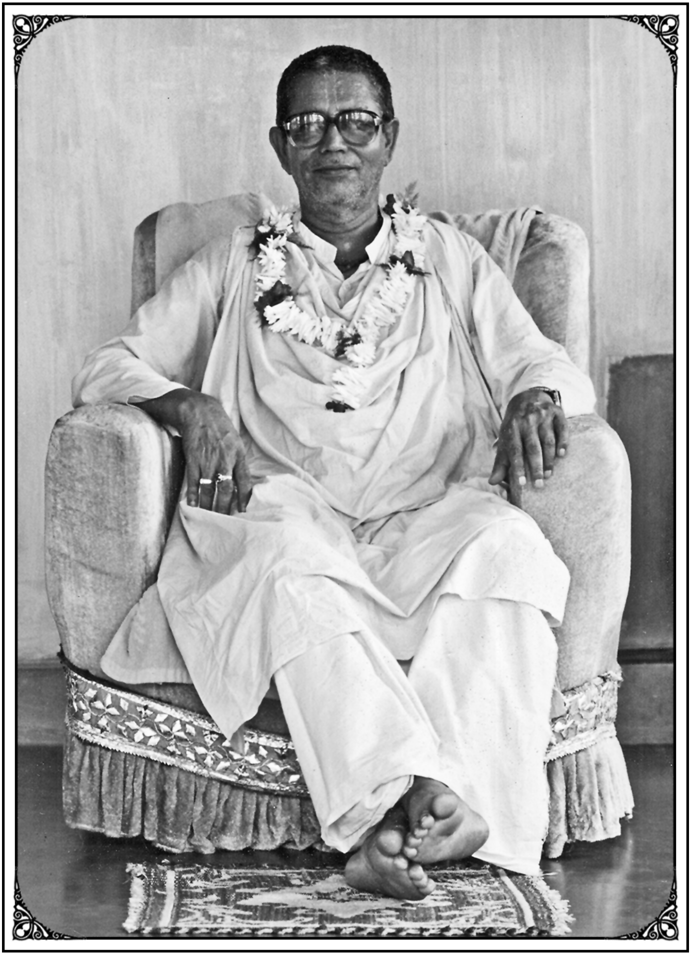

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যভাস্কর-শ্রীরূপানুগপ্রবর

আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
↓
শ্রীব্রহ্মা
↓
শ্রীনারদ
↓
শ্রীব্যাসদেব
↓
শ্রীমধ্বাচার্য্য
↓
শ্রীপদ্মনাভ
↓
শ্রীনৃহরি
↓
শ্রীমাধব
↓
শ্রীঅক্ষোভ্য
↓
শ্রীজয়তীর্থ
↓
শ্রীজ্ঞানসিন্ধু
↓
শ্রীদয়ানিধি
↓
শ্রীবিদ্যানিধি
↓
শ্রীরাজেন্দ্র
↓
শ্রীজয়ধর্ম
↓
শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ
↓
শ্রীব্যাসতীর্থ
↓
শ্রীলক্ষ্মীপতি
↓

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী
(শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত)
↓
শ্রীঈশ্বরপুরী
↓
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
↓
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি
↓
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
↓
শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর
↓
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
↓
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
↓
শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর
↓
শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ
↓
শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজের

উপদেশাবলী

কীর্তনমার্গে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা সর্বোত্তম

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীল গুরুদেবকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন,—তোমার সুকণ্ঠ আছে, কীর্তনে মিষ্টতা আছে, কিন্তু এতে প্রাণ আনা চাই। কীর্তনে যদি প্রাণ ঢেলে দিতে পার, তা'হলে মংগল অনিবার্য। প্রাণের সঙ্গে তাঁর সুখের জন্য কীর্তণ ক'রলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বড় সুখী হন। তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তোমাদের এই ঠাকুর বড় উদার; বড় করুণাময়, ইনি 'শ্রীগান্ধার্ব্বিকা গোবিন্দসুন্দর' নাম ধারণ করে এখানে বসে আছেন। কত লোককে করুণা বিতরণ ক'রছেন, কত লোককে আকর্ষণ করে আন্‌ছেন। কত লোকের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। কত লোক তাঁর অপূর্ব মধুর ও মোহন রূপ দেখে মন্দিরের সামনে তন্ময় হ'য়ে বসে থাকে। তাঁর জ্যোতির্ময় রূপচ্ছটায় তাদের হৃদয় আলোকিত হ'য়ে উঠে।

শ্রীগোবিন্দজীর সেবা কীর্তন মার্গে সব থেকে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কীর্তন তিন রকম। খোল-করতাল-সহযোগে কীর্তন হয়, বহুজন মিলিত হয়ে তাঁর সুখকর কীর্তন করা হয়; —এই ধরণের কীর্তন প্রচলিত আছে, সকলে ইহা বুঝতে পারে, বক্তৃতা দিলেও কীর্তন হয়। বক্তৃতার দ্বারা, পাঠের দ্বারা তাঁর মনোমুগ্ধকর কীর্তন হয়। যাঁরা বক্তৃতার দ্বারা তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা-পরিকরাদি কীর্তন ক'রছেন, তাঁরাও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন বা সেবা ক'রছেন। আর যাঁরা Prees এর মাধ্যমে শ্রীভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত করে "বৃহদ্ মৃদংগ" পরিচালন ক'রছেন; তাঁরাও তাঁর কীর্তন ক'রছেন। খোল-করতাল-যোগে কীর্তন একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 'বৃহদ্ মৃদংগে'র কীর্তনে বহু দেশে

বহু স্থানে তাঁর কথা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতা দিয়ে ও বৃহদ্ মৃদংগের কীর্তন এত বেশী করেছেন; যার ফলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে—এমন কি বিদেশেও ছড়িয়ে গেছে। তাঁর প্রাণের ঠাকুরের কীর্তনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ কীর্তনমার্গে তাঁর উপাসনা ক'রেছেন—সমস্ত প্রাণ দিয়ে। শ্রীল প্রভুপাদ যে কত করুণাময়, কত দয়াল! শ্রীল প্রভুপাদ কি রকম লেখনী চালিয়েছেন! শ্রীল প্রভুপাদ এই দুই রকমের কীর্তন ছাড়াও কদাচিৎ কখনও গান করে কীর্তন ক'রতেন। সুর, তাল হয়ত থাকতো না। তাঁর এ ধরণের কীর্তন তাঁর সময়ে বেশী লোক শোনে নি। এখন যাঁরা আছেন—তাঁদের মধ্যেও খুব অল্প লোকই তাঁর গান শুনেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয়জন ছাড়া এ ধরণের কীর্তন বেশী কেউ শোনে নি। এই বলে শ্রীল গুরু-মহারাজ অশ্রু-উদ্গত চিত্তে ভাবাবেশে ক্রন্দন করেন। কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দজী জাগ্রত।

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৩২)

সুমেধাগণ, ভজনাচতুরগণ, কৌশলীগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা কীর্তন-দ্বারাই করে থাকেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সংস্কৃত-ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা ও স্তবাদি রচনা ক'রে তাঁর উপাসনা করেছেন এবং ভক্ত-সাধকদের জন্য এই ভজন-পথের সন্ধান দান করেছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ গ্রন্থাদি রচনা করে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন করেছেন। এঁদের আবির্ভাবের পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারার আবির্ভাব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ অপূর্বভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রচুরভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করেছেন—"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে"। অন্যান্য জায়গায় অনেক গুরু দেখা যায়; কিন্তু এমনভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবাসুখ-রচনা কোথাও দেখা যায় না। শ্রীল

প্রভুপাদের কীর্তনে মুগ্ধ হয়ে শ্রীশ্রীগোবিন্দসুন্দর জীউ এখানে আর্বির্ভূত হয়ে অবস্থান ক'রছেন।

অর্চন মার্গে তাঁর সেবা-ঔজ্জ্বল্যের নিদর্শন

অর্চন-মার্গে তাঁর সেবা হয় না—তা নয়। তাঁকে ভাল ভাল খাদ্য খাওয়ালে, ভাল ভাল পোষাক পরালে, ভাল ভাল অলংকার দিয়ে সাজালে তিনি খুশী হন। কিন্তু অর্চন-মার্গ থেকে গৌড়ীয়গণের কীর্তন-মার্গের উপাসনায় তিনি বেশী খুশী হন। শ্রীমান প্রভু শ্রীগোবিন্দসুন্দর জীউর সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুরের সেবা এত বৃদ্ধ বয়সে, মাজা ভাঙ্গা নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সেবায় তাঁর কি উৎসাহ—এই সেবা তাঁর প্রাণ। তাঁর সুন্দর সুন্দর খাবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গ্রহণ ক'রছেন। তিনি খেয়ে খুব খুশী হ'ন। তাঁর সেবাপ্রাণতায় মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর তাঁর সেবা গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ ও ধন্য ক'রেছেন। তাঁর কোনরকম ময়লা নেই। ভিতরটা একেবারে পরিষ্কার। কত লোকে তাঁকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে, কত লোক তাঁকে ধম্‌কায়—আমাকে এতটুকু দুধ দিলেন—কত লোক তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে। কিন্তু শ্রীমান প্রভুর মত বৈষ্ণব খুব কম আছে। তাঁকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়। তাঁকে আমার বড় ভাল লাগে। এই সব নিন্দা-প্রশংসা তাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। তিনি তাঁর হৃদয়ের প্রীতি দিয়ে প্রাণের ঠাকুরের সেবা করে চলেছেন—এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেবায় শৈথিল্য নেই। কি সুন্দর! কি মহান্‌!—এই বলে শ্রীল গুরু-মহারাজ আবার প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন।

অর্চনের চেয়ে কীর্তন-মার্গের উপাসনায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অত্যাধিক উল্লাস

অর্চনের চেয়ে কীর্তন-মার্গের উপাসনায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বড় খুশী হন। অনেকে লোকদেখানো কীর্তন করে থাকে, কিন্তু তাতে বিশেষ মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নেই। শ্রোতা থাকলে পাঠে, বক্তৃতায়' কীর্তনে

ও নৃত্যে উল্লাস হয়। এঁদের প্রেমাস্পদের সুখ-চিন্তার অভাব। কেউ থাক বা না থাক্—ঠাকুর ত শুন্ছেন। তিনি প্রিয়শ্রবা, সুতশ্রবা। যাঁরা তাঁর সুখের দিকে লক্ষ্য করে কীর্তন করেন, তাঁরা সব থেকে লাভবান হন্। কেউ না থাকলে বরং খুব ভাল। কারণ তাঁর প্রিয়তম একা আছেন। যেমন স্ত্রী স্বামীকে সেবা করে। সেই সেবা কি লোক দেখিয়ে করে ? দেখ হে দেখ, আমি কিভাবে স্বামীর সেবা করি, তোমরা দেখ। সতী বা সাধ্বী স্ত্রী কখনও এরূপ করে না। ঠিক সেইরকম যাঁরা যথার্থ প্রেমিক সেবক, তাঁরা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করেন লোককে শোনাবার জন্য নয়, লোককে দেখাবার জন্য নয়। আমরা শ্রীহরিনাম করি। তিনি তো শোনেন। কাউকে দেখিয়ে দেখিয়ে ত হরিনাম করি না। তেমনি পাঠ করবো, কীর্তন করবো, নৃত্য করবো—তাঁকে শোনাবো। এর ফল দ্রুত, অনিবার্য। ইহা ধ্রুব সত্য। যার যে যোগ্যতা আছে, সেই যোগ্যতা দিয়ে তাঁর সেবা ক'রলে খুব তাড়াতাড়ি ভক্তি-পথে উন্নতি লাভ করা যায়। কেউ ভিক্ষা করতে পারে। "দুটো টাকা দাও ত ভগবানের সেবা করবো।" এতে ভগবান্ খুশী হন। আর কেউ বা টাকা আনে, কিন্তু সেবার টাকা নিজের জন্য রেখে দেয়—এতে অমঙ্গলের উদয় হয়। প্রাণের প্রীতিরস মাখিয়ে সেবা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া দরকার। অনেক প্রভু আছে দিন নেই, রাত নেই—তিনি সেবা করে জীবনের সার্থকতা লাভ করে গেছেন। কেউ যাক্ বা না যাক্—তিনি একাকী রাত্রি ১০টা নেই, ১২টা নেই সেবা করে যাচ্ছেন। কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীমান প্রভু সকালে কীর্তন করেন— কেউ যাক্ বা না যাক্—তিনি কীর্তন করে যাচ্ছেন। কেউ যায় ভাল, না যায় তাতে কিছু ক্ষতি নেই, তিনি তাঁর প্রভুকে কীর্তন শুনিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বল্তেন,—"কেউ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন বা সেবা করুক বা না করুক—আমি ত তাঁর সেবা করে যাই।"

শ্রীমান প্রভু এত ভোগাদি রান্না করে ঠাকুরকে খাওয়ান; কিন্তু তিনি নিজে সেই প্রসাদ একটুকুও গ্রহণ করেন না। শ্রীমান প্রভু

সকলকে প্রসাদ বিতরণ করে দিতে বলেন। তিনি সকলকে তা দেন। কিন্তু নিজে এতটুকুও গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন,— "আমার লোভ হয়ে যাবে।" তিনি কত বড় বৈষ্ণব! এই কথার দ্বারা তোমরা বুঝ্‌তে পারবে।

—❖—

হরিভজনে সুদৃঢ়সংকল্পই অগ্রগতির উপায়

আজকে সকালে শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীপাদ প্রভুকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন,— তোমাকে জীবনের সন্ধিক্ষণে টান দিয়েছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটি wrong decision (ভুল সিদ্ধান্ত) করার জন্য তোমার পারমার্থিক জীবন প্রায় নষ্ট হ'তে বসেছে। সেই সময় যদি সাড়া দিতে অর্থাৎ কর্তব্যবোধ তুচ্ছ করে আসতে পারতে, তাহ'লে জীবন অন্য turn (গতি) নিতে পারতো। তোমার মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে মায়া-রাক্ষসী। মা হ'য়েও মাংস খায়, ছেলের রক্ত খায়। তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হ'চ্ছে, এদিকে পুত্র-কন্যা বাড়্‌ছে। এতে সংসার-বন্ধন আরও ঘনিয়ে উঠ্‌ছে। তুমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছু কথা শুনেছ। তাই পাকা বিষয়ীর মত সংসার-সুখ ভোগ করতে পারছ না। আবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাও ছেড়ে দিলে কোনটাতে পুরোপুরি ডুবতে পারবে না।

শ্রীপাদ প্রভুর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন,—শ্রীহরিভজন করার জন্য বিরাট ভাগ্য চাই। অল্পভাগ্যে শ্রীভগবানের ভজন করা যায় না। মঠে এসেও অনেক লোক ভজন ছেড়ে চলে যায়। তাতে বোঝা যায় যে, তাদের বিরাট ভাগ্যের অভাব। মঠের ভিতরে অনেক সময় দুর্ব্যবহার, গঞ্জনা, অপমান, লাথি, ঝাঁটা, আহারাদি না দেওয়া প্রভৃতি— অস্বস্তিকর, অশান্তিময়-পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেই সময় তাতে বিচলিত হ'য়ে অনেকে ভজন ছেড়ে দেয়। তাদের দৃঢ়শ্রদ্ধা হয়নি বুঝতে হবে। যত রকম দুর্ব্যবহার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান আসুক না কেন— 'ম্যায়

ছোড়ুংগা নেহি।' তোমার পাদপদ্মকে ধরেছি ঠাকুর, তোমার সেবা ছাড়বো না। যা আসে আসুক, খেতে না পাই অপমান আসুক, কিছুতেই তোমার ভজন ছাড়বো না। গুরুগৃহে এসেছি, আর যাবো কোথায়? এখানে শ্রীল গুরু-মহারাজ তাঁর মঠ-জীবনের প্রাথমিক অবস্থার কথা বল্লেন,—'আমি যখন মঠে আসি', তখন কেউ কেউ আমার অসম্মান করেছে, খেতে দেয় নি। আমি বরাবর রুই-কাতলার দলে ছিলাম। এই রুই-কাতলাকে পর্যন্ত টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে; তবু ত আমি মঠ ছেড়ে দিই নি। যা হবে হোক, তোমার সেবা ছাড়বো না প্রভু।' প্রথম থেকে এই ভাব, এই determination (দৃঢ় সংকল্প) ছিল। তাই এই সমস্ত দুর্ব্যবহার আমায় কিছু করতে পারে নি। বাহিরের এই সব শত্রুর থেকেও অন্তরের শত্রু আরও প্রবল। অন্তরের শত্রু হলো অশ্রদ্ধা, সেবা-শৈথিল্য। দূর ছাই—মঠে থেকে ত দেখ্‌লাম—কিছু লাভ তো হলো না—এখন যাই আবার সংসার করি। এখানের মজা ত দেখ্‌লাম। বিয়ে-টিয়ে করে সংসারের মজাটা একবার দেখি। চিড়িয়াখানায় কত প্রকার জীবইত দেখ্‌লাম। কতকগুলি জীব বিয়ে করে আসে; কিন্তু এখানে অসুবিধা দেখে আবার সেই সংসারে চলে যায়। আবার কতকগুলি জীব অল্পবয়সে আসে, কিছুদিন মঠে থেকে বিয়ে করার মন হয়। বাড়ী গিয়ে বিয়ে করে আবার সংসারে ডুবে যায়। চিড়িয়াখানায় যেমন সব রকম পাখী কিচির-মিচির করে, বানর যেমন দাঁত খিচায়, তেমনি অন্তরের মধ্যে সংসার-বাসনা শ্রীহরিভজনে বাধা দেয়।

শ্রীপাদ প্রভুকে লক্ষ্য করে বল্লেন—তোমাকে একটা পৃথক ঘর দেওয়া হয়েছে। সম্মান-টম্মান দিচ্ছে, খাতির করছে আজ। কিন্তু যেদিন খাতির করবে না, নাট্যমন্দিরে শুয়ে থাকতে হবে, রোগে ঔষধ দিবে না, তখন দূর ছাই বলে হরিভজন ছেড়ে দেবে। গুরুদেব যখন শাসন কর্‌বেন কিংবা অন্যলোকে অসম্মান ক'রবে, তখন হরিভজন ছেড়ে দিব—এই মনোভাব জানাবে ত?

আমি বিশেষ কাউকে শাসন করি না। কারণ শাসন করবার মত যোগ্য শিষ্য নেই। এখানে একটু প্রতিষ্ঠা, একটু তোষামদ পাওয়া যায়, তাই মঠে আছি। যখন কড়া শাসন আস্‌বে, তখন বল্‌বে— 'হয়েছে; দণ্ডবৎ'। গুরুদেবই যখন আমাকে পছন্দ করেন না, তখন আর ভরসা কি? গালাগালি করেন, ঘৃণা করেন, তখন আর মঠে থেকে লাভ কি? শ্রীল প্রভুপাদ বল্‌তেন,—"সকলে আমার গুরু—আমার শিষ্য নেই।" তাই তিনি কাউকে শাসন করতেন না। আমিও কাউকে শাসন করেছি—মনে পড়ে না। শাসন করলে যদি অপরাধ করে বসে—এজন্য শাসন করি না।

গুরু করেছি, অথচ তাঁর শাসন স্বীকার করব না; তাহলে বুঝতে হবে যে, সে শিষ্য নয়। শাসনের মধ্যে মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে।

শ্রীপাদ প্রভুকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন,—"তোমাকে কেউ কড়া কথা বল্‌লে, লাথি, ঝাঁটা খেলে কি করবে?" উত্তরে তিনি বল্‌লেন,—"আপনার কৃপায় আমি বুঝেছি যে, আপনি ছাড়া আমাদের গতি নেই। কোথায় যাবো? কি ক'রবো? গুরুগৃহে থেকেই জীবনপাত ক'রবো।"

শ্রীপাদ প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—'আমার কি কোন উপায় নেই' আপনার কৃপা হলে ত আমার মা, স্ত্রী আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন।' শ্রীল গুরু মহারাজ দৈন্য করে বল্‌লেন—"আমার কি কৃপা ক'রবার ক্ষমতা আছে? তারা তোমায় ছেড়ে দেবে, কিন্তু তুমিই তাদের ছাড়তে পারবে না। ইহা অতীব গূঢ় সত্য কথা।"

শ্রীপাদ প্রভুর কীর্তনে দর্শনের কথা আছে। দু'চারটি কথা বেদবাক্যের মত। ঐ কীর্তনে হয়ত সাহিত্যকথা বা কাব্য নেই, কিন্তু প্রাণ আছে, উপলব্ধি আছে, দর্শন আছে। এতে তাঁর বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে। শ্রীগুরুপূজার সময়মত প্রায় শতাধিক কবিতা আসে, সেগুলির অধিকাংশই কাব্য দর্শন নেই, অনুভূতি নেই। কিন্তু এত সব লেখার মধ্যে এই কীর্তনটীতে দর্শন ও অনুভূতির পরিচয় আছে।

—❖—

শ্রীহরিকথাহীন দিনই দুর্দিন

শ্রীশ্রীল গুরুদেব বললেন্—আজ ভোর ৪টা থেকেই অবিশ্রান্ত বারিপাত হচ্ছে, শুধু ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিপাতের শব্দ। Morning shows the day, তবে মেঘাচ্ছন্ন বা মেঘলা দিনটাই দুর্দিন নয়। শ্রীল প্রভুপাদ বল্‌তেন,—,'হরিকথা যে দিন শুন্‌তে পাওয়া যায় না, সেই দিনটাই দুর্দিন। যেদিন শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ও শ্রীহরিকথা কীর্তন ক'রতে পারা গেল না, সেই দিনটাই দুর্দিন।' জীবনের ক্ষেত্রেও সেই দিনটা, সেই সময়টা worst period যে দিনটা, যে period (কালটা) হরিকথায় অতিবাহিত না হয়। যখন স্বাস্থ্য রয়েছে, যৌবন রয়েছে, সুযোগ রয়েছে, সেই সময়টা ঘর-সংসার, অর্থোপার্জন, বিদ্যার্জন, ব্যবসায়, চাষ ইত্যাদিতে সময় কাটায়। জীবনের best period (উৎকৃষ্ট কালে)-এ শ্রীহরি-ভজনের সুযোগ গ্রহণ করে না। "হরিভজন পরে করা যাবে।"—এই রকম উক্তি করে (পরে মানে—ভবিষ্যতে)। ভবিষ্যতের উপর কিছু বিশ্বাস নেই। ভবিষ্যতে আমি মর্‌বো, কি বাঁচবো—হরিভজনের সুযোগ আসে কি না, তার কিছু ঠিক নেই। বর্তমান কালটাই একমাত্র ভরসা। বর্তমান কালটাই best opportunity (সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ)। অনেকে অল্প বয়সে মঠে এসে হরিভজন আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তারা আবার বাড়ী ফিরে গিয়ে সংসার পেতে বসেছে। এরাই দুর্দিনের মধ্যে পড়েছে, অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। বাড়ী গিয়ে চাষ কর্‌ছে ফিরি ক'রছে, ছেলে মেয়ে ক'রছে। মঠে কি অত কষ্ট ক'রতো ? মঠে হরিসেবাময়, বৈষ্ণবসেবাময় জীবন কত সুন্দর! কত আনন্দের ছিল—বুঝবে এক সময়। যারা মহাজনের দর্শন বা ছোঁয়াচ একটু পেয়েছে, তারা সময় চলে গেলে আফশোষ ক'রবে। যারা জীবনে একটু না একটু মহাজনের সঙ্গ বা তাঁর কৃপা পেয়েছে, একদিন না একদিন তাদের হৃদয়ে হরিভজনের স্পৃহা বা ইচ্ছা জাগ্‌বেই জাগ্‌বে। বর্তমানে উহা suppressed (চাপা) থাকলেও, জীবনের best

period (উৎকৃষ্ট কালটা) এখন অনিত্য সংসারের জন্য ব্যয় ক'রলেও, যখন হরিভজনের আর সুযোগ থাকবে না, তখনই অনুশোচনা জাগ্‌বে। হায়! হায়! জীবনটা বৃথাই কাটালুম—সংসারের মোহে পড়ে জীবনটা নষ্ট করেই দিয়েছি। এমন অমূল্য জীবন পেয়েছিলাম! মহাজনের সঙ্গও পেয়েছিলাম—কিন্তু কি রকম হতভাগা আমি, সময় থাক্‌তে হরিভজন ক'রলাম না ? বৃদ্ধাবস্থায় যখন স্বাস্থ্য নেই, পরমায়ু সমাপ্তপ্রায় হৃদয়ে, প্রাণে বল নেই—তখন এই অনুশোচনা জাগলেও আর হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'তে পারে না। যৌবনের সময় উঠে পড়ে দোকানটাকে ফাঁপাবার জন্য চেষ্টা করে, চাষবাস, অর্থোপার্জন, ছেলেমেয়ের দেখাশোনা, স্ত্রীর খিদমৎ করা, প্রতিষ্ঠাদি অর্জন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু পয়সায় যে ভব-সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যাবে না—এটা যৌবনের সময়ে মনে থাকে না বা চিন্তায় আসে না। তখন ভাবটা থাকে—বেশ স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ ক'রছি। মঠে থাক্‌লে পরাধীন হয়ে থাক্‌তে হয়। মঠের সেবা কর্‌লেও গালাগালি, লাথি, ঝাঁটা খেতে হয়; শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ধমক খেতে হয় এবং শাসন মেনে চল্‌তে হয়। অসুখ-বিসুখ হ'লে ঔষধ দেয় না, পথ্য দেয় না, ডাক্তার দেখায় না, কেউ শুশ্রূষা করে না, বৃদ্ধ হ'লেও কেই দেখ্‌বে না। এখন খাট্‌তে পারছি, তাই কাপড়-চোপড়, আহারাদি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। যখন invalid (অকর্মণ্য) হয়ে যাব, তখন কি এঁরা দেখবেন? এখনি এই রকম, অচল হয়ে গেলেত আর কথা নেই। এই সব মায়ার বৃদ্ধি। মায়ার প্রলোভনে পরে মঠবাস ও হরিভজন ছেড়ে দেয়। বয়স থাক্‌তে—সময় থাক্‌তে যারা দোকানদারি, চাকরি, ঘরকন্না নিয়ে থাকে, তাদের জীবনে মঙ্গলের পথটা রুদ্ধ হয়ে যায়—এ কথাটা একদিন বুঝ্‌তে পারবে। কিন্তু তখন আর হরিভজন করবার সুযোগ থাকবে না, আফশোষ করবে। জীবনের best period (উৎকৃষ্ট কালে) এ যে ideas (ধারণাগুলি) সংগ্রহ করে, সেইগুলির ধাক্কা সামলাতে বৃদ্ধ বয়সের দিনগুলি কাটিয়ে একদিন মরে যায়। জীবনটা বৃথাই কেটে গেল—এই অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যারা কোনদিন জীবনে—মহতের সঙ্গ বা কৃপা পায় নি; তাদের কিন্তু এভাব, এচিন্তা বা এবোধ জাগে না। যারা কোনদিন শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করেনি, দর্শন পায়নি, সঙ্গ পায়নি, কৃপা পায়নি, যারা কেবল খায়-দায়, থাকে, সংসারে বাচ্চা-কাচ্চা পোষণ করে, তাদের এ অনুশোচনা আসে না। কিন্তু মহতের সঙ্গ যারা জীবনে অন্ততঃ একটিবার পেয়েছে, তাদের একদিন না একদিন গভীর অনুশোচনা আস্‌বে। মহতের সঙ্গ বৃথা যায় না। আজ হো'ক, কাল হো'ক, পরজন্মে হো'ক—এ স্মৃতি জাগ্‌বেই জাগ্‌বে। “ভাল সময়টায় শ্রীগুরু-সেবা, শ্রীহরি-সেবা করলাম না”—এ কথাটা মনে আস্‌বে—যখন সামর্থ্য থাক্‌বে না, বয়স থাকবে না। তখন কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়বে, হা-হুতাশ ক'রবে, কান্নায় বুক ভেসে যাবে। কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাক্‌বে না।

জীবনের best period (উৎকৃষ্ট কালে) টায় হরিভজন করা একান্ত দরকার। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বল্‌তেন,—‘চল্লিশ বছরের পরে হরিভজন আরম্ভ ক'রলে সিদ্ধিলাভ করা সুকঠিন। কারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, ইন্দ্রিয়ের পটুতা কমে যায়, রোগ-ব্যাধি শরীর ও মনকে পীড়িত করে। সারাজীবন যে বিষয়গুলি চিন্তা করেছে, সেই অসৎ চিন্তাগুলি মনে মনে কিলবিল ক'রতে থাকে। সেগুলি ছাড়তেও পারে না। চল্লিশ বৎসরের পরে শ্রীহরি-ভজন আরম্ভ করলে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না।’

শ্রীল গুরুদেব বল্‌লেন,—এখন তোমাদের উৎকৃষ্ট সময়। এখন থেকে হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উঠে পড়ে লেগে যাও ভাগ্য থাক্‌লে সিদ্ধি লাভ হ'য়ে যাবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দোষ-দর্শন, তাদের আচার-বিচারের সমালোচনা, তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা, অনাদর পরিত্যাগ করে যদি শ্রীগুরু-সেবায়, শ্রীহরিসেবায় উঠে পড়ে লেগে যেতে পার, তাহলে এই জন্মেই শীঘ্র সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। ৮০ বছর বয়সে যেমন ব্যবসায় ফাঁপাতে পারে না, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে হরি-ভজনের বিশেষ সুবিধা

হয় না। প্রথম বয়সে ব্যবসা আরম্ভ ক'রলে যেমন দ্রুত উন্নতি হয়, পড়ন্ত বয়সে তা হয় না। তেমনি শ্রীহরিতোষণ, শ্রীগুরুতোষণ প্রথম বয়স থেকেই ক'রতে হয়। যাঁরা ভাগ্যবান, বুদ্ধিমান্, তাঁরা প্রথম বয়স থেকেই শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবা আরম্ভ করে থাকেন। সুদিন থাক্তে যারা হরিভজন করে না, তারা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা-বোধ করে না। বয়সের জোর থাক্তে হরিভজনের সুযোগ গ্রহণ করতে হয়। তখনি গুরুদেবের দর্শন, তাঁর সঙ্গ, তাঁর কৃপা লাভ করা বিশেষ দরকার। তখন সেবা করার সুযোগ হারালে জীবনে পরে পস্তাতে হ'বে। এই সময় অনেক সুযোগ—অনেক কিছু ক'রতে পারা যায়। এ সুযোগ হেলায় হারালে অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হতে হ'বে। কিন্তু যারা অল্পবয়সে মহতের সঙ্গ পায়নি, তাদের এই অনুশোচনা আসেনি। এই সব জীবের আরও খারাপ অবস্থা। এদের চেতনা জাগে নি। "খাই দাই থাকি পরি চিন্তাহীন"—আরও অচেতনতা, আরও জড় অবস্থা। যথার্থ মহাজনের সঙ্গ যার লেগেছে, তার জীবনে একদিন না একদিন বুঝে উঠ্বেই উঠ্বে। মহাজনের এত বড় কৃপাদৃষ্টি, এত শুভেচ্ছা বর্তমানে স্তম্ভিত দেখ্লেও তার বীজ একদিন না একদিন অঙ্কুরিত হবেই হবে । মহাজনের এ রকম অহৈতুকী কৃপা-দৃষ্টির মধ্যে পড়্লে স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে গেলেও, বিপদে পড়্লেও, অসুবিধা থাক্লেও সে হরিভজন, হরি-অনুশীলন ছাড়ে না।

শ্রীল গুরুদেব বল্লেন,—তোমার সুযোগ ছিল অথচ হরিভজন করলে না—পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্বে। Best সময়, best opportunity নষ্ট করে দিচ্ছো। তোমাকে যে রকম বাঘে ধরেছিল, তার থেকে উদ্ধারেরও সম্ভাবনা ছিল না। বাঘ তোমাকে খেয়ে ফেল্তে পারতো, কিন্তু ভগবদ্-ইচ্ছায় বাঘ তোমাকে খায় নি। বাঘের মুখ থেকে বেঁচে সিংহের মুখে পড়েছ। বাঘের মুখ থেকে বেঁচে এখন ত সেবা করবে, ভজন করবে—কিন্তু তা না করে বিষয়ের মধ্যে ঢুকেছ। স্বাস্থ্য ফিরে পেলে কি বিষয় ভোগ ক'রবার জন্য ? যে রকম তোমাকে অসুখ

ধরেছিল, তুমি ত মরেই যেতে। মরার মুখ থেকে বেঁচে এখন ঘিয়ের দোকান ও ভাইয়ের সংসার দেখা-শোনা করছ ? এর পরে কোন্ দিন বিয়ে করে বস্‌বে। শ্রীশ্যামসেবক কি করলো—স্বাস্থ্যটা ফিরে পেয়ে হরিসেবা ক’রছে।

শ্রীল গুরুদেব একজনকে জিজ্ঞেস করলেন,—“সংসারে গিয়ে বিয়ে করবে না হরিভজন করবে—কি ঠিক করেছ ?” প্রত্যুত্তরে বল্‌লেন, ‘না, সংসার করবো না। হরিভজন করবো স্থির করেছি।’ শ্রীল গুরু-মহারাজ জিজ্ঞেস ক’রলেন,—“তোমার বয়স কত এবং কবে মঠে এসেছ ?” প্রত্যুত্তরে দিলেন যে, তাঁর বয়স ৪০ বছর এবং ১৯ বছর বয়সে মঠে এসেছে। শ্রীল গুরুদেব জানালেন—তবে আর কি ? এখনি উৎকৃষ্ট সময় হরিভজন করার। ২১ বছর মঠে কাটিয়ে কিছু সেবা করেছ। এখন তীব্রভাবে উঠে পড়ে লেগে যাও। আমি গুরুদাস, কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণবদাস—এই অভিমান নিয়ে লেগে যাও। আমি মায়ার দাস নই। আমার জীবনের সঙ্কল্প স্থির হয়েছে যখন, ভাল হো’ক মন্দ হো’ক এই আমার জীবনের পথ—এই আমার রাস্তা। সঙ্কল্পে যখন দৃঢ়, তখন seriously লেগে যাও। পরীক্ষা আস্‌ছে—পাশ ক’রতে হ’বে। যখন ছেলেদের পরীক্ষা আসে, তখন ছাত্রেরা কি রকম পড়ে, যে কোন প্রকারে পরীক্ষায় পাশ ক’রতে হ’বে। তেমনি তোমরা হরিভজনের জন্য গুরুগৃহে এসেছ। গুরুগৃহে থেকে ভগবৎ-সেবা লাভ ক’রতে হ’বে। এখন থেকে উঠে পড়ে লেগে যাও। এক মুহূর্ত আর নষ্ট করো না। যে কোন প্রকারে সিদ্ধিলাভ ক’রতে হ’বে।

সিদ্ধিলাভের পথে পরনিন্দা, পরচর্চা, দোষ-দর্শন বড় বাধা—সব থেকে বড় অপরাধ। এই অপরাধ না কর’লে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত।

“কাহারে না করে নিন্দা, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে।
অজেয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥”

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১০/৩১২)

মঠের মধ্যে অনেকে অনেক সেবা করে। আবার পরচর্চা করে, পরনিন্দা করে ঐ ছিদ্র দিয়ে সেবার ফল বেরিয়ে যায়। অনেকের নানা দোষ আছে, নানা গুণ আছে, অমুকের চরিত্র খারাপ, অমুকে স্ত্রীসঙ্গ করে, অমুকে বেশী খায়, অমুকে যেখানে সেখানে যায়—এসব কথায় আমার দরকার কি ? পরের ছিদ্র দেখ্‌তে নেই, শুন্‌তে নেই, এমন কি দেখলেও বল্‌তে নেই। আমার জীবনের সাধনা নিয়ে পড়ে থাক্‌তে হ'বে শ্রবণ, কীর্তন, সেবা নিয়ে নিমগ্ন থাক্‌তে হবে। পরচর্চা পর-ছিদ্রান্বেষণ না করে যদি গুরুসেবা ও হরিসেবা করে যাও, তাহ'লে অতি অল্পকালের মধ্যে ফল দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু পরচর্চা ক'রলে ঐ ছিদ্র দিয়ে সেবার ফল বেরিয়ে যাবে। যে স্ত্রীসংগ করে, সে পাপ করে। কিন্তু পাপটা ভক্তিপথে বাধা স্বষ্টি করে না। তবে ভক্তিতে উন্নতি আনে না। কিন্তু যে স্ত্রীসংগ দেখে উহার দোষ দর্শন করে সে ব্যক্তির অপরাধ হয়। অপরাধ—ভক্তির বাধা এবং উহার মূল উৎপাটিত করে। কিন্তু পাপ মূল উৎপাটিত করে না, তবে ভক্তিলতা বর্ধিত করে না।

মঠে অনেকে আছে— সেবা কর্‌ছে, আবার দোষ দর্শন, পর নিন্দা, পরচর্চা করছে। কিন্তু ঐ ফুটো দিয়ে সব সেবার ফল বেরিয়ে যাচ্ছে। পাত্রে যত দুধ ঢালো—যদি ছিদ্র থাকে, সবই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বৈষ্ণব নিন্দা করে অনেকে একেবারে গোল্লায় গেছে। অন্বয়-ভাবে যদি সেবা করো, অর্চন করো, অতি দ্রুত, খুব শীঘ্র promotion (উন্নতি) হবে। দোষ দর্শন না ক'রলে প্রচুর উন্নতি লাভ করতে পারবে। এ হতে বাধ্য। তা না হলে ভক্তি-বিজ্ঞান মিথ্যা হয়ে যাবে। এখানে অনেক দৃষ্টান্ত আছে— সেবার কসরৎ ক'রছে, কিন্তু ছেঁদা দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। এরা হতভাগা। বৈষ্ণব-অপরাধের জন্য এদের কপাল পুড়ছে।

জীবনের সংকল্প স্থির করে সেবায় লেগে যাও, যে রকম করে হো'ক—এবার ভব-সাগর পাড়ি দিতে হবে। পারে যাওয়ার ভাল ও সুপটু জাহাজ এসেছে। টিকিটও পেয়েছি। এবার ভব-সমুদ্র পাড়ি দেবই—পার হবোই—এরূপ সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে হরি-ভজন শুরু কর্‌লে সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

শ্রীল গুরুদেব বললেন—আপনি আপনার সব ভু-সম্পত্তি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় দান করে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তাঁর সেবার ব্যবস্থা করছেন। এটা অর্পণ, এটা কমভাগ্যে হয় না। খুব ভাল কথা। কিন্তু এখানেই সর্ব শেষ নয়। শুধু বিষয় অর্পণ ও অর্থ অর্পণ ক'রলেও হ'বে না, নিজেকে ভগবৎ-সেবায় বলি দিতে হবে। সর্বতোভাবে তাঁর সেবা ক'রতে হ'বে।

—❖—

নিষ্ঠা থাকলে শুদ্ধ ভজন সম্ভব

অনর্থ-প্রবল থাকলে ভক্তিতে নিষ্ঠা হয় না অনর্থ যার যত ক্ষীণ হয়ে আসছে তার তত ভজনে নিষ্ঠা হয়। যারা ভজনশীল তাদের আহার, নিদ্রা, স্নান ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়ার loosenes (শিথিলতা) থাকে না। সেবায় অভিনিবেশ রক্ষার জন্য দৈহিক ক্রিয়ার প্রতি নজর থাকে। উৎসবে কতকগুলি খিচুড়ি ইত্যাদি খেয়ে তারপর দিন পায়খানা করতে থাক্‌লো—এতে ভজন বাধা-প্রাপ্ত হ'লো, কিন্তু সেবা হ'লো না আহার, নিদ্রা, কথাবার্তায় সংযম থাকা প্রয়োজন। দেহাভিনিবেশের জন্য নয়, প্রভুর সেবার যাতে ত্রুটি না হয় সেজন্য। ভোগীরা দেহের দিকে particularly (বিশেষভাবে) নজর দেয়। কেননা শরীর খারাপ হ'লে ভোগ করতে পারবে না।

সৎসাধক নিয়মপূর্বক খায় দায়, নিদ্রা যায়—এ বিষয়ে যথেষ্ট সংযম করে। ঐগুলি উপেক্ষা ক'রলে সেবায় গোলমাল হ'য়ে যায়। সেবা ঠিক রাখার জন্য দেহকে ঠিক রাখা। কাঁটা ধরে স্নান করে, কাঁটা ধরে খায়—এতে মনে হবে পাক্কা দেহারামী; কিন্তু তা নয়। দেহের ক্রিয়ার সংগে সমস্ত ভজন-ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে। দেহ ঠিক থাক্‌লে তবে সেবাও ঠিক থাকে। তা নাহ'লে সব গোলমাল হ'য়ে যায়।

সেবা-নিষ্ঠায় দেহ ও মন বাধা দেয়। যাদের অন্যাভিলাষ বা বাসনা থাকে, তারা নিয়মমত সেবা করতে পারে না। মনে কোন প্রকার

শোক, দুঃখ, আঘাত বা কারও সঙ্গে ঝগড়া হলো—মনটা বিচলিত হয়ে গেল— সেবাগুলি disturbed (এলোমেলো) হ'য়ে গেল। কারও সঙ্গে ঝগড়া করে পরিবেশন করা বন্ধ করে দিল। এগুলি internal (ভিতরের) বাধা হয়, তেমনি মানসিক অশান্তি থাক্‌লেও সেবায় বাধা উপস্থিত হয়।

অনর্থ-নিবৃত্তির পর নিষ্ঠা উদিত হয়। অনর্থ হালকা হ'লে ভজনে নিষ্ঠা হয়। যার অনর্থ বেশী, তার ভজনে নিষ্ঠা কম থাকে। একদিন নাচা-কোঁদা খুব করলে, তারপর দিন চুপ-চাপ। একদিন নৃত্য-কীর্তন করে, আর একদিন করে না।—এরকম ক'রলে বোঝা যাবে যে, ভক্তিতে নিষ্ঠা হয় নি। যার নিষ্ঠা হয়েছে, সে স্থিরভাবে চলে।

"রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ॥"

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৬/৩০৯)

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রত্যহ স্তব-স্তুতি, দণ্ডবৎ প্রণাম, অর্চন, গ্রন্থানুশীলন, শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমণ কর্‌তেন এ নিয়মগুলি পাষাণের উপর রেখাপাতের মত। এগুলি গাঢ়প্রিয়তা থেকে কর্‌তেন। নৈষ্ঠিক সাধকের অনর্থ কম।

গুরুদেবের কৃপায় তাঁর সঙ্গ-ফলে সেবা কর্‌তে অনর্থ কম হয়ে এলে ; তখন নিয়মমত ভক্ত্যাংগ যাজন করতে সমর্থ হয়। যেমন বিষয়ীরা রোজ অফিসে যায়, কিংবা ছাত্ররা রোজ স্কুলে যায়, তেমনি নিষ্ঠা ভজনে হওয়া দরকার। তোমাদের আর স্কুল কি ? অফিস কি ? তোমাদের ভক্ত্যাংগ-যাজনে নিষ্ঠা হওয়া চাই। তপস্যার মত অধ্যাবসায়-সহকারে ভক্তিসাধন করা উচিত।

একদিন হরিকথা শুন্‌লে ত, আর একদিন শুন্‌লে না। এরা নিম্ন অধিকারী। মাঝে মাঝে শুনে, মাঝে মাঝে আরতি দেখে—এতে কিছু কম ফল পায়। তবে একেবারে না দেখার থেকে মাঝে মাঝে দেখাও ভালো। ভজনে যত উন্নতি হয়, তত নিষ্ঠা হয়। 'নিষ্ঠা' মানে অনর্থ হাল্‌কা হয়ে আস্‌ছে। অর্চন-মার্গে নিষ্ঠা আরও বেশী দরকার। যারা

রান্না করে, অর্চন করে, তাদের নিষ্ঠা খুব দরকার। একদিন রান্না কর্‌লো, একদিন কর্‌লো না—তাতে ঠাকুরকে উপবাসী থাক্‌তে হবে। রান্না করতে না পারি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এও অনেকটা ভাল। Desultory way (এলোমেলো ভাবে) তে করলে বিশেষ ফল লাভ হয় না। যাঁর নিষ্ঠা এসেছে, তাঁর প্রাণ কাঁদবে। আমার সেবার ত্রুটি হবে—এই ভেবে দুঃখ পায়; শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেবা চালিয়ে যায়। জড় জগতে দেখা যায় যে, জ্বর হ'লেও ছেলের জন্য মা ভাত ফুটিয়ে দেয়—এটা প্রিয়তার লক্ষণ।

নিষ্ঠার উদয় হ'লে সেবা করতে ভাল লাগ্‌বে। আমার কীর্তন ক'রতে ভাল লাগে, আমার পাঠ ক'রতে ভাল লাগে। আমার পরিবেশন ক'রতে ভাল লাগে। Routine work (নিত্যনৈমিত্তিক কাজ) করে যাচ্ছি—তা নয়। কিছু কাজ মঠে থাক্‌লে করতেই হবে—নইলে খেতে থাক্‌তে দেবে কেন ? এই বোধে করে না। নিষ্ঠা হ'লে প্রীতির সঙ্গে করে, আদরের সঙ্গে করে। পরিবেশন ক'রতে ভাল লাগে—এতে একটা আনন্দ আসবে। নিষ্ঠার পর রুচি। এটা আরও ওপরের কথা। যার যে সেবা; তাতে নিষ্ঠা থাকা উচিত। যে যে সেবা করে, desultory (ভাসা-ভাসা) ভাবে যেন না করে। নিষ্ঠার উদয় হ'লে শুদ্ধ ভজন শুরু হয়। ধীরতা ও নিষ্ঠা থাক্‌লে ভজনে উন্নতি হয়, তখন সেবাটা সুখকর মনে হয়। যাঁর প্রতি সেবা কর্‌ছে, তাঁরও সুখকর হয়।

—❖—

স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী সেবা করা উচিত

শ্রীশ্রীল গুরুদেব এক প্রভুকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—নিষ্কপটে অর্পণ ত করেছেন—এখন আর কি ক'রতে চান ? প্রভু বল্‌লেন—এখন আর কি করবো ? শরীরে বল নেই মঠে থেকে শ্রবণ-কীর্তন নিয়ে থাক্‌বো—এমন ত ভরসা দেখছি না।

শ্রীল গুরু-মহারাজ বললেন,—বৃদ্ধ বয়সকে যুবক বয়স করা যায় কি ? কাল-ধর্ম—শরীর-ধর্ম ত আছেই, বার্ধক্যরোধ করবেন কি করে ? আপনি যদি শ্রবণ-কীর্তনাদি নিয়ে অন্য জায়গায় থাকেন তাহ'লে ঐ জমিগুলি ভেসে যাবে না কি ? অন্য জায়াগায় থাক্‌লে রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা হবে না কি ?

প্রভু বল্‌লেন,—আমি না থাক্‌লে কিছু ক্ষতি হবে। ...আর ত কেউ সেখানে নেই মঠে বা ধামে থাক্‌তে ইচ্ছে করে। কিন্তু মঠে থেকেও কোন সেবা ক'রতে পারবো না, বরং সেখানে থেকে জমিগুলো দেখে কিছু সেবার উপায়ন সংগ্রহ করে দিচ্ছি। এই ছাড়া ত আর কিছু ক'রতে পারছি না।

শ্রীল গুরু-মহারাজ বল্‌লেন,—সেবা করাটাই ভাল। শ্রবণ-কীর্তনের নাম করে মঠে কিংবা ধামে বাস করলে অনেক সময় আল্‌সামি দেখা দেয়। একটা উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য ধরে চলা—এটা ভাল কথা। সাধকের একটাতে আন্তরিকতাপূর্ণ ভাব থাকা চাই। বুদ্ধিকে স্থির করে seriously (আন্তরিকভাবে) একটা লাইনে থাকা চাই। কি ক'রছি না ক'রছি জানি না। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থির নেই—এটা ঠিক নয়। লক্ষ্য স্থির থাক্‌লে জীবনে শীঘ্র উন্নতি হয়। এটা ভাল, এটা শুভ। আপনার নিষ্কপট অর্পণ থেকে এই ফলটা এসেছে।

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।"

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২১/২)

যার যাতে অধিকার, সেই অধিকারানুযায়ী সেবা করা ভাল। যার যে অবস্থা, দেহের ও মনের পূর্বসংস্কারবশতঃ যে অবস্থার মাঝখানে পড়েছে; সেই অবস্থার মাঝখানে থেকে ভজন করা ভাল। এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত (Individual) ভজন। প্রত্যেকের যেরূপ যার নিজের অধিকার বা সংস্কার, সেই নিয়ে চলা ভাল। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের মত যদি কেউ লেখক বা বক্তা হতে চায়, তবে তার ভুল হ'বে। তুমি

যা আছ, সেখান থেকে অবস্থা বুঝে চলো। মঠের অনেকে ভাবে, যদি সন্ন্যাসটা না পাই, তা'হলে জীবনটাই বৃথা। এ সব অনর্থ। তুমি যা আছ, সেই থেকে ক্রমশঃ ভজনের উন্নতি করবার চেষ্টা করো। সৎসাধক এসব বিষয়ে চিন্তাশীল, seriously (আন্তরিকভাবে) চিন্তা করে—ইহাই তাঁর সাধন-চতুরতা, সাধন-বিচক্ষণতা, সাধন-বিজ্ঞতা।

রান্না করার লোক যদি কীর্তন করিতে চায়, তবে এখানে অসুবিধার কথা। শ্রীগুরুদেবের নির্দেশানুসারে কেউ অর্চন করে, কেউ বা পাঠ করে, কেউ বা ভিক্ষা করে, কেউ বা গ্রন্থাদি লেখে। তিনি যার উপর যে সেবা দিয়েছেন, সেইটা নিয়ম-মত, নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেলেই ভাল ফল দেয়। গুরুদেবের আদিষ্ট সেবায় রুচি হ'লেই ভাল। অনেকের আবার মঠরক্ষক হবার রুচি হয়। মঠরক্ষক হলে প্রভুত্ব করতে পায় টাকা-কড়ি ইচ্ছামত খরচ ক'রতে পারে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ক'রতে পারে। সেইজন্য মঠরক্ষক হবার জন্য রুচি, কিন্তু এগুলি বদ্-রুচি। কর্ত্তৃত্বাভিমান যায় নি, অথচ মঠরক্ষক হতে চাও—এরূপ রুচি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। যার নিরভিমানত্ব আছে, কর্ত্তৃত্বাভিমান নেই, মিষ্টিমুখ আছে, সদ্ব্যবহার আছে—এমন ব্যক্তির উপর যদি গুরুবৈষ্ণবগণ মঠরক্ষণের ভার দেন, তখন করা উচিত। আমি এইটাই চাই—এটা অনর্থ, অসুবিধার কথা। আমি ভিক্ষা করতে চাই, আমি মঠরক্ষক হতে চাই। আমি পাঠ করতে চাই। আমি সন্ন্যাসী হ'তে চাই—এ সবই অনর্থ, গোলমেলে কথা। আবার 'আমি মঠরক্ষক হ'তে চাই না, অথচ গুরু-বৈষ্ণবগণ দিচ্ছেন—এটাও অনর্থ—অসুবিধার কথা। এই চাওয়া বা না চাওয়া অধিকার-অনুসারে হওয়া চাই। ভজনের line-কে ঠিক রেখে নিজের অধিকারের দিক থেকে এ চাওয়াটা ঠিক থাকা চাই। এখন যদি সংস্কৃত পড়তে চাই, তাহলে ভুল হ'বে গুরুদেব যদি বলেন, —বক্তৃতা করো, তখন বক্তৃতা করবো অধিকার নেই অথচ মঠরক্ষক হতে চাই, বক্তৃতা দিতে চাই—এগুলি গোলমেলে কথা।

আর আমার যোগ্যতা থাক্ বা না থাক্—গুরুদেব যখন আদেশ

করেন, তখন নির্বিচারে করে যেতে হবে। তখন যদি যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কথা ভেবে সেবা না করি, সেটাও ভুল হবে। মঠবাসীর অনেকের মঠরক্ষক হ'বার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অনেকের আবার মঠরক্ষক হ'বার ইচ্ছা নেই। যেমন একজন মঠরক্ষক হ'তে চান না। আবার আরেকজন মঠরক্ষক হ'তে চায়—এ দুটোই অনর্থ। একজনকে দিলে নেয় না। আর একজনের অধিকার নেই, তবু চায়—এ দুইটি অনর্থ। শান্তভাবে, নিশ্চলতা, বিচারের স্থৈর্য যার আসে নি, তার মঠরক্ষক হ'বার অধিকার কোথায় ? গুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ যখন যা বলেন, তখন নির্বিচারে করে গেলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যাবে। আমি বাদক নই, অথচ আমি বাদক হতে চাই। আমি গায়ক নই, তবু গায়ক হতে চাই; আমি বক্তা নই, তথাপি আমি বক্তা হতে চাই। এগুলি অন্যাভিলাষিতা। তোমার যা যোগ্যতা আছে, তাই নিয়ে থাকো। অধিকারে নিষ্ঠা না থাকলে অন্যাভিলাষিতা আস্বে। আমি কোন department (বিভাগের) এর incharge (অধ্যক্ষ) হতে চাই। মঠে সাধকের মধ্যে এই দোষটা অনেকের আছে। Department (বিভাগের) এর charge (কর্ত্তৃত্ব বা অধ্যক্ষতা) না পেলে সেবায় উৎসাহ আসে না। সেবায় এগুলি বাধা। এগুলি অনধিকার-চর্চা। 'গুরুদেব যা দিয়াছেন, তাই করে যাবে'—এই ইচ্ছায় যথার্থ ইচ্ছা। আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম। আনুগত্য দেখ্লে গুরু-বৈষ্ণবগণ খুশী হন। গুরুদেবের আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে। তখন নির্বিচারে উল্লাসের সঙ্গে করে যায়। তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করাই ভজনের সহজ রাস্তা। তোমার কিছু discretion (স্বাধীন বিবেচনা) থাকলে যেটা চাইবে, সেটায় অধিকার আছে কি না চিন্তা করে দেখতে হবে। কিছু না চাওয়া safest (সব চাইতে নিরাপদ)। মঠরক্ষক হওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে গজগজ কর'ছি, মঠরক্ষক হতে না পারলে "বাড়ী চললাম।" আপনারা যখন বিশ্বাস করেন না, তখন আর মঠে থেকে লাভ কি ? সব চেয়ে সুবিধার কথা হ'লো—আনুগত্য।

মঠবাসীদের প্রথম শিক্ষা হ'লো—নির্বিচারে গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ পালন করা। উল্লাসের সঙ্গে আদেশ পালন ক'রতে পারলে ভজনে দ্রুত উন্নতি হয়, আর উল্লাসের সঙ্গে না ক'রলেও অনিচ্ছার সঙ্গে আদেশ পালন করে যায়। তাহলেও কিছু ফল পায়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের আদেশ পালন ক'রলে কিছুটা মঙ্গল উদয় করাবে। কিন্তু আদেশ পালন না ক'রতে পারলে অমঙ্গলের কথা।

শ্রীল গুরুদেব প্রভুকে বল্‌লেন নিষ্কপটে অর্পণ করার জন্য আপনার বিচারটা সুন্দর হ'য়েছে। বাড়ীতে জমি-জায়গা দেখা-শোনা-রূপ সেবাটা ক'রবেন এবং পাঠকীর্তন ক'রবেন। যাদের একটু শ্রদ্ধা আছে, তাদের ডেকে এনে পাঠ শোনাবেন। বাড়ীটা মঠ হ'য়ে যাবে। এ রকম atmosphere (আবহাওয়া) এর মধ্যে থেকে ভজন করে উন্নতি হয়। 'তুমি যা ইচ্ছে, তাই করো প্রভু। নিষ্কপটে, নিরপরাধে ক'রলে ঠিক পুরস্কার তিনি দেন। তিনি ত অন্ধ নন; বোকাও নন—তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান্। সুতরাং সরলতা, নিষ্কপটতা দেখ্‌লে তিনি প্রীত হন। অন্যকে অনুকরণ করবার দরকার নেই। যে ব্যক্তির যে অধিকার, যথাকালে যথাস্থানে সেই ব্যক্তিকে তিনি সেই ফুল দেন।

সন্ন্যাসই দেয় না—এত সেবা করলুম—এত বক্তৃতা দিলুম—দণ্ডধারণ ক'রতে পারলুম না—জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। এটা অত্যন্ত ভুল। যেমন এক প্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য উন্মত্ত। সন্ন্যাসী হওয়া আমাদের আদর্শ নয়। আমার service (সেবা), আমার যোগ্যতা এরা যদি appreciate (গুণগ্রহণ) করতে পারতেন, তবে সন্ন্যাসটা দিতেন। জোর করে সন্ন্যাস নিলে উৎপাত সৃষ্টি হয়। সন্ন্যাসী হওয়াটা আমার মঠজীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। সন্ন্যাস যদি না পাই, মনমরা ভাব যাবে না। এগুলি অনধিকার-চর্চা। অনেকে আবার ভাবে ভিতরটা লাল হো'ক, পরে সন্ন্যাস নেওয়া যাবে, অথচ গুরুদেব দিতে চান। আমি নিতে চাই যেমন অনর্থ, আমি নিতে চাই না—তেমনি অনর্থ।

প্রভুর তরফ থেকে যখন যেটা আসে, সেইটা বরণ করে নিই।

আমার কোনদিন এটা পাওয়া উচিত—একথা আমি কোনদিন বলি নি। কোনদিন এভাব আমার থাকতো না। তোমার যা ইচ্ছে—তাই দিও, কোন প্রার্থনা করি নাই। আমার পড়ার ঘরে রেখেছিলাম—

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥”

—❖—

সর্বাবস্থায় সেবা করাই মঙ্গল—লাভের উপায়

সেবাই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। মঠে থাকি, গৃহে থাকি বা বনে থাকি, যখন যেখানে থাকি না কেন, শ্রীহরির সুখ-বিধান করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীহরি-সেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা দরকার। মনের এই রকম ভাব, এই রকম attitude থাকা উচিত। শ্রীহরি অনন্তভাবে সুখী হন, অনন্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারে তাঁর সম্ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ করেন। তিনি কি চান—তার তুলনা নেই। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তাঁর কি করে সেবা করতে পারি ? আমার তরফ থেকে অনন্ত লীলাময়ের সেবা স্পর্শ করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু নিজের তরফ থেকে কোনরকম শাঠ্য, অলসতা, অবহেলা না ক'রে তাঁর কিছু সেবা করবার জন্য তৈরী থাকা চাই। সেবা করবার জন্য একটা আঁকুপাঁকু ভাব কিংবা ঔৎসুক্য রাখতে হ'বে। সেবার সুযোগ উপস্থিত হ'লেই চট্ করে ওটাকে ধরতে হ'বে গ্রহণ ক'রতে হ'বে।

সাধকাবস্থায় বা অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় শ্রীহরির শুদ্ধ-সেবা অসম্ভব। কারণ ভগবান্ বৈকুণ্ঠবস্তু। সেখানে কোন প্রকার হেয়তা, অবরতা, নিকৃষ্ট ভাব নেই। বদ্ধজীব অশুদ্ধ কামনা-বাসনা-তাড়িত ও হৃদয়ে ময়লা-আবর্জনায় ভরা। এরকম অপবিত্র অবস্থায় বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায় শুদ্ধ-সেবা করা অসম্ভব। কিন্তু আমার এই অশুদ্ধ ভূমিকায় আমার অধিকারানুযায়ী শ্রীভগবানের শুদ্ধ সেবা করার জন্য একটা ঝোঁক বা

একটা চেষ্টা নিরন্তর থাকবে। তাঁর শুদ্ধ সেবা করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন কিংবা প্রার্থনা জানাতে হ'বে।

সেবা নিরন্তর করে যেতে হ'বে। সেই সেবা গ্রহণ করা বা না করা তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু সেবা করবার জন্য আমাদের সব সময় alert (জাগ্রত) থাকা প্রয়োজন। আমার চাকরির প্রয়োজন; সব সময় application পাঠাতে হ'বে এবং চাকরি করার জন্য ইচ্ছাও রাখতে হ'বে। আমি তাঁর এটা ওটা সেবা করি, গ্রহণ করা বা না করা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। শুদ্ধ হওয়া না হওয়া আমার ভাগ্য। শুদ্ধভাবে ক'রতে পারলে তিনি গ্রহণ করবেন—এটা ধ্রুব সত্য। শুদ্ধভাবে যদি সেবা ক'রতে পারি, তাহলে মহাভাগ্যেরই কথা। আমার চিত্ত মলিন, তাই আমি যে সেবা করি, তা অশুদ্ধ। তিনি ত গ্রহণ ক'রছেন না। তা'হলে আমি কি সেবা ছেড়ে দেবো ? না, সেবা কিছুতেই ছাড়তে হ'বে না। নিরন্তর শুদ্ধ সেবা ক'রবার জন্য সাহায্য, কৃপা ও প্রার্থনা-রূপ application (দরখাস্ত) পাঠাতে হ'বে। আমার তরফ থেকে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা, যত্ন ও একাগ্রতা থাকা প্রয়োজন। তিনি করুণাময়, নিরন্তর চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যাবসায়ের ফল একদিন দিবেনই দিবেন। ধরো তিনি যে খাওয়াটা পছন্দ করেন, সেই খাওয়াটাই তুমি ক'রলে। কিন্তু ভাল হ'লো না। কারণ তিনি গ্রহণ ক'রলেন না। ভাল করতে পারলাম না যখন, তখন মোটেই সেবা করবো না—এ মনোভাবটা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনা বা শাঠ্যেরই কথা। তোমাকে আমি যেমন পারি—আমার সাধ্যানুযায়ী যত সুন্দর পারি, ততটুকু করে দিতে কখনও অলসতা বা শাঠ্য করবো না। এই ভাব থাকা দরকার। এই বৃত্তি নিয়ে সেবা করতে থাকলে আমার ভাগ্যে শুদ্ধ সেবা এসে জুটবে। আমি যে রকম সে রকম ক'রবো। সেবার জন্য উৎসাহ, যত্ন থাকা দরকার। এর মধ্যে একটি মজার কথা আছে।

যদিও গোলোকপতি—বৈকুণ্ঠপতি সকুণ্ঠ জগতের কোন সেবা গ্রহণ করে না, তথাপি তাঁর সেবক গুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ একটু

দোষযুক্ত সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব হ'য়েও শ্রীভগবান্ ও বদ্ধজীবের মাঝখানে সেতুর মত, medium এর মত, ঘটকের মত বিরাজ করেন। বদ্ধজীব সাধক-অবস্থার বৈকুণ্ঠ-ভূমিকার উপযোগী শুদ্ধ-সেবা না করতে পারলেও, একটু মলিন ও খারাপ হ'লেও গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তা reject (বর্জন) করেন না। শ্রীহরি ঠাকুর আমার জিনিষটা নির্মল হ'লো না বলে গ্রহণ করবেন না; কিন্তু তাঁর সেবক-শ্রেষ্ঠ গুরুদেব ঐ সেবা গ্রহণ করেন। কেননা, তিনি জীবের প্রতি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। সেবা সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হ'লেও তিনি গ্রহণ করেন—যাতে জীবের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসাহ, উদ্যম না ভেঙ্গে যায়। জীবের উৎসাহ ভঙ্গ যাতে না হয়, সেইজন্য একটু ভেজাল, একটু মলিন, একটু দোষযুক্ত সেবা তিনি গ্রহণ করেন। শ্রীগুরু-ঠাকুর শ্রীহরি-ঠাকুরের কৃপাশক্তি। তিনি মাঝখানে থাকেন বলে—তাঁর position (স্থান)-টা এই রকম বলে অনর্থযুক্ত-সেবাটাও তিনি গ্রহণ করেন—এটা fact বা বাস্তব সত্য। এইজন্য অনর্থযুক্তাবস্থায় শ্রীহরি-ঠাকুরের চেয়েও শ্রীগুরু-ঠাকুরের প্রয়োজনীয়তা বেশী। ধরো, শ্রীভগবানকে কিছু খেতে দিলে—তিনি গ্রহণ করলেন কি করলেন না, এটা বোঝা গেল না বা অনুভূতিতে এলো না। কিন্তু গুরুদেবের কাছে কোন খাবার নিয়ে গেলে তিনি খান—এটাতে দেখ্‌তে পাই। তাঁর পছন্দমত করে আন্‌তে পারি নি—এটা ঠিক, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন—এটাও ঠিক। এইখানে শ্রীগুরুদেবের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগুরুদেব ময়লা, ভেজাল, দোষযুক্ত-সেবা পছন্দ করেন—তা নয়। কিন্তু অনর্থযুক্ত অবস্থায় সেবার যথেষ্ট ত্রুটি থাক্‌বেই থাকবে। আমার দোষ, ত্রুটি, ভুল ইত্যাদি দেখে তিনি reject (বর্জন) করেন না। তিনি যদি reject (অগ্রাহ্য) করেন, তবে সেবক তৈরী হ'বে না। এতে শ্রীহরি-ঠাকুর বঞ্চিত হবেন। সুতরাং মলিন লোকগুলিকে নিয়ে তিনি শুদ্ধসেবক তৈরী করেন। সেহেতু শ্রীগুরুদেব অত্যন্ত দয়াবান্। আমার মলিন সেবা যখন গ্রহণই করেছেন, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না বা

reject ক'রছেন না; তখন এই রকম মলিন-সেবা—বরাবর ত্রুটিযুক্ত সেবা যারা ক'রতে থাকে, তারা এই অহৈতুকী দয়ার advantage (সুবিধা) গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের মনে রাখা দরকার—তারও একটা সীমা আছে। শঠতা, বদমাশী বুদ্ধি সব সময় চালিয়ে যেতে থাকলে অপরাধ সঞ্চিত হয়। শেষে ভজন থেকে ছুটি হ'য়ে যায়।

সৎ-সাধকের মলিনতা থাকবে। তাতে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। শ্রীগুরুদেব ধুইয়ে মুছিয়ে নির্মল করে নেবেন—এটা ঠিক। কিন্তু ভুল-ত্রুটি সাধকের ধীরে ধীরে সংশোধন করা উচিত। যাকে হয়ত বাজার ক'রতে দেওয়া হ'য়েছে—সে পয়সা চুরি করে। এই চৌর্যবৃত্তি যে যদি চালাতেই থাকে, তবে তার অপরাধ হবে। ভগবানের সেবার পয়সা থেকে চুরি অপরাধমূলক। সৎসাধকের এটা থাকা উচিত নয়। গুরুদেবেরও সহিষ্ণুতা, ক্ষমার সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে গেলে অসুবিধার কথা।

ভালমতে ক'রতে পারছি না, অতএব সেবা ছেড়ে দিই—এটা যে-রকম অন্যায় ও অশোভন, তেমনি অশুদ্ধভাবে চিরকাল করে যাব—এ মনোভাবও খারাপ। সাধক-জীবনে এই রকম অবস্থা আসে। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থান-হেতু এইসব মনোবৃত্তি জাগে। তিনি মলিন জিনিষ গ্রহণ করেন—এটা ঠিক, কিন্তু সাধকের চেষ্টাটা মলিন নয়—চেষ্টাটার মধ্যে কোন গলদ নেই—চেষ্টা নিষ্কপটভাবে হচ্ছে—এটা যদি তিনি দেখেন—এতেই আমার বহু লাভ হ'য়ে যাবে। সাধন ক'রতে গিয়ে এই রকম stage (অবস্থা) এলে শ্রীগুরুদেবকে refer করলে অর্থাৎ বিচারের ভার দিলে তিনি ভুল-ত্রুটি সংশোধন ক'রবার উপায় বলে দেন এবং প্রচুর উৎসাহ দেন। নিষ্কপটভাবে গুরুদেবের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি এ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন। শ্রীহরি-ঠাকুর আমার সাধনার পথে কোন response (সাড়া) না ক'রলেও—সাড়া না দিলেও তাঁর প্রতিভূ শ্রীগুরুদেব response (উত্তর) করেন। তিনি ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেন, আবার উহা সংশোধন করার কৌশল বলে দেন।

এতে শ্রীহরি-ঠাকুরকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। হরিকে বাদ দিয়ে যে গুরু, সে গুরুমায়া। সে গুরুর কথা বলা হচ্ছে না। মা ছেলের কাছে বেশী প্রয়োজনীয়, মা না হ'লে ছেলের এক মুহূর্তও চলে না। তেমনি সাধক-জীবনে গুরুদেবের সঙ্গ, কৃপা, আর্শীবাদ, উপদেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

—❖—

আনুগত্যময়ী সেবার ফলে ভজনে দ্রুত উন্নতি-লাভ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ এক প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার কি ভাল লাগে ? প্রভু জবাব দিলেন—কীর্তনের দোহার আমার ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ ঃ আর কি পারো ? প্রভু বললেন,—কিছু অর্থাদি অর্পণ করতে ইচ্ছা করি। শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ মূল গায়করূপে কীর্তন ক'রতে পারো কিনা চেষ্টা করে দেখতে পারো, trial দিতে পার; আর যে যোগ্যতা আছে, যে বিষয়ে উৎসাহ আছে, সে বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে মনোনিবেশ ক'রলে পুরোপুরি ফল পাওয়া যায়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন ইত্যাদি নববিধা ভক্তির যে কোন একটি অঙ্গ সাধন ক'রলে সিদ্ধিলাভ হয়। সবগুলি সাধন ক'রলেও ফল পাওয়া যায়।

"এক অংগ সাধে, কেহ কেহ বহু-অঙ্গ।

* * * *

এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ-সাধন॥"

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২/১৩৪-১৩৫)

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ,
সর্বস্বাত্মনির্বিদেনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাৎ পরম্ ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২/১৩৬ শ্লোকধৃত
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বচন ১/২/২৬৫)

অর্থাৎ শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ তৎকীর্তনে, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তৎস্মরণে, শ্রীলক্ষ্মী-দেবী তদঙ্ঘ্রি-সেবনে, শ্রীপৃথুমহারাজ তৎপূজনে, অক্রুর তদভি-বন্দনে, কর্পিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলী তচ্চরণে সর্বস্ব দান ও আত্মনিবেদন দ্বারা সিদ্ধি বা শ্রীভগবৎ-প্রেম লাভ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীঅম্বরীষ প্রমুখ ভক্তবৃন্দের বহু অঙ্গ-সাধন-দ্বারা শ্রীভগবৎ-প্রেম-প্রাপ্তি হয়েছিল।

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ, তদ্ ভৃত্যগাত্র-স্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ-তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমত্ত লস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দন।
কামঞ্চ দাস্যে * * * ॥"

—(শ্রীমদ্ভাগবত ৯/৪/১৮-২০)

অর্থাৎ অম্বরীষ-মহারাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জনাদিতে ও কর্ণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণে এবং স্বীয় চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণের শ্রীমূর্তি-দর্শনে, স্বীয় অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা) কৃষ্ণের পাদ পদ্ম-

সৌরভাঘ্রাণে, স্বীয় রসনা কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, স্বীয় পাদদ্বয় শ্রীধাম-পরিক্রমণে, স্বীয় মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতি কার্যে এবং স্বীয় কামনা শ্রীভগবদ্দাস্যে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

যার যে অঙ্গে স্বাভাবিক রুচি আছে, সে বিষয়ে নিজের জোর দেওয়া ভাল। যখন কীর্তন হয় না, তখন কি করবো ? কারো রুচি আছে ভিক্ষায়, কিন্তু যখন ভিক্ষা করো না, তখন কি করো ? বাকী সময় আল্‌সামি, প্রজল্প, নিন্দা—এই ভাবে সময় কাটাবে ? যার যে বিষয়ে রুচি আছে— সেই বিষয়ে যতটা সম্ভব সময় মত সুযোগ নেওয়া উচিত। অন্য সময়ে অন্য বিষয়ে সুযোগ নেওয়া উচিত। কিন্তু একেবারে উদাসীনতা ভাল নয়।

ধরো, অর্চনে কা'রও রুচি আছে। শৃঙ্গার করায় কারও উৎসাহ আছে, কিন্তু গুরুবর্গের ইচ্ছা হ'লো—তাকে অর্চন না দিয়ে ভিক্ষায় দেওয়া, কিন্তু ভিক্ষায় তার রুচি নেই। এ-রকম ক্ষেত্রে রুচি, উৎসাহ বা উৎসাহ বা উল্লাস না থাক্‌লেও গুরুবর্গের যখন আদেশ আসছে, তখন নির্বিচারে তা পালন করা উচিত। কিন্তু অনেকে তবে গজ্ গজ্ ক'রতে থাকে, অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ ক'রতে থাকে। "তাঁরা এরকম কেন চান? আমার ভিক্ষায় রুচি নেই, উল্লাস নেই, আমি ভিক্ষা করতে পারি না; তথাপি আমাকে ভিক্ষায় পাঠাতে চান কেন ? আমি হাঁড়ি গড়া হবো না, কিন্তু আমি কলসী গড়া হবো।" সমাজের রুচি ও উৎসাহের চেয়েও গুরুবর্গের রুচি ও উৎসাহের প্রাধান্য দিতে হ'বে। কেননা তোমার রুচির ভিতরে অনর্থ ও অসুবিধা থাকতে পারে। গুরুবর্গ যেটা দেখ্‌ছেন তা শ্রীহরি-সাধনের ভিতর দিয়ে দেখ্‌ছেন। শ্রীহরির সর্বাংগীণ সেবার প্রয়োজন। সেইজন্য তোমার রুচি না থাক্‌লেও তোমাকে ভিক্ষা বা রান্নার সেবা দেন। সাধকের একদেশিক নজর। সেইজন্য নিজের ইচ্ছা বা রুচিকে স্তব্ধ ক'রে তাঁর ইচ্ছার প্রাধান্য দিতে হবে।

আমি আমার পূর্বসংস্কারাদি নিয়ে দেখ্‌ছি, আর গুরুদেব সর্বতোভাবে দেখ্‌ছেন। আমার ভাল লাগে কলকাতায় থাকতে, তিনি তোমায় পাঠাতে চান গংগাসাগরে। তুমিত আমার সংসারের দিক থেকে চিন্তা করো না। সেইজন্য গুরুবর্গের কৃষ্ণের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করা ভাল। এটা ভক্তির অনুকূল। যেখানে সাক্ষাৎ আদেশ পাবার সুবিধা নেই বা নির্দেশ আস্‌ছে না সেখানে নিজের রুচি-অনুযায়ী সেবায় নিযুক্ত থাকা ভাল। মঠে থাক্‌লে সাক্ষাৎ আদেশ পাবারই সুযোগ বেশী। যারা বিচ্ছিন্নভাবে আছে, তাদের সাক্ষাৎ আদেশ পাবার সুযোগ কম। গৃহে থেকে সাক্ষাৎ গুরুদেবের নির্দেশ পালন করা যায়।

আমি চাই লিখ্‌তে, আমি চাই বক্তৃতা কর্‌তে, আমি চাই ভিক্ষা ক'র্‌তে। ভিক্ষা করা কষ্টকর, টো টো করে ঘোরা,—লোকের বাড়ীতে ধাক্কা খাওয়া—এই সব ত। এখানে অশ্রদ্ধার ভাব। গুরুদেব সর্বাঙ্গীন সেবাভাব নিয়ে আছেন। তুমি ঐ ভিক্ষা-সেবাটা না ক'রলে ঠাকুরের সেবা বাদ পড়ে যাবে বা ত্রুটি হ'বে—এইরকম ভাবা ভুল। গুরুদেব সর্বাঙ্গীন সেবার সুষ্ঠুতার জন্য ঐ রকম ব্যবস্থা করে দেন। সেই জন্য যাঁরা শরণাগত, তাঁরা গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী চলেন। আর যারা অশরণাগত, তারা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে, ভিতরে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। গুরুবর্গের ইচ্ছার অনুকূলে নিজের ইচ্ছাকে submit (নিবেদন) ক'রতে হবে।

ঠিক জায়গায় ঠিক সময়মত আমাকে তিনি পৌঁছে দিবেন—দায়িত্ব গুরুদেবের। সুতরাং এই বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা ঠিক ঠিক ভাবে তাঁর নির্দেশানুসারে চলেন, তাঁরা সৎসাধক। যারা তাঁর নির্দেশমত চল্‌তে পারে না, তার কারণ (১) তাদের স্বতন্ত্রতা, (২) গুরুদেব আমাদের মঙ্গল ক'রতে পারেন—এ বিশ্বাসের অভাব, (৩) নিজেদের কোন অন্যাভিলাষ-পোষণ ইত্যাদি।

কি মঠবাসী কি গৃহস্থ সকলেরই হৃদয় গুরুদেবের কাছে খুলে দেওয়া উচিত। যেমন ডাক্তারের কাছে সব কথা খুলে বলতে হয়, গুরুদেবের

কাছে তেমনি নিজেকে খুলে দেওয়া উচিত। যখন নিজেকে খুলে দেয়, তখন গুরুদেবের নজর আসে। গুরুদেবের কাছে সব কথা খুলে বলা ভাল। খুব কম সাধককে দেখেছি—নিজেদের সাধক-জীবনের সমস্যার কথা বড় বলে না। তার কারণ কপটতা ও অন্যাভিলাষ। মঠবাসীর ভিতরেও এ-রকম সাধক কম। যে আত্মসমর্পণের দ্বারা নিজেকে গুরুদেবের কাছে খুলে দেয়, তার জন্য গুরুদেবের চিন্তা হয়। সাধকের তরফ থেকে এ-রকম নিজেদের খুলে দেওয়ার ভাব থাকা উচিত। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে Place (সমর্পণ) করা উচিত। সবচেয়ে ভাল কথা—আনুগত্যময় জীবনযাপন ক'রা, শরণাগত হওয়া, তাঁর কাছে ছেড়ে দেওয়া।

অনেকে আসে মুখস্থ করা কথা বলে, 'কৃপা করুণ', দণ্ডবৎ প্রণাম করে, গা ঘেঁসে, প্রাণহীন কথা বলে, বৈষয়িক সুবিধা-অসুবিধার কথা জানায়। ঠাকুর-ঘরে গিয়ে যেমন বিষয় পাবার কথা জানায়, তেমনি গুরুদেবের কাছেও জানায়। কিন্তু নিজের সাধন-ভজনের অসুবিধার কথা জানায় না। তবে এটা যে করে, সে লাভবান্ হয়। তখন গুরুদেবের sympathy (সহানুভূতি) পায়। জয় পরমহংস দিচ্ছে, গা ঘেঁস্‌ছে, দণ্ডবত দিয়ে যাচ্ছে—কি উদ্দেশ্যে করছে ?

শ্রীল প্রভুপাদ বল্‌তেন,—এঁরা সকলে ত আমার গুরু অর্থাৎ গুরুকে বিশ্বাস করে না। তাঁর মত গুরুকেও গুরুত্বের আসনে বসায় নি। সৎ-সাধকের তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাক্‌লে তিনি খুব ভাগ্যবান্ হন। তিনি নিশ্চয়ই অল্পকালের মধ্যে ভজনে উন্নতি করেন। এটা সাধন-ভজনের একটা গূঢ় রহস্য।

অনেকেই ফটোতে ফুল-টুল দেয়, দণ্ডবৎ প্রণাম করে—প্রাণহীন ক্রিয়াদি করে। কিন্তু তাতে প্রকৃত মঙ্গল-লাভের আশা সুদূর-পরাহত। সৎ-সাধকের সাধন-ভজনের জীবন্ত ক্রিয়াগুলির প্রতি তীব্র লক্ষ্য থাকা দরকার।

—❖—

ভক্তি-সাধকের ক্রমবিকাশ—সাধক প্রবর্তক ও সিদ্ধ

শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল এ তিনটি ধামকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আশ্রয় করে থাকেন। যারা কনিষ্ঠ অধিকারী, অনর্থগ্রস্ত, সবে-মাত্র ভক্তিসাধন আরম্ভ ক'রছে, তাদের পক্ষে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল প্রশস্ত। যারা সর্বনিম্ন অধিকারী, তাদের পক্ষে কৃপা খুব বেশী দরকার। যাদের ভজন-বল নেই কেবলমাত্র সাধন আরম্ভ করেছে, তাদের পক্ষে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ভাল। আর যারা সাধনে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, seriously (আন্তরিকভাবে) ভজন আরম্ভ ক'রেছে, Preliminary (প্রাথমিক) কোন অসুবিধা নেই, তাদের পক্ষে শ্রীক্ষেত্রধাম প্রশস্ত। যাঁরা শ্রীভগবল্লীলা স্মরণ করতে পারেন, শুদ্ধ সেবা ক'রতে পারেন অর্থাৎ যাঁরা সিদ্ধ, তাঁদের জন্য শ্রীব্রজমণ্ডল। এই তিনটি ধামই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান আশ্রয়ণীয়। এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটি জায়গায় থেকে ভজন করা, যত্ন করা, সেবা-আনুকূল্য করা সকলের উচিত। যাঁরা তা না পারেন অর্থাৎ কোনটিরই আশ্রয় ক'রতে পারেন না, বা সে রকম সুবিধা জীবনে নেই, সেইসব ব্যক্তিগণ ধামের স্মৃতি, ধামের সেবা, ধামের আনুকূল্য ক'রলেও কতকটা অভাব মোচন করা হয়। ধাম আশ্রয় ক'রতে না পারলেও ধাম-বাসী, ধামসেবক ও ধামের আনুকূল্য সংগ্রহ ও অর্থাদির দ্বারা সেবা ক'রতে পারলে কতকটা অভাব পূর্ণ হয় অর্থাৎ কিছু ফল-লাভ হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রধান এই তিনটি তীর্থ। দক্ষিণ দেশেও তীর্থ আছে, সেগুলি খারাপ কিছু নয়। যারা seriously (আন্তরিকভাবে) ভজন ক'রতে চায়, এই ধামত্রয়ের উপর তাঁদের দৃষ্টি, সেবা করবার বৃত্তি, যত্ন প্রভৃতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

এদের মধ্যে আবার দেখা যায়—শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারার গুরুবর্গ সকলেই শ্রীনবদ্বীপধামকে আশ্রয় করেছিলেন। শ্রীল-জগন্নাথদাস

বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল-বংশীদাস বাবাজী মহারাজ এঁরা সকলেই শ্রীনবদ্বীপধামে থেকে ভজন করেছেন।

"গৌড়-ব্রজজনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।"

—(শরণাগতি, সিদ্ধিলালসা—৪)

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী ফুলিয়াতে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগোদ্রুমে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে থেকে ভজন করেছেন। এঁদের শ্রীনবদ্বীপ-ধামের প্রতি affinity বা প্রিয়তা বেশী। তাঁরা শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীব্রজধামকে অগ্রাহ্য করেছেন—তা নয়; কিন্তু এঁরা সকলেই শ্রীগৌরমণ্ডলকে কেন্দ্র করেই ভজন ও সেবা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিমান যাঁদের আছে, অর্থাৎ যাঁরা শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে কৃষ্ণোপাসনা করে থাকেন, তাঁদের শ্রীগৌরধামই বড় প্রশস্ত। আমাদের গুরুবর্গ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সেবার প্রতি জোর দিয়েছেন। অন্য তীর্থ কিছু নয়—একথা নয়। কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সেবা না হ'লে চল্‌বেই না। যাঁরা বিশেষ কৃপাপ্রার্থী অর্থাৎ কৃপা না হ'লে যাঁদের চলে না, দুঃখী' তাপী তাঁদের নবদ্বীপ-ধামবাসীর সেবার দিকে দৃষ্টি, নজর, লক্ষ্য ও যত্ন থাকা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীভগবানের লীলা ভক্তলীলা যেখানে আছে, ত হ'লো তীর্থ। ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলা-স্থলীকে আশ্রয় করে থাকেন। যাঁরা ভজনশীল, ভজন-চতুর, ভজন-পটু, ভজন-বিজ্ঞ, তাঁরা শ্রীনবদ্বীপধামের সেবা কর্‌তে পারলে নিজদিগকে ধন্য মনে করেন।

যাঁরা সাধন-চতুর হ'তে চান, তাঁদের এদিকে খেয়াল থাক্‌লে ভাল হয়। গুরুদেব আমাকে যেখানে রাখেন, সেটা প্রত্যেক সাধকের মেনে নেওয়া উচিত। "গুরুকৃপা হি কেবলম্।" তবে ভজন-চতুর, সাধন-চতুর গুরুদাসগণ গুরুদেবের তোষণ, গুরুদেবের প্রসন্নতা

আন্‌তে চায়; তাদের গুরুদেবের প্রিয়তা কোথায়? এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার।

যেমন পুষ্পান্ন, খেচরান্ন ও পরমান্ন তিনটি ঠাকুরের ভোগ্য। কিন্তু আমার ঠাকুর কি ভালবাসেন ? এঁর কোন্‌টা বিশেষ ভোগ্য—সেটা জেনে ভোগের আয়োজন ক'রতে পার্‌লে ভাল। যাঁরা ভজনে খুব হুঁশিয়ার, তাঁদের সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'বে। আমাদের গুরুদেবের প্রিয় ধাম কোন্‌টা ? সেই ধামের প্রতি নজর, দৃষ্টি, সেবায় যত্ন ক'রলে ভজনে দ্রুত উন্নতি লাভ হয়।

—❖—

সমগ্র জীবনটাই ভজনময়

মহাপ্রসাদ সেবন ভক্ত্যাংগ। Whole (সারা) জীবনটাই ভজন-ময়। ঘুমাতে যাই—এটাও ভজন, শৌচে যাচ্ছি—এটাও ভজন। বিশ্রাম করি—এটাও ভজন। বিশ্রাম, শৌচ, মহাপ্রসাদ-সেবন—ইত্যাদি ঠিক থাকলে ভজনে সুষ্ঠুতা আসে। সমগ্র জীবনটাই ভজন-ময়। "গুরুদেবের শরীরটা ভাল নয়, শরীরটা দুর্বল, জ্বর, 'তাঁর শরীর খারাপ' যাবেন না"—এ সব উক্তিতে দর্শনের অভাব। প্রসাদ পাওয়া ভজন। ভজন না হ'লে বেগুন ভাজাটা আমাকে না দিয়ে ওকে দিলে,—এতে মন খারাপ হ'য়ে যায়। পটলগুলো বেছে বেছে দাও। যে পরিবেশন করে; তারও ভজন হয়। বৈষ্ণবদের পরিবেশন করাও ভজন। পরিবেশনকারীর যার উপর রাগ আছে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দিল। কিন্তু যার প্রতি প্রীতি আছে, তাকে ভাল করে দিল। —এতে ভজন হবে না। এরকম ক'রলে ভজন থেকে ছুটি হয়ে যায়।

প্রসাদ-সেবনের সময় মহাপ্রসাদের মহিমা কীর্তন করা উচিত। অন্য কীর্তনও করা যেতে পারে। গান গাওয়া আর কীর্তন—এক কথা

নয়। শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সুখ-বিধানের নাম ভজন বা কীর্তন। শ্রীমন্মমহাপ্রভু গান ক'রতে বলেন নি। তিনি কীর্তন ক'রতে বলেছেন। কীর্তনই ভজন। নিজের সাধন-ভজনের পক্ষে অনুকূল কোন্ কীর্তনটা ক'রবে, তা আগে থেকে চিন্তা করা উচিত। মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক ও সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তন fixed (নির্দিষ্ট)। আরতির সময় অন্য কীর্তন করা চলে না। অর্চনের মন্ত্র fixed (নির্দিষ্ট)। সেই সেই মন্ত্রেই অর্চন ক'রতে হয়। কিন্তু পরিক্রমা-কীর্তন পরিবর্তনযোগ্য। যাঁরা seriously (আন্তরিকতার সহিত) ভজন করেন, তাঁদের হৃদয়ে স্ফূর্তি হয়। কীর্তনের সময় প্রাণ ঢেলে দিতে হয়। প্রাণের রস মাখিয়ে কীর্তন ক'রলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ খুশী হন। কিন্তু যারা সুর-তাল-মানের দিকে লক্ষ্য করে, তাদের অধিকাংশেরই কীর্তন জনগণের মন-তোষণ হয়। গান গাওয়া হয়, কিন্তু কীর্তন হয় না। আরতি একটি শ্রীভগবানের লীলা—এটা একটা সেবা। তাঁর সঙ্গে নিজেকে identified (সম্বন্ধযুক্ত) করে কীর্তন ক'রলে ফললাভ বেশী হয়। পাঠের পরে কিংবা পাঠের আগে কীর্তন নিজের ভজনোচিত হওয়া উচিত।

নাম, রূপ, গুণ, লীলা-কীর্তনের মধ্যে নাম-সংকীর্তনই best (শ্রেষ্ঠ)। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্তনের উপর জোর বা emphasis দিয়েছেন। তিনি নিজে কেবল নাম-কীর্তন করেছেন এবং অন্যকেও করিয়েছেন। অধিকার-বিশেষে লীলা-কীর্তন ক'রতে পারে। মঠে এইরকম অধিকারী বৈষ্ণব নেই, শ্রদ্ধাবান্, ভজনশীল বৈষ্ণবগণ যে কীর্তনটা ক'রতে আদেশ করেন, সেইটা করা উচিত। প্রার্থনাজাতীয় কীর্তন বা নিজের হৃদয়ের কথা নিবেদন করা সাধনের পক্ষে খুব অনুকূল। কীর্তন করার সময় পদগুলির অর্থের সঙ্গে নিজেকে identifide বা মিলিয়ে নিতে হবে। কীর্তনটা ভজন না হলে গান গাওয়া হয়ে যাবে। কীর্তনটা ভজন, তাতে নিজের পারমার্থিক অনুশীলন হয়, ভজনে uplift (উন্নতি) হয়। গান গাইলে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, অপরের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, কিন্তু কীর্তনে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের তোষণ

হয়। কীর্তন ভজন না হলে ভোগের দিকে নিয়ে যায়। কীর্তন একটা বিশেষ ভজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইহা বিশেষ অবদান। কীর্তন দিয়ে ভজন শিক্ষা—এমনটি তাঁর পূর্বে আর কেউ করেন নি। গান গাওয়াটা ভজনে লাগানো যায়। মহাজনগণ যে নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠ অধিকারে নাম-সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেকে গান গায়—"বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মনোঘেরা—(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)" মনটা যে কোথায় ঘেরা, তা আমার বেশ জানা আছে।

—❖—

ভৌম-প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ-লীলা

শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠধাম থেকে ভৌম-প্রপঞ্চে এসে লীলা করেন—এটি তাঁর অবতার-লীলা। তেমনি অর্চাবিগ্রহও তাঁর অবতার-লীলা। শ্রীবিগ্রহরূপে, শ্রীমূর্তিরূপে, শ্রীঅর্চারূপে তাঁর অবতারলীলার নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য আছে। অর্চাবতার শ্রীভগবানের করুণার বিশেষ প্রকাশ। শ্রীভগবান্ যেমন শ্রীগৌরসুন্দররূপে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে, শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হ'ন, তেমনি শ্রীবিগ্রহও স্বয়ং আবির্ভূত হ'ন। যেখানে তাঁর স্বয়ং অর্চারূপে আবির্ভাব হয়, তাঁকে স্বয়ম্ভু অর্চা বলে। শ্রীবিগ্রহরূপে হ'লেও সাক্ষাৎ তিনিই অর্থাৎ জীবের কল্যাণের জন্য ভগবান্ নিজেই শ্রীমূর্তিরূপে আবির্ভূত হ'ন! যেমন টোটা-গোপীনাথ, সাক্ষিগোপাল, শ্রীজগন্নাথদেব। এঁরাও মৃন্ময়ী, ধাতুময়ী, দারুময়ী, শিলাময়ী প্রভৃতি অষ্টাবিধরূপ-ভেদে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥"

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২৭/১২)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীঅর্চাবতার বা অর্চামূর্তি আট প্রকার—(১) শিলাময়ী, (২) দারুময়ী, (৩) স্বুবর্ণাদি ধাতুময়ী, (৪) মৃণ্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী ও (৮) মণিময়ী। স্বয়ম্ভূ বিগ্রহরূপে যেখানে যেখানে তিনি আছেন, সেইখানে তিনি সাক্ষাদ্‌রূপে বিরাজমান। স্বয়ম্ভূ মূর্তি কেউ প্রতিষ্ঠিত করেন নি, উহা স্বয়ং প্রকটিত বিগ্রহ। এঁদের পরিচর্যা করা, সেবা করা খুবই ভাগ্যের কথা। স্বয়ম্ভু অর্চা—করুণার মূর্ত বিগ্রহ। কৌশল্যার ঘরে শ্রীরামচন্দ্ররূপে যেমন এসেছেন, যশোদার গৃহে গোপালরূপে যেমন এসেছেন, শচীমাতার অঙ্গনে যেমন নিমাইচাঁদরূপে এসেছেন, তেমনি স্বয়ম্ভূ বিগ্রহ যে কোন স্থানে আবির্ভূত হন। গোপাল একাকী আবির্ভূত হ'য়ে ঝড়বৃষ্টিতে জঙ্গলে ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সেবা পাওয়ার জন্য তাঁর হৃদয়ে প্রেরণা দিলেন। স্বয়ম্ভু মূর্তির সেবা, তাঁর দর্শন, তাঁর পরিচর্যার দাম অনেক বেশী। স্বয়ম্ভূ বিগ্রহের বৈশিষ্ট্যই আলাদা।

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সমুদ্রে ভেসে এলেন। এইজন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কত লীলা, কত মাহাত্ম্য ! অন্য জায়গায় এ রকম দেখা যায় না।

এই স্বয়ম্ভু বিগ্রহ ছাড়া মহাজনগণ তাঁদের হৃদয়ের ঠাকুরকে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। জীব-কল্যাণের জন্য মহাভাগবতোত্তম সিদ্ধ মহাজনগণ তাঁদের হৃদয়ের ধনকে বাহিরে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকাশিত করেন। [শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের শ্রীগোবিন্দ (স্বয়ম্ভূ), শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীমদনমোহন ইত্যাদি।]

এই দুই রকম ছাড়া শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। এছাড়া বাজারের Calendar, কোন ছবি কিংবা যে-কোন ঠাকুরের শ্রীমূর্তি বাজার থেকে কিনে এনে পূজা করে, ফুল দেয়, ভোগ দেয়। শ্রীমূর্তির এইসব বিভিন্নভাবে প্রকাশ। যাঁরা সৎ-সাধক, ভগবানের সব প্রকাশের প্রতি তাঁদের আদর থাকে। অবশ্য শ্রীবিগ্রহগণের ভিতরে তারতম্য বা লীলা-বৈশিষ্ট্য আছে। শুদ্ধভক্তের

হৃদয়ে তাঁর এই বিগ্রহ-লীলা প্রকটিত হয়। ভক্তগণের সঙ্গে এই বিগ্রহগণ লীলা করে থাকেন। এটা একটা সুগভীর রহস্য। সবই ঠাকুর, কিন্তু সব ঠাকুর সমান নন, বৈশিষ্ট্য আছে।

ভক্তি-সাধকগণ কোন প্রকাশের প্রতি অনাদর করে না। ক্যালেণ্ডারের ছবিতে ফুল দেয়। সেই সকল শ্রদ্ধাকে encourage (উৎসাহিত) করেন। শ্রীবিগ্রহগণের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের তারতম্য নজরে আসা দরকার। কোন্ বিগ্রহের কি মহিমা, কোন্ বিগ্রহ জাগ্রত—এসব শুদ্ধ ভক্তের প্রাণে খেলে থাকে। শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কাছে গোপালের কিছু লুক্নো নাই। কিন্তু অন্য লোকের কাছে তিনি ভোগা দিয়ে দেন।

শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীভগবানের করুণাবতার। ভক্তি-সাধকগণের শ্রীবিগ্রহসেবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া খুব ভাল।

—❖—

গুরু-শিষ্যের নিত্য মধুর সম্বন্ধ

যার যেমন অধিকার, তার তেমন মর্যাদা করা উচিত। ভক্তি-সাধকের প্রত্যেকের একটা মর্যাদাবোধ থাকা চাই। যাঁদের ভক্তিবল, সেবাবল বা প্রীতিবল বেশী, তাঁরা শ্রেষ্ঠ সাধক। যাঁরা সেবার দায়িত্ব বহন ক'রছেন, তাঁদের দেখ্লে গুরু-বৈষ্ণবের আনন্দ হয়। ভক্তিরাজ্যে সব সমান নয়। শ্রীশ্রীরাধারাণী যা, অমুকেও তা—এটা নয়। বয়স বেশীর জন্য position (যোগ্যতা) পয়সা বেশীর জন্য position (সম্মান) জড় জগতে হয়। কিন্তু ভক্তিরাজ্যে এসবে position হয় না। ভক্তিবল, প্রীতিবল থাকা চাই।

অনেকে গুরুদেবের কাছে কৃপা চায়—চিঠিতে লেখে, মুখেও বলে। কিন্তু কোন কিছু ক'রতে বল্লেই অমনি দণ্ডবৎ দিয়ে চলে যায়। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া চাই।

পিতা ও পুত্রের যেমন সম্বন্ধ, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, ঠিক তেমনি গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ। কিন্তু দোকানদার ও খরিদ্দারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—ইহা দেনাদার ও পাওনাওয়ালার সম্বন্ধ। মাষ্টার ছাত্রকে পড়ায়, মাহিনে নেয়, তবে পড়ায়। এগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু বাবা ও ছেলের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। ছেলে কত কি অন্যায় করে, কত অসুবিধা করে! তবু তার স্বার্থের জন্য জমি-জমা ও টাকাকড়ি রেখে যায়। পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে প্রীতি বা প্রিয়তা থাকে বলে পুত্র অন্যায় ক'রলেও তার জন্যই সব টাকাকড়ি রেখে যায়। সেই রকম স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ। স্বামী স্ত্রীকে খেতে দেয় না, তবু স্ত্রী স্বামীর সেবা ছাড়ে না। স্ত্রীকে ভাল কাপড় ও গহনা দেয় না, তবু কোন অসুবিধার কথা জানায় না। কারণ প্রিয়তা আছে। আর যে স্ত্রীলোক খেতে পেলাম না, পরতে পেলাম না বলে, সে কুলটা। প্রিয়তা থেকেই সম্বন্ধ হয়। স্বার্থ নিয়ে প্রীতি হয় না। যেখানে স্বার্থ, সেখানে দোকানদারী ব্যবসা। গুরু আর শিষ্যের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে প্রিয়তা থাকে। সেখানেই প্রেম ফল ধরে। গুরু করেছি—তিনি মন্ত্র দিয়েছেন, আমি প্রণামী দিয়েছি। আর কি সম্বন্ধ ? এগুলি দোকানদারী কথা যেখানে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হয়, সেখানে পরমার্থ লাভ হয়। সম্বন্ধের গোড়াটা হ'লো প্রীতি বা সেবা। প্রীতি না হ'লে সেবাও হয় না, সম্বন্ধও হয় না। সেজন্য মন্ত্রের আদান-প্রদান হ'লেও গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হয় না, তবে মন্ত্র নিলে সম্বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেখানে প্রীতির সম্বন্ধ হয়, সেখানে ফল অনিবার্য। যেমন পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্বামী ও স্ত্রীর একটা সম্বন্ধ, তেমনি গুরু ও শিষ্যের একটা সম্বন্ধ। জগতে গুরু অনেক আছে। মন্ত্র দেয়, দক্ষিণা নেয়—এমন গুরু দোকান অর্থাৎ মঠ, মন্দির ও আশ্রম খুলে বসে আছেন। তাঁদের কাছে গেলে ফিরিয়ে দেন না। গুরু অনেক জোটে, কিন্তু শিষ্য অনেক কম। কেউ হয়ত বল্‌তে পারেন—এখানে ত আপনার অনেক শিষ্য। এরা মন্ত্র নিতে পারে, কিন্তু শিষ্য নয়। অনেক মঠ, মন্দির-আশ্রম দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু শিষ্য খুব কম জোটে।

শিষ্য কে ? যে শাসন স্বীকার করে। 'শাসন' মানে মারধর করা, প্রহার করা, গালাগালি দেওয়া। কিন্তু 'শাসন' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রহার নয়, 'শাসন' মানে সংশোধন, উন্নয়ন বা মঙ্গল-বিধান। যে position-এ শিষ্য আছে, তার সেই অবস্থা থেকে উন্নয়ন অর্থাৎ উপরে উঠাইয়া দেওয়া। যে শাসনযোগ্য, সে শিষ্য। যাকে শাসন, regulate (নিয়মন) করা, diaect (পরিচালিত) করা যায়, পরিপালন করা যায়, সে শিষ্য। গুরুদেব আমাকে যেমন ইচ্ছা সে রকম আমাকে চালান, আমি তাঁর শাসন, নিয়ম, guidance (পরিচালন) মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। এরকম শিষ্য খুব কম। মন্ত্র নেওয়ার শিষ্য হাজার হাজার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হয় না। কাজেই যে শিষ্য হয়, সে নিজেকে গুরুদেবের হাতে পরিচালিত হতে চায়। অধিকাংশ লোকেরই শাসন গ্রহণ ক'রবার ইচ্ছা নেই। খুব কম লোকেরই শাসন গ্রহণ ক'রবার ইচ্ছা আছে। যাদের আবার ইচ্ছা আছে, তারা সব সময় গুরুদেবের আদেশানুযায়ী পেরে উঠে না। প্রাক্তন কর্মের ফলে তাঁরা ঠিকমত আদেশ মান্‌তে পারেন না। নিজেকে গুরুদেবের ইচ্ছায় পরিচালিত করবো—এই সংকল্প গ্রহণ ক'রলে 'শিষ্য' নামের অধিকার এলো। আর যারা শাসন স্বীকার ক'রতে চায়, এবং গ্রহণ করতে পারে সে মহা-ভাগ্যবান্‌। যে শিষ্য শাসন চায় এবং গুরুদেবের কাছ থেকে শাসন পায়, সে যথার্থ শিষ্য। শিষ্যদের মধ্যে তিনটি category (শ্রেণী) বা তিনটি class (শ্রেণী) এর কথা বলা হচ্ছে—(১) একদল আছে যারা শাসন চায় না, শাসন পায় না—অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর ; (২) আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা শাসন চায়, কিন্তু তা পালন ক'রতে পারে না। এই শ্রেণীর লোক কিছু কিছু আছে। যারা শাসন করলেও মানে না, বল্‌লেও করেও না—তাদের চেয়ে এরা ভাল। (৩) যে গুরুদেবের শাসন চায়, নিয়মন চায়, guidance চায় এবং গুরুদেবের শাসন পেয়ে সেই অনুযায়ী চল্‌তে পারে, সে উঁচু class (শ্রেণীর) এর শিষ্য, সেই যথার্থ শিষ্য, খুব ভাগ্যবান্‌। এঁরা শাসন চায়, শাসন পায়—এরূপ শিষ্যই গুরু হয়। শাসন চেয়েছে, গুরুদেবের শাসন পেয়েছে,

যে শিষ্যকে গুরুদেব গঠন ক'রেছেন এবং গঠন ক'রছেন, সে শিষ্যের গুরুত্ব আছে।

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, মন্ত্র নিলেই শিষ্য হয়ে যায়। তবে মন্ত্রের আদান-প্রদান হ'লে শিষ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা শাসন মেনেছে, তাদের শিষ্য হবার অধিকার এসেছে। যে শাসন চেয়েছে, শাসন পেয়েছে—যে যথার্থ শিষ্য। গুরুবর্গ তাঁকে নিয়মন, পরিচালন ও পরমার্থ-পথের ইংগিত দেন। ওপথে যেও না—এপথে যাও। যে তাঁর নিয়মন মেনে ঠিক পথে চলে, সে শিষ্যই গুরু।

অনেক মন্ত্র নেওয়া শিষ্য এসে বলে,—"প্রভো ! আমাকে কৃপা করুণ, আশীর্বাদ করুন"—কেন এরূপ প্রার্থনা করে। সাংসারিক অসুবিধাগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরূপ প্রার্থনা জানায়। পরমার্থ-মঙ্গল-লাভের জন্য প্রার্থনা করে না। "আপনার ইচ্ছামত আমাকে গড়ুন"—আমি কাদা-মাটি—আমাকে কলসী, ঘট, যা আপনার ইচ্ছা তাই গড়ুন। শিষ্য যদি serious হয়, তবে সেখানে সম্বন্ধ গড়ে উঠে। যেখানে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেখানে প্রেম-ফল এসে যায়।

স্বামী-স্ত্রীর যেমন সম্বন্ধ' তেমনি গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ। গুরুদেব শিষ্যকে যা ইচ্ছা, তাই ক'রবেন। যাকে গাল দেওয়া যায়, লাথি মারা যায়, সে শিষ্য। যাকে গালি দেওয়া যায় না, লাথি মারা যায় না, প্রহার ক'রতে পারা যায় না—সে শিষ্য নয়। যাকে শাসন, পরিচালনা ক'রতে পারি না, আদেশ ক'রতে পারি না—সে শিষ্য নয়। গুরু যদি ঠিক গুরু হয়, শিষ্য-গুরুর সম্বন্ধ বা প্রীতি যদি হয়, তাহ'লে ঠিক ফল ফলে। এর—কম শিষ্যের খুব অভাব। যথার্থ শিষ্য হ'বার জন্য যত্ন করা উচিত।

গুরুদেবের শাসন চাই—তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রবো। শুধু মুখে চাইলে হ'বে না, লেখায় চাই, প্রাণে চাই মনে

চাই—সর্বতোভাবে শাসন চাই। এ রকম হ'লে মঙ্গল অনিবার্য। এ রকম চিত্তবৃত্তি হ'লে ফল ফল্‌তে দেরী হয় না। প্রণাম-প্রণামীর অভাব নেই। ছবিতে ফুল দেওয়ার শিষ্য অনেক আছে। কিন্তু যথার্থ শাসন মেনে জীবন গঠন করার মত ইচ্ছা খুব কম লোকেরই আছে। যারা মন্ত্র পেয়েছে, তাদের শিষ্য হবার জন্য সাধন করা দরকার। যথার্থ শিষ্য যেমন কম, তেমনি যথার্থ গুরুও কম। গুরু অনেক হয় না। পরমার্থ গুরু একজনই হয়। যেমন ভগবান্ এক, তেমনি গুরুও এক। বেশী হয় না—এটা আলাদা কথা।

পরিক্রমারূপ ভক্ত্যংগ-যাজনকে পাদসেবন বলে।

শ্রীমন্দির তুলসী দিয়ে সাজানো হয়েছে। তাই শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতির উদ্দীপন হয়। আলো ও পাতাবাহার দিয়ে সাজালে beauty (সৌন্দর্য) ফুটে উঠ্‌তো না। যাদের চোখ আছে, তারা এ অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দেখ্‌তে পায়, অনুভব করে। যারা ভক্ত্যংগ যাজন করে, তাদের প্রতি আমার খুব দৃষ্টি যায়। প্রত্যেক বিষয়ে আমার interest (আগ্রহ) আছে। আমি সব ভক্ত্যংগে হয়ত যোগদান করি না কিন্তু যারা করে, তাদের সেই প্রচেষ্টা দেখে আনন্দ পাই।

—❖—

সেবার ফলে আরও সেবা-লাভ

অর্চ্চন-মার্গে বিশেষ সাবধানতা, বিশেষ শুচিতা অবলম্বন করা দরকার। এই শুচিতা রান্নাঘরে, ভাণ্ডারে ও মন্দিরে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ঠাকুর-সেবায় সব রকমের শুচিতা না হ'লে অর্চ্চনের অপরাধ হ'বে। সেবকের অসাবধানতায় ভোগের থালায় পা লেগে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলা দরকার। কেউ হয়ত মনে ক'রতে পারে—অত কি আর পারা যায়। সেবা ক'রতে গেলে এ রকম প্রায়ই হয়ে থাকে। এগুলি অপরাধমূলক কথা। অর্চ্চনে বিশেষ মর্যাদা চাই।

যারা এসব অপরাধ করে, তারা সেবা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যায়। পৈতা ঝুলিয়ে দিলেই ব্রাহ্মণ হ'য়ে যায় না। মর্যাদাবোধে, শুচিতাবোধ এলে ব্রাহ্মণতা এসেছে বুঝতে হ'বে। নইলে চণ্ডালত্ব আছে, পৈতা পরলে কি হবে? যারা অর্চনের বা পূজোর যোগাড় করে দিচ্ছে, তাদেরও হুঁশিয়ার থাকতে হ'বে। তাঁর সেবা-সম্বন্ধে সাবধান থাক্‌লে তিনি খুশী হন। সেবার পুরস্কার হ'লো আরও বেশী সেবা-লাভ। তখন আর leisure (বিশ্রাম) নেই। তিনি যাঁর সেবা গ্রহণ করেন, তাঁকে আরও বেশী সেবা দেন। আর যার সেবা গ্রহণ করেন না, যার সেবায় অপরাধ হয়, তাদের সেবা থেকে ছুটি হয়ে যায়। সেবা-অপরাধের ফল হ'লো সেবা থেকে বিচ্যুতি। যাদের সেবা গ্রহণ ক'রছেন না, তাদের তিনি পছন্দ ক'রছেন না, তাদের মঠের সেবা থেকে দূরে নিয়ে যান। মুখ ফুটিয়ে কিছু বল্‌ছেন না, কিন্তু এমন একটি চিত্তবৃত্তির উদয় করান, যার ফলে মঠে থাকা আর সম্ভব হয় না। এগুলি লক্ষ্য করবার বিষয়। তুমি এমন কিছু করো, যা তিনি চাচ্ছেন না। যার সেবা গ্রহণ করেন না, তার সংসার-বৃদ্ধির বাসনা হ'বে, সংসারের প্রতি ভোগ-বাসনা বাড়্‌বে, স্বাস্থ্য ভাল হ'বে, প্রতিষ্ঠা বাড়্‌বে, ধন বৃদ্ধি হবে কিংবা মনের মধ্যে এমন একটি বৃত্তি জাগ্‌বে, যার ফলে আর সেবা ক'র্‌তে পারবে না কিংবা স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যাবে—এমন ব্যারাম হ'বে যার ফলে সেবা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হ'য়ে যাবে। এ সমস্ত অপরাধের ফল। অপরপক্ষে যার সেবা ঠাকুর গ্রহণ ক'রেছেন, তার সংসার বাসনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাক্‌বে। যার সেবা তিনি গ্রহণ ক'রছেন, তার দীনতা, নিষ্কঞ্চনতা এসে যায়; নিজে দীন-হীন, কাঙাল, বৈরাগী হয়; প্রেমে ভাসতে থাকে' কথায় কথায় অশ্রু বেরিয়ে আস্‌বে; হৃদয় বিগলিত হবে— সেবায় উৎসাহ হ'বে। যাঁরা চেতন রাজ্যের অনুভূতি লাভ ক'রেছেন, তাঁরা এসব দেখ্‌তে পান। কিন্তু যাদের সেবায় অপরাধ হচ্ছে, তাদের চিত্ত কঠিন হ'য়ে যায়, তাদের মধ্যে অচেনতা, জড়তা দেখা দেয়। যাদের চিত্ত তাতেও না, মাতেও না, তাদের তিনি দূরে ফেলে দিচ্ছেন। ঠাকুরের সেবায় দ্রব্যে পা লেগে গেল—তাতে ভ্রুক্ষেপ

করে না, ভয় করে না—ইহা চিত্ত-কাঠিন্যের লক্ষণ। খুব কঠিন চিত্ত হ'লে গুরুদেব কিংবা হরিদেবকেও ভয় করে না। বেপরোয়া হ'য়ে মরবার পথে দাঁড়িয়েছে, ব্রাহ্মণের বংশে জন্মালেও পাষণ্ড হয়—পাষণ্ড অর্থাৎ চিত্ত-কাঠিন্য। যাদের দীনতা, ভয় ও মর্যাদাবোধ নেই, তাদের অর্চ্চন-মার্গে অধিকার নেই। তিনি ত অন্তর্যামী। সব বুঝ্তে পারেন, সব দেখেন, তাঁকে ঠকানো যায় না। অন্তর্যামিরূপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কখন যে কি কল টেপেন, যাদের চোখ আছে, তারা দেখ্তে পায়। যাদের সেবা গ্রহণ করেন, তাদের অধিকতর সেবা লাভ হয়। একটি সেবার পর আর একটি সেবা এসে যায়। এই সেবা দিয়ে নিরন্তর ডুবিয়ে রাখেন, কাছে রাখেন, আত্মসাৎ করেন।

—❖—

সর্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণসেবার নামই আত্মনিবেদন

যে ব্যক্তির শ্রীভগবানের চরণকমলে আত্মনিবেদন করার বৃত্তি দেখা যায়, তাঁর আর পৃথক্ কোন কর্তব্য নেই। আত্মসমর্পণের ভাব যাঁর ভিতরে আছে, তাঁর আখেরের চিন্তা-ভবিষ্যতের চিন্তা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, আত্মীয়-স্বজনের চিন্তা থাকে না। আত্মনিবেদনের মধ্যে দোকানদারী বুদ্ধি থাকে না। তথাকথিত বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, ভাই স্বজনাখ্য-দস্যু। এরা আত্মনিবেদনের পথে বাধা দেয়। শ্রীভগবানের সেবায় সব দিয়ে দিলে বাঁচ্বে কি করে—ভগবান্কে সব দিতে চাচ্ছ—নিজে খাবে কি? শ্রীবিষ্ণুসেবায় কেন দেবে? আমাদের ভোগের জন্য কিছু রাখ্বে না?

"চৈতন্যচন্দ্রের 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ?"

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ৬/৪১)

যে আত্মনিবেদন ক'রতে চায়, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

সে পাগল হয়ে যায়, অর্থাৎ তার আর কর্তব্যবোধ থাকে না। স্ত্রী-পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যবোধ আর নেই এইটার নাম বাতুলতা।

"আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া,
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি।"

—(শরণাগতি, ভজন-লালসা ১৩/৪)

তখন ধর্মাধর্ম-জ্ঞান থাকে না, আত্মহারা হ'য়ে যায়। যাঁর চিত্তে ভগবানের টান এসেছে, ভগবানের আকর্ষণ যে অনুভব করেছে, সে বাতুল হ'য়ে যায়। সাংসারিক বিষয়ে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য-বিচার থাকে না। ভগবানের আহ্বান এসেছে যার কাছে, তার ছেলে-মেয়ের চিন্তা থাকে না, কোন কর্তব্যবোধে থাকে না। এই সব না থাকার জন্যই লোকে বাতুল বলে। বাতুলতা আত্মনিবেদনের ক্রিয়া। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ধর্মাধর্ম বিচার নষ্ট হ'য়ে যায়। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দেখ্‌বে না—তারা কি খেল না খেল দেখ্‌তে চাও না—এরা স্বজনাখ্য দস্যু। যাদের হৃদয়ে আত্মসমর্পণের ডাক এসেছে, তারা এসব বাধা মানে না। ঐসব বিচারশূন্য হয়—পাগল হ'য়ে যায়। শ্রীল প্রভুপাদের সময় এক প্রভুকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা পাগল বল্‌তো। ওঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। তিনি যা আয় কর্‌তেন, সবই শ্রীল প্রভুপাদের পায়ে পৌঁছে দিতেন। শেষ কপর্দক পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। কর্তব্যবোধের আকর্ষণ তার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। কারণ আত্মনিবেদনের গভীর আহ্বান তাঁর হৃদয়ে সঞ্চার হয়েছে। সেইজন্য আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে পাগল বলেছেন। আর শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ বলেছেন যে, এটা তাঁর সিদ্ধি। লোকে যেটা ভাল বলে, সেটা মরণ, সেটা বন্ধন। তারা বলে,—'আমাদের সুখবিধান ক'রতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের তোষণ পর্যন্ত ছেড়ে দিল।' তাদের এই certificate মৃত্যু-সদৃশ। বলি মহারাজ যখন আত্মসমর্পণ করেন, তখন অনেকে তাঁকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বাধা মানেন নি।

"রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥"

—(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৫৯)

পররস, পরানন্দ চাওয়াই শোভন ও সুন্দর। তখন মায়িক জগতের জড়রস শূকরী-বিষ্ঠার মত হ'য়ে যায়। ভগবানের সেবা পেয়ে সে ধন্য হ'য়ে যায়।

"মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ! ॥"

—(শরণাগতি)

ভগবানকে সর্বস্ব দিতে হ'বে। অনেকের ভাব আছে—আমি ভাল লিখ্‌তে পারি, বর্ক্তৃতা ক'রতে পারি—এটা বিষ্ণুর সেবায় লাগ্‌বে। Brainটা, লেখাপড়ার যোগ্যতাটা, intellectual capacityটা ভগবানকে দেবো, আর সম্পত্তিটা, টাকা-কড়িটা দেব না—এটা আত্মসমর্পণ নয়।

'আত্মসমর্পণ' মানে দেহ, আত্মা, ধন, যৌবন, মন-অহংকার—এ সব দিতে হ'বে। শরীরটার দ্বারা মন্দির-মার্জন, বাগানে, কোদাল মারার কাজ ত ক'রতে হ'বে। আমার শুধু কলম চালানোর কাজ, হাতা-খুন্তি চালাব কেন ? এরকম হ'লে আত্মসমর্পণ হ'বে না।

শ্রীমতী রাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা। শ্রীরাধারাণী শ্রীগোবিন্দ-সেবায় সব দিয়েছেন। দেহ, আত্মা, রূপ, যৌবন—সব কিছু।

—❖—

সেব্যের সুখবিধানই সাধন-ভজনের প্রাণকেন্দ্র

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা, পরিচর্যা ও সেবা আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের আদর্শ। আরাধ্য-তত্ত্ব, উপাস্য-

তত্ত্ব বা সেব্যতত্ত্বের সুখ-বিধানই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যখন যে ভক্ত্যাংগ-সাধন করি না কেন, আমাদের লক্ষ্য থাকবে সেব্যের প্রীতি-বিধান। শ্রবণ করি, কীর্তন করি, রান্না করি, ভিক্ষা করি— যে যা করি না কেন—সকলেরই সেব্য বস্তুর সেবা ও পরিচর্যা অর্থাৎ তাঁর সুখ-বিধানের দিকে নজর রাখা উচিত। শ্রীশ্রীগৌর নিতাইকে সুখী করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমার কি সুবিধা-অসুবিধা—সে দিকে লক্ষ্য থাকা ঠিক নয়। আমাদের আরাধ্যদেবের সুখ-বিধান করাই উদ্দেশ্য।

"নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।" (শ্রীল নরোত্তম-গীতি ৩৭) ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা পেতে হ'লে নিতাইর করুণাকে দরকার। "দৃঢ় করি", ধর নিতাইর পায়"—(শ্রীল নরোত্তম-গীতি ৩৭)। 'আরাধ্য' মানে সেবা।

যে ছেলেটি স্কুলে যায়, তার মূল উদ্দেশ্য কি—পরীক্ষায় পাশ করা। সেইজন্য নিয়মিত স্কুলে যেতে হয়, মাষ্টারের কাছে পড়তে হয়। নিজেকেও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা ক'রতে হয়, তবে Matriculation (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় পাশ করে। তেমনি আমাদের এই ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'লো—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে সুখী করা। যে কোন কাজ করি না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য থাকবে সেব্যের সুখ-রচনা। আমি পাঠ করি, বক্তৃতা করি, ঘর ঝাড়ু দিই, রান্না করি, ফুল তুলি, মালা গাঁথি, অর্চন করি, ভিক্ষা করি, পরিবেশন করি গো-পালন করি, বাগানে চাষ করি—এ ভক্ত্যংগ-সাধনের মূল উদ্দেশ্য থাক্‌বে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সুখ-চিন্তা। সব সময় এই মূল উদ্দেশ্যর প্রতি লক্ষ্য না রাখ্‌লে বা এই উদ্দেশ্য ভুলে গেলে বা এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হ'লে ভক্তি-সাধন হ'বে না, ভজন হবে না। ভক্তি-সাধক যা কিছু ক'রবে, তাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখ হয় কিনা দেখ্‌তে হ'বে। এই মূলকেন্দ্র, মূল লক্ষ্য, মূল আদর্শ, মূল উদ্দেশ্য ঠিক থাক্‌লে আমার সাধন হ'বে। এটি থাক্‌লে সম্বন্ধের সঙ্গে সাধন হবে। যে যেখানে থাকুক্—মঠে

থাকুক্, গৃহে থাকুক্—সকলেরই এক লক্ষ্য থাক্‌বে ভগবানের প্রীতি-বিধান করা। মঠে থাকি, লাল কাপড় পরেছি, সন্ন্যাসী হয়েছি, পাঠ কীর্তন করি, ভিক্ষা করি, লেখাপড়ার কাজ করি, শুধু তোমাকে সুখী ক'রবার জন্য। তুমি যদি সুখী না হও, সবই ব্যর্থ। কেন্দ্রে বা লক্ষ্যে শ্রীহরিতোষণ হয় কিনা, তা সকলের নজরে রাখা উচিত। গৃহস্থ হও, ছেলেমেয়ে পালন কর, চাকরী কর, চাষ কর বা ব্যবসায় করো কিংবা মঠবাসী হও—যে যে অবস্থায় থাক্, সব কাজের মধ্যে এই লক্ষ্য থাকা চাই। —এটীর নাম সাধন। তাঁদের সুখ-বিধানের প্রচেষ্টার নামই সাধন। এ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির না থাক্‌লে সাধনের নামে, ভজনের নামে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হ'য়ে যায়। খুব গ্রন্থ অনুশীলন কর, অথচ তাঁর সুখের দিকে লক্ষ্য নেই। এগুলি জ্ঞান-চর্চা হবে, জ্ঞানানুশীলন হবে, intellectual pursuit হবে। "কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়।" —(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)। সাধক-জীবনে যারা সেব্যের সুখ-বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখে, তারা বুদ্ধিমান্, তারা সাধন ক'রলে সিদ্ধিলাভ করে। যাদের এই মূল মন্ত্র, মূল লক্ষ্য, মূল উদ্দেশ্য ঠিক নেই, তাদের জীবন ব্যর্থ হয়' সাধনও হয় না। যে যতটা এই লক্ষ্যকে স্থির রেখে সেবা ক'রবে, সে তত বড় সাধক। গ্রন্থ পড়ছো ? কি জন্য পড়ছো ? শ্রীহরির সুখ-বিধানের জন্য যদি পড়ো, তা, হলে ঠিক হলো অর্থাৎ সাধন হ'লো।

বাড়ী ছেড়ে মঠে এসেছ ? কি জন্য এসেছ ? যদি তার সুখ-বিধানের জন্য হয়, তা'হলে সুন্দর হ'লো। তা যদি না হয়, ভূতের বেগার খাটা হ'লো। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ-বিধানের জন্য যদি মঠ বাস করে থাকি, তা'হলে ভক্তির সাধন হচ্ছে। এটা সম্বন্ধ, এটা অভিধেয়। এই লক্ষ্যকে ঠিক রেখে চলা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের কি প্রেসিডেণ্ট, কি সেক্রেটারী, কি সদস্যগণ সকলেরই এই দৃষ্টি স্থির ও অচল থাক্‌বে। এই লক্ষ্য যদি ঠিক না থাকে, সেই গুরু দিয়ে আমার

কি হবে ? যার ভগবানের তোষণের দিকে লক্ষ্য নেই সে গুরু নয়, সে গুরু মায়া। যে গুরু নিজে অন্যকে শ্রীহরিতোষণে নিযুক্ত করেন, তিনি যথার্থ সদ্‌গুরু। যে নিজে শ্রীহরিতোষণ করে না বা অন্যকে হরিতোষণে নিযুক্ত করে না, সেটা একটা কিসের আচার্য। সে গুরু মায়া বা ভূত। "গুরুর্ন স স্যাৎ"—(শ্রীভা ৫।৫।১৮) প্রেসিডেণ্ট হো'ক, সেক্রেটারী হো'ক, বৈষ্ণব হোক—যদি হরিতোষণ না থাকে, তবে কিসের প্রেসিডেণ্ট, কিসের সেক্রেটারী, কিসের বৈষ্ণব ? তিলক কেটেছে, দণ্ড নিয়েছে, পরিব্রাজক হ'য়েছে, শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুখানুসন্ধান নেই, তাঁদের সুখ বিধান করে না—সে কিসের বৈষ্ণব ? "যেই ভজে, সেই বড়।"(শ্রীচৈ চ. অ ৪।৬৭) যে হরিতোষণ করে না, তার শরীর-ধারণই বৃথা। মিথ্যা শরীর কেন বয়ে বেড়াচ্ছি ? সকলের প্রণাম নেওয়ার তার কোন অধিকার নেই।

সাধনরাজ্যে প্রবেশ ক'রে সব সময় শ্রীহরিতোষণের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে সাধন-ভজন হয়। যা কিছু করি, যা কিছু আমার আছে, সব কিছু তাঁর সুখের জন্য দিতে হ'বে। তবেই সম্বন্ধ হ'বে, সাধন হ'বে। শ্রীহরি-সুখ-বিধানই ভক্তি-সাধকের মূল আদর্শ, মূল মন্ত্র—এই বাণী হৃদয়ে গাঁথা থাক্‌বে; বুকে লেখা থাক্‌বে, তবেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যাবে। বজ্রাঙ্গজীকে হার উপহার দেওয়ার পর তিনি বল্‌লেন—এতে কি রাম নাম আছে ? যদি রাম নাম না থাকে, তবে এটা দিয়ে কি ক'রবো ? তোমার শরীরে কি 'রাম-নাম' আছে ? বজ্রাঙ্গজী তখন বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখালেন যে, তাঁর হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীসীতাদেবী বসে আছেন। ভক্ত-সাধক জীবনের আদর্শ হ'লো শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সুখ-বিধান। শ্রীগুরুর তোষণ, শ্রীহরির তোষণ, বৈষ্ণবগণের তোষণ জীবনে চাই—এতে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। সম্বন্ধের সঙ্গে এই লক্ষ্য ঠিক রেখে যদি সেবা করি, পরিচর্যা করি, পাঠ করি, বক্তৃতা করি, পরিচালন করি, তবে সার্থক হবে। এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাক্‌লে সব ঠিক থাক্‌বে। প্রত্যেক গুরুর, প্রত্যেক বৈষ্ণবের, প্রত্যেক শিষ্যের—এই এক লক্ষ্য ধরে চলা উচিত।

এই লক্ষ্য ঠিক রেখে যতটুকু ক'রবে, ততটুকু তার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার, ততটুকু তার বৈষ্ণবতা।

এসব কথা ভক্ত-সাধকের জীবন-মরণের কথা, শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা, প্রাণের কথা। মঠ, মন্দির, গ্রন্থপাঠ, শাস্ত্রালোচনা, বক্তৃতা, রান্না করা, ভিক্ষা করা, অর্চন করা—সব বৃথা, যদি তাঁর সুখ-বিধানের দিকে দৃষ্টি না থাকে। যে অন্য কোন মতলব নিয়ে এখানে আছে, তাকে একদিন না একদিন এখান থেকে সরে পড়তে হবে। এ রকম অন্যাভিলাষীদের জন্য মঠ মিশন নয়।

সাধনভক্তি অর্থাৎ বৈধী সাধনভক্তি—অনেক সময় বোঝা যায়, ধরা যায়। কিন্তু প্রেমভক্তির line-টাই আলাদা। প্রেম ভক্তি অত্যন্ত peculiar (অদ্ভূত) ভাবে চলে। এ সাধারণ জীব এমন কি সাধক জীবও বুঝতে পারে না। কারণ প্রেমভক্তির ক্রিয়াকলাপাদি সম্পূর্ণ পৃথক্।

—❖—

ভক্তের জীবনে সেবাই ব্রত, সেবাই প্রাণ ও সেবাই নিয়ম

ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল ঘরে থাকা বা যে কোন ইন্দ্রিয়-তর্পণ—এগুলি ভুক্তিবাঞ্ছা বা বুভুক্ষা। ভোগ করবার ইচ্ছার নাম বুভুক্ষা। যাদের এসব ভোগবাঞ্ছা আছে, তারা কর্ম করে। কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বুভুক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, নিজের সম্ভোগ-পিপাসা মিটাবার জন্য চাকরি, ব্যবসা ও চাষ ক'রতেই হবে। নিজের এই ইন্দ্রিয়-তর্পনটা ভক্তির প্রতিকূল। ভুক্তিবাঞ্ছা যে ভক্তির বিরোধী, এটা ভক্তিসাধকের জানা আছে। কিন্তু মুক্তি-পিপাসাও যে ভক্তির প্রতিকূল, এ কথাটা অনেকে বুঝ্‌তে পারে না, ধর্‌তে পারে না, এটা খুবই সূক্ষ্ম কথা। 'মুক্তি' মানে বন্ধন থেকে রেহাই। দুঃখ চাই না, ক্লেশ চাই না, অশান্তি, ঝঞ্ঝাট ভোগ ক'রতে চাই না। এগুলি

হলো মুক্তি-পিপাসা বা মুমুক্ষা। শুদ্ধভক্তি-সাধকের পক্ষে মুমুক্ষা অত্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল। অনেকেরই মনে এই শান্তি-প্রিয়তা বা শান্তি-কামিতা আছে। কোন কিছু অসুবিধা-ভোগ হবে না, বিনা হাঙ্গামায় সব কিছু হ'য়ে যাবে,—এরই নাম মুক্তি-পিপাসা বা শান্তি কামিতা। যারা শান্তিতে থাক্‌তে চায়, তারা জ্ঞানী সাধক। শান্তি চায় ব'লে তারা হিমালয়ের গহ্বরে বাস করে। যারা ভক্তি-সাধনা ক'রতে চায়, তাদের শান্তিকামিতা, শান্তিপ্রিয়তা বা মুক্তি-বাসনাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।

কাম বা সম্ভোগ ভক্তি-সাধকের পক্ষে দূষণীয়,—এটা সহজেই বুঝ্‌তে পারে। কিন্তু শান্তি-প্রিয়তা যে ভক্তির-পথের অধিকতর দূষণীয় ও সূক্ষ্ম বাধা,—এটা অনেকেই ধর্‌তে পারে না।

"ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।" এ কথাটা বোঝা সহজ। কিন্তু শান্তিতে থাক্‌তে চাই, নির্ঝঞ্ঝাটে থাক্‌তে চাই, উদ্বেগ, উৎপাত, হাঙ্গামা চাই না—এগুলিও ভক্তিপথে বাধা,—একথাটা অনেকেই বোঝে না। বিনা হাঙ্গামায়, বিনা উদ্বেগে, বিনা উৎপাতে, বিনা অসুবিধায় যা হয়, তাই ক'রতে চাই। ভক্তি-সাধকের অধিকাংশের মধ্যে এরূপ 'ভাব' আছে। এ রকম চিত্তবৃত্তির নামই মুমুক্ষা। এইখানে জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গে মস্ত বড় তফাৎ। উদ্বেগ, অশান্তি, অসুবিধা যাতে হয়, জ্ঞানী তাতে পা দিবে না। সেইজন্য নির্জন পাহাড়ের গহ্বরে, নদীর তীরে একাকী থাক্‌তে চায়। কিন্তু যাঁরা ভক্ত, তাঁর ঝঞ্ঝাটকে ভয় করেন না। সম্ভোগ-পিপাসা থেকে যেমন তাঁরা দূরে থাকেন, তেমনি নির্ঝঞ্ঝাট, শান্তিকামিতা, নির্জনপ্রিয়তা থেকেও দূরে থাকেন। অনেকে মনে করে যে, বাড়ীতে যেরকম ঝঞ্ঝাট-অশান্তি, অসুবিধা ভোগ ক'রেছি, মঠে থেকেও সেই ঝঞ্ঝাট, সেই অশান্তির মধ্যে পড়্‌লাম। মঠে এসেও ত নির্ঝঞ্ঝাট হ'তে পার্‌লাম না। এখানে তবে এলাম কেন ? নির্ঝঞ্ঝাটে যেটা হয়, সেটা ক'রতে রাজি আছি। আমি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চাই—এ রকম চিত্তবৃত্তি মুমুক্ষার লক্ষণ। কিন্তু যারা শুদ্ধভক্ত, শুদ্ধসেবাই যাদের

জীবনের একমাত্র ব্রত, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র আদর্শ, তারা ঝঞ্ঝাট এড়াতে চায় না। যারা ভগবানের সেবা ক'রতে চায়, তারা অসুবিধাগুলির মধ্যে থেকেই সেবা ক'রে যায়। "সেবা সে নিয়ম"—ভক্তের জীবনে সেবাই ব্রত, সেবাই নিয়ম।

আমি কোন সুখ চাই না, শান্তি চাই না, আরাম চাই না, বিরাম চাই না, চাই নিরন্তর সেবা। সেবা ক'রতে গিয়ে অসুবিধা আসুক, দুঃখ আসুক, হাঙ্গামা আসুক,—সবকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। অনেক ভক্ত-সাধকের মনে এই শান্তিকামিতা লুকিয়ে থাকে। অনেকে মনে করে, বাড়ীতে ত বেশ ছিলাম—এখানে এসে দু'টো পয়সার জন্য টো টো করে ঘুরে বেড়াতে হ'চ্ছে, অফিসে কাজ ক'রতে ক'রতে কলম ভোঁতা হ'য়ে গেল। ভক্তি করতে এসেছি, এত অসুবিধা কেন? সংসারের জন্য এই উদ্বেগ, এত অসুবিধা কেন ? সংসারের জন্য এই উদ্বেগ এই অশান্তি, ঝঞ্ঝাট ভোগ করা বন্ধনের কারণ, এতে জীবের অমঙ্গল লাভ হয়। আর শ্রীহরিসেবার জন্য উদ্বেগ, অশান্তি ও ক্লেশ স্বীকার ক'রতে পারলে মঙ্গল হয়। এই ক্লেশের বিনিময়ে ভগবানের সুখ হয়। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।"—(শরণাগতি, আত্মনিবেদন ১৬/৪) ভগবানকে সুখী দেখে জীব আরও সুখ পায়। এটি তার পুরস্কার।

এই মঠের মধ্যে ভোগী আছে অনেকেই। আত্ম-সন্তোষ ভক্তির বিরোধী। একে ছাড়তেই হ'বে। কিন্তু মুক্তিকামিতা, শান্তিকামিতা ভয়াবহ দূষণীয়। যাদের শান্তি-কামনা আছে, তারা শয়তান বেশী। বাহিরে এদের সাধু দেখায়। শান্তিকামীর দল নেংটি পরে ঘুরে বেড়ায়, নির্জনে একা থাকে, বৈরাগ্য দেখায়—এরা real (যথার্থ) সাধু নয়। সাধুর মুখোস পরে বটে, কিন্তু ভিতরে থাকে আত্মসুখ। তাই এরা চরম অসাধু।

যারা ভক্ত, তারা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে সেই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে হরিতোষণ হয়। সেবার চিন্তার জন্য রাত্রে যদি ঘুম না হয়, সেও

ভাল। আমি ঝঞ্ঝাট এড়াতে চাই না, আমি শান্তি চাই নি; আমি চাই শুধু ভগবানের শ্রীচরণকমলের সেবা। শান্তিকামিতা অনেকের হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তারা মনে করে যে, সংসারে ছিলাম ভাল, কিন্তু ভক্তি-প্রতিষ্ঠানে এসে যত ঝঞ্ঝাট। ঝঞ্ঝাট এড়ানোর চিত্তবৃত্তি যাদের আছে, তারা জ্ঞানী। কিন্তু বৈরাগ্য ভক্তের এ আদর্শ নয়। কুন্তীদেবী প্রার্থনা করেছেন যে, যত দুঃখ আসে আসুক্, দুঃখ এড়াতে চাই না। কারণ দুঃখের মাঝেই তোমার স্মৃতি বেশী ক'রে মনে পড়ে। দুঃখ হ'বে না, উদ্বেগ হ'বে না, বসে বসে ভাল ভাল প্রসাদ জুটে যাবে—ঠাকুরের সেবা কি হ'লো না হ'লো সেদিকে লক্ষ্য নেই। ভক্তিপথের এই সূক্ষ্ম বাধা অনেকেই ধরতে পারে না।

লোকটা মঠে এসেছে, অথচ ভাল খেতে চায়—এ আবার কিসের ভক্ত? গেরুয়া পরেছে, এদিকে আবার ফিটফাট থাকে—এ সব দোষগুলি সহজেই ধরা পড়ে। ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চায় না—এই ত সাধু, কিন্তু ওটা জ্ঞানী-সাধুর আদর্শ। গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষকরা প্রায়ই এরূপ চিঠি লিখে। "প্রভো! কি হাঙ্গামার মধ্যে আমাকে রেখেছেন, সেবকরা কথা শুন্‌তে চায় না, একা খেটে খেটে মর্‌ছি।" এমন complaint (অভিযোগ) নিয়তই আস্‌ছে। মঠের সেবকগুলিও তেমনি বলে থাকে—"প্রভো! এ মঠরক্ষকের কাছে থাক্‌তে পারি না। ছিঁড়া জামা পরতে হয়, ব্যারামে ঔষধ দেয় না, ভাল খেতে দেয় না" ইত্যাদি কত রকম অভিযোগ। ভক্তি-সাধকের, মঠরক্ষকদের, মঠ-সেবকদের এই সব ভাব থাকা উচিত নয়। নির্ঝঞ্ঝাটে সেবা ক'রে যাবে, এ হয় না। ঠাকুর সেবা ক'রতে গেলে ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই ক'রতে হ'বে। নিজে ঝঞ্ঝাট ভোগ ক'রবো, তথাপি গুরুদেব বা বৈষ্ণবদের ঝঞ্ঝাট দেব না—এই চিত্তবৃত্তিটা ভক্তি-সাধকের আদর্শ। গুরুদেবকে, বৈষ্ণবদিগকে উদ্বেগ না দেওয়াটাই সেবা। সেবার জন্য যে ঝঞ্ঝাট আসে আসুক, আমি এর মধ্যে প্রভুর সুখ-রচনা ক'রে যাবো। একদিন না একদিন এই সেবার ফল পাওয়া যাবেই যাবে। একদিন তিনি এই সেবককে বৈকুণ্ঠে স্থান

দিবেন— কোলে তুলে নিবেন। ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সেবায় রত থাক্‌লে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তার তুলনা হয় না। এই সেবায় বিমল প্রেমানন্দ পাওয়া যায়। শান্তিকামিতার সঙ্গে এই সেবানন্দের তুলনা হয় না। ঝঞ্ঝাট আমার উপর দিয়ে যাক্, প্রভুর যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়। তিনি সুখে ভজন করুন। চোর এলে যদি প্রভুকেই চেঁচামেচি করতে হয়, তবে পাহারাওয়ালা তিনি রেখেছেন কেন?

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমি একটি সমস্যা নিয়ে শ্রীল গুরুদেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি সেই সমস্যার কথা শুনে আমাকে বললেন যে, আমি নিচে একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুর পুষে রেখেছি আমাকে পাহাড়া দেবার জন্য, সে যখন বিপদে পড়েছে তখন লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে উঠে বলছে 'আমাকে বাঁচাও' 'আমাকে বাঁচাও'। সেই থেকে আমি কোন বিশেষ সমস্যার কথা শ্রীল গুরুদেবকে জানাতাম না।

আমি যখন শ্রীনবদ্বীপ-মঠের দায়িত্বে ছিলাম, তখন কত দায়িত্ব আমাকে পালন ক'রতে হ'তো। অধিকাংশ অশিক্ষিত, গ্রাম্য লোক নিয়েই আমার কাজ ক'রতে হ'তো। অনেক সময় তারা আমাকে উদ্বেগ দিত। কিন্তু কোনদিন আমি শ্রীল গুরুদেবের কাছে অভিযোগ করিনি যে, এ সেবকটিকে সরিয়ে দিন। আমার ভাগ্যে যা জুটেছে, তাকেই বরণ করে নিয়েছি। নিজে কোনদিন অভিযোগ করিনি, তথাপি শ্রীল গুরুদেব বুঝ্‌তে পেরে সরিয়ে দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু আমি বলেছি—যাক্ trouble (উদ্বেগ) দিচ্ছে দিক, পরে ঠিক হ'য়ে যাবে। নিজে ঝঞ্ঝাট পোহাবো, তবু গুরুবর্গকে বিরক্ত কর্‌ব না—এই ভাবটা আমার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। কোন সেবকের বিরুদ্ধে কোনরূপ complain (অভিযোগ) করা, আমার ধাতেই নেই। নির্ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে প্রভুর সেবা করা যায় না,—এ বোধটা আমার সব সময় জাগ্রত ছিল। ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে সাধ্যমত প্রভুর সেবা করে যাবো,—আমার এই চিত্তবৃত্তি আগাগোড়াই ছিল।

শ্রীধাম-গয়াতে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে ভোগ-নৈবেদ্য দেওয়া হয়। সেখানে তিনি পা দিয়েই ভোজন করেছেন। ভগবানের এক একটি অঙ্গ সব করা করতে পারেন। তাঁর কর্ণেন্দ্রিয় শুধু শুনতে পারেন তা নয়, খেতে পারেন, দেখ্‌তে পারেন, সব কাজ ক'রতে পারেন। তেমনি নয়নেন্দ্রিয় শুধু দেখ্‌তে পারে তা নয়, খেতে পারে, শুনতে পারে। এমন কি তাঁর সর্বেন্দ্রিয় সব কাজ ক'রতে পারেন। শ্রীগয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের শৃঙ্গার হয়। রাত্রি ১০টা নাগাদ সহস্র নাম উচ্চারণ করা হয়। এক একটি তুলসী দেওয়া হয়। শ্রীপাদপদ্মে তুলসী-চন্দনাদির দ্বারা শৃংগার করা হয়। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ প্রাকৃত নয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত, চিন্ময় এতেই বোঝা যায়। মানুষের চোখ শুধু দেখ্‌তে পারে, কিন্তু খেতে পারে না। মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাজ সীমাবদ্ধ। শ্রীজগন্নাথদেবেরও সর্ব অংশ প্রকাশিত নেই, কিন্তু তাঁর কমল-নয়নের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর কমল-নয়ন দর্শনের জন্য যেতেন। শ্রীল জগন্নাথদেব স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি শ্রীধাম-বৃন্দাবনে ব্রজবিহারীলাল। এখানে একেবারে ভগবত্তার পরাকাষ্ঠা-প্রকাশ।

—❖—

সংকীর্তন-দ্বারে শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ

সংকীর্তনের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন সহজত বটেই, অধিকন্তু এর আকর্ষণ-শক্তি খুব বেশী। যে নাম কীর্তন করে, তার পক্ষে এ সাধন করা সহজ। অল্প সাধনেই প্রেম ও উল্লাস পাওয়া যায়। সংকীর্তনের দ্বারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা সত্য কথা—এতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নজর এসে যায়। তাঁর একটা উল্লাস হয়। যে কীর্তন করে, সেও সহজে আত্মসাৎকৃত হ'য়ে যায়। যদি প্রাণ দিয়ে, হৃদয়ের উল্লাস দিয়ে কীর্তন করে, তাহ'লে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আকৃষ্ট

হ'য়ে যান। যারা ৩।৪ ঘণ্টা ধরে গ্রন্থ অনুশীলন ক'রছে, তারা যা ফল পায়; তার থেকে যারা মাত্র আধ ঘণ্টা প্রাণ দিয়ে কীর্তন করে, তারা বেশী ফল পায়। কীর্তনে হৃদয়ের মার্জন হয়, অমৃতের আস্বাদন হয়। গ্রন্থানুশীলন-দ্বারা সাক্ষাৎ-সেবাও হয় না। কিন্তু কীর্তন ক'রলে তিনি সাক্ষাৎ কিছু পান। কীর্তনে তাঁর হৃদয়ের আনন্দ বাড়ে। তিনি অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারেন না। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান ক'রে যা হয় না, কীর্তনে অতি সহজে বেশী ফল লাভ হয়। ইহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অদ্ভুত দান। কলিকালে জীব মনের concentration ক'রতে পারবে না। এ জন্য তিনি কীর্তন প্রবর্তন করলেন। তবে এই কীর্তনের মূলটা হ'লো প্রাণ। কীর্তনে প্রাণ থাকা চাই। সুর, তাল, মান, লয়—এগুলি কীর্তনের প্রাণ নয়, এগুলি গৌণ। কীর্তনের সার্থকতা হ'লো হৃদয় বা প্রাণ। প্রাণ না থাকলে কীর্তন সুষ্ঠু হয় না। শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই নৃত্য করেন, কিন্তু কীর্তন করেন না। অন্য সকলে কীর্তন করে, শ্রীগৌর-নিতাই নর্তন করেন। নৃত্য-কীর্তন প্রাণ দিয়ে কর্তে পারলে তিনি সহজে আকৃষ্ট হন। অনর্থ থাক্‌লে কুটিলতা থাকে, ভিতরে গোলমাল থাকলে কীর্তনে প্রাণ দিতে পারে না। সুর-তাল, মান, লয় প্রভৃতি থেকে প্রাণটা হ'লো কীর্তনের সর্বপ্রধান সামগ্রী। যেমন রান্নায় নূনটাই প্রধান। নূন না দিলে অন্য সব মস্‌লা দিলেও সে রান্না খাওয়া যায় না। চিত্ত নির্মল হ'লে সহজে প্রাণ এসে যায়। সুতরাং কীর্তনে ও নর্তনে প্রাণটা সবচেয়ে বড় কথা।

এই কীর্তনের ন্যায় আর একটি সহজ পন্থা আছে, তা হলো তাঁকে খাওয়ানো। তবে কীর্তনের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। কীর্তনে তিনি যত নন্দিত হন, অন্য কিছুতেই তা হন না। তবে সুন্দর সুন্দর আহার্য তৈরি ক'রে তাঁকে খেতে দিলে তিনি সন্তুষ্ট হন। কীর্তনের পরেই এই 'সুখকর ভোগ-রচনার' স্থান। তবে এই খাওয়ানতে হাঙ্গামা অনেক। প্রথমতঃ মন্দির চাই, শ্রীবিগ্রহ চাই, অর্থ চাই, ভাল ভাল জিনিষ চাই, ভালভাবে রান্না করা চাই। তারপর ভালভাবে খেতে দেওয়া চাই। এতে কিন্তু অপরাধের ভয় আছে, অসাবধানতা, ত্রুটির সম্ভাবনা বেশী। নৃত্য-

কীর্তনে অত বাধা নেই। অর্চন করা, বাজার করা, রান্না করার কত হাঙ্গামা! তা ছাড়া এই অর্চন-সেবা থেকে নৃত্য-কীর্তনে ফল বেশী। এতে তাঁর উল্লাস বেশী হয়। তবে এই পড়া অর্থাৎ গ্রন্থানুশীলন থেকে এতে ফল বেশী পাওয়া যায়। এটা পরিচর্যা, এটা সেবা। আমি বই পড়ছি, এতে তিনি কি পান? এগুলি মনন। এতে তিনি খুশী হন। কিন্তু নৃত্য-কীর্তনে তিনি একেবারে বশীভূত হ'য়ে যান। তিনি চোখ ফেরাতে পারেন না। কিন্তু বই পড়লে ও-রকম হয় না।

অর্চনটা গৃহস্থদের জন্য। কেননা, অর্চন না কর্‌লে লুকিয়ে বা চুরি করে খাওয়া হয়। অর্থ, বিত্ত, স্বাস্থ্য থাকলে গৃহস্থদের অর্চন করা উচিত। মানস-অর্চনটা theoretical কথা, কার্যকরী কিছু কথা নয়। ওটা আমি পছন্দ করি না। কারণ উহা Intellectual বা জ্ঞান-চর্চার মত। কীর্তনাঙ্গে সিদ্ধিলাভ তাড়াতাড়ি হয়। অর্চনাঙ্গে ও গ্রন্থানুশীলনে সিদ্ধি পেতে দেরী হয়।

— ❖ —

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যাঁর কাছে থেকে যখন যতটুকু সেবা গ্রহণ ক'রবেন, সে তখন ততটুকু সেবা ক'রতে পারে। আমরা application পাঠাতে পারি। কিন্তু মঞ্জুর করা বা না করা সবই তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর।

শ্রীল প্রভুপাদ সব সময় tour-এ থাক্‌তেন। যখনই ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে কল্‌কাতায় আসতেন, তখন তার ২।৩ দিন পরেই তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে যেতেন। শ্রীধাম-মায়াপুর যে তাঁর প্রাণ, হৃৎপিণ্ড ছিল। মাছকে ডাঙ্গায় তুললে যেমন ছঠ্‌ফট ক'রতে থাকে, তেমনি শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাবার জন্য অস্থির হ'তেন। কারও বাধা-নিষেধ তিনি না শুনে শ্রীধাম-মায়াপুরে চলে যেতেন। একদিন সকলে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিভবনে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে

বসে আছেন ; এমন সময় একজন এসে খবর দিলেন যে, যেখানে নূতন মন্দিরের ভিত খনন করা হচ্ছে, সেইখানে 'অধোক্ষজ বিষ্ণুর' আবির্ভাব হ'য়েছে। সংবাদ শুনে সকলেই বললেন, 'আশ্চর্য হ'য়ে গেছি' শ্রীল প্রভুপাদও বললেন,—"আমিও আশ্চর্য হয়েছি, আমি অধোক্ষজের সম্বন্ধে এতদিন কীর্তন করেছি বলেই কি তিনি আজ এতদিনে ধরা দিলেন ? এই অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীল জগন্নাথমিশ্রদেবের পূজিত শ্রীবিগ্রহ।"

—❖—

শুদ্ধ বৈষ্ণবের সংকীর্তনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরম সন্তোষ

সংকীর্তনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সুখবিধান হয়। সংকীর্তনে ভজন সহজ হয়। সংকীর্তনে চিত্ত-দর্পণ মার্জিত হয়, ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়—এটা গৌণ ফল। মলিন চিত্ত পরিষ্কার হয়, ভব-ভয়, ভব-বন্ধন দূরীভূত হয়। অনেকের চিত্তে দুর্বাসনা আছে, অর্থ-পিপাসা আছে, সংসারের চিন্তা আছে,—সংকীর্তনের আভাসেই—এসব নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু শ্রীহরি-সংকীর্তনের মুখ্য ফল হ'লো "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।" অমৃতের আস্বাদন হয় সংকীর্তনে। হরি-কীর্তনের সাক্ষাৎ ফল পূর্ণামৃতাস্বাদন। এতে নামামৃত, রুপামৃত, লীলামৃত ও পরিকরামৃত আস্বাদিত হয় অর্থাৎ উপলব্ধি হয়, অনুভূতি জাগে। ভগবান অখিলরসামৃতসিন্ধু। সেই রসের অর্থাৎ অমৃতের আস্বাদন হয়। শুধু ভব-নাশ হয় না, নামামৃত, লীলামৃত প্রভৃতির আস্বাদন হয়। নামামৃত, রূপামৃত, গুণামৃত, লীলামৃত, পরিকরামৃত সবই অমৃতময় এই সব অমৃতত্বের উপলব্ধি হয়। নাম অমৃতময়, রূপ অমৃতময়, গুণ অমৃতময়, লীলা অমৃতময়। তাঁর শ্রীবিগ্রহ, তাঁর শ্রীঅঙ্গ—আনখ-কেশাগ্র অমৃতময়। তাঁর পরিকরগণ-সেবকগণ অমৃতময়। শ্রীল রূপগোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী—সকলেই অমৃতময়।

"এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"
—(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)

এঁরা যখন ভজন ক'রেছেন, তখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা প্রকাশিত হ'য়েছে। তিনি প্রভু, সখা, স্নেহময়, মধুর—তাঁর রূপ, গুণ-মহিমা—সব প্রস্ফুটিত হয়েছে। পরিকরগণের সান্নিধ্যে তাঁর অখিলরসামৃতসিন্ধুত্ব উদ্বেলিত হয়, প্রকটিত হয়। তিনি রসময়, রসস্বরূপ। এই রস শুনে আওড়ায় না, নিজে আস্বাদন করেন। এই অমৃত হৃদয়ের অনুভূতিতে এসেছে, অন্তরে আস্বাদন ক'রেছেন। তাঁর রূপ অমৃতময়, তাঁর গুণ অমৃতময়, তাঁর লীলা অমৃতময়, তাঁর পরিকরগণ অমৃতময়—এসব তিনি উপলব্ধি ক'রেছেন, সাক্ষাৎকার ক'রেছেন, নিজের ভিতরে এসে গিয়েছে। ইহাই পূর্ণামৃত-আস্বাদন। যাঁদের চিত্ত মলিন নয়, কামনা-বাসনা যাঁদের চিত্তে নেই, যাঁদের সংসারের বন্ধন নেই, তাঁদের চিত্তে এই রসামৃত-সমুদ্রের আস্বাদন খেলে। সাহিত্যিকতার সঙ্গে গাইছে বা বল্‌ছে তা নয়, নিজে আস্বাদন ক'রে বল্‌ছেন। রসগোল্লা খেয়ে তার আস্বাদন করা এক কথা। আর রসগোল্লা সম্বন্ধে শোনা কথা বলা অন্য ব্যাপার। না খেয়ে বলার মধ্যে আস্বাদনত্ব ও উপলব্ধিত্ব নেই। নির্মল চিত্ত বা অনর্থ-নিবৃত্ত হৃদয়ে এই রসময়ের সাক্ষাৎকার বা দর্শন হয়। ইহাই শুদ্ধ সংকীর্তন।

কৃষ্ণসংকীর্তন মানেটা কি? খোল-করতাল জোগাড় ক'রে কতগুলি লোক নিয়ে গান গাইলেই কীর্তন হয় না। রেডিও আর্টিষ্ট কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ নিয়ে গান গাইলে সঙ্গীতের চর্চা হ'তে পারে, কিন্তু রেডিওর কীর্তনের দ্বারা উপরোক্ত প্রেমামৃত-আস্বাদন হবে না কিংবা সংসার বন্ধনও ক্ষয় হবে না। এখানে শুদ্ধ সংকীর্তনের কথা বলা হচ্ছে। এই শুদ্ধ সংকীর্তন প্রবর্তন কর্‌তে শুদ্ধ মহাজনের প্রয়োজন। শুদ্ধ মহাজন বলতে যাঁকে কীর্তনাঙ্গভক্তি আত্মসাৎ করেছেন, ভক্তিদেবী যাঁকে স্বীকার করেছেন। এই শুদ্ধ বৈষ্ণবের কীর্তনে, নর্তনে, যোগদান

করলে আনুকূল্য ক'রলে, এ কীর্তন দেখ্‌লে, শুনলে, বল্‌লে ভবক্ষয় হয় এবং কামনা-বাসনা স্তব্ধ হ'য়ে যায় এবং চিত্ত নির্মল হ'লে অখিল রসামৃতসিন্ধুর আস্বাদন বা realisation হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যাঁকে আপনজন ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, যাঁকে নিজজন ব'লে গ্রহণ করেছেন, সেই কীর্তন-রস-রসিক, কীর্তন-পরায়ণ, কীর্তন-সেবী, কীর্তন-দাস যখন কীর্তন করেন বা করান, তখনই "নাম অমনি উদিত হয় ভকত-গীত-সামে।" রেডিও আর্টিষ্ট, কিংবা পেশাদার কীর্তনীয়ার কীর্তনে শ্রীনাম-প্রভু উদিত হন না, তাঁর আবির্ভাব হয় না। ভক্তিমান্ কোন ভক্তের প্রবর্তিত কীর্তনে শ্রীনাম-প্রভু আপনা আপনি উদিত হন। কিন্তু অভক্তের কীর্তনে তিনি উদিত হন না। গাঁজায় দম দিয়ে, বিড়ি বা চা খেয়ে এসে সুরের ঝঙ্কার দিয়ে গান গাইলেই কীর্তন হয় না। ভক্ত যখন প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে কীর্তন করেন, তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উপস্থিত হন। এই মহাজন প্রবর্তিত এই সংকীর্তন শ্রবণ ক'রলে, দর্শন ক'রলে, যোগদান ক'রলে অমৃতের আস্বাদন হয়। অখিল রসামৃত-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদির এত মহিমা। মহাজন-কর্তৃক শুদ্ধ কীর্তনে এইসব ফল উদয় করায়। মাছ খায়, মাংস খায়, টাকা-পয়সার হিসাব করে—এরূপ ব্যক্তির কীর্তনকে "ছুঁচোর কীর্তন" বলে। অপর পক্ষে ভক্তিদেবী যাঁর সেবা গ্রহণ ক'রছেন, তাঁর কীর্তনে পূর্ণামৃত আস্বাদিত হয়। এই মহাজন-প্রবর্তিত নৃত্যকীর্তনের আভাসের ফলে চিত্ত মার্জিত হয়, বিষয়-বাসনা দূরীভূত হয়, ভবক্ষয় হ'য়ে যায়। আর যখন নির্মল চিত্তে এই সংকীর্তনে যোগ দেয়, তখন নামরসামৃতের উপলব্ধি হয়, রূপরসামৃত অনুভূতিতে আসে, লীলারসামৃতের realisation (উপলব্ধি) হয় পরিকরামৃতের দর্শন হয়। এতে একেবারে ডগমগ হ'য়ে যায়, সমাধিস্থ হ'য়ে যায়।

কীর্তনে যার প্রাণ আছে, তার সংকীর্তন-শ্রবণ বা কীর্তনের ফলে উক্ত ফল আসতে বাধ্য। কীর্তনে মৃদঙ্গ, ঢাক-ঢোল বাজছে; গলদঘর্ম হ'য়ে যাচ্ছে, অথচ প্রকৃত ফল উদয় করাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে যে, এ যথার্থ কীর্তন নয়। এ সব কীর্তন নামাপরাধযুক্ত, অশুদ্ধ নাম। তবে

এগুলি সম্ভোগের কথা। কমিউনিষ্টের চেঁচামেচি থেকে লক্ষ গুণে ভাল। অশুদ্ধ ভাবে বাইজীর গান, রেডিওর গান, সিনেমার গান, Politics (রাজনীতি) এর চীৎকার থেকে ভাল। কিন্তু তাতে এ সমস্ত ফল উদয় করাবে না। সংসারের কথা থেকে এই নাম-অপরাধ-যুক্ত নামকীর্তন ভাল ব'লে চিরকাল ঐ ক'রতেই থাকি। এ মনোভাব হ'লে ভজনে অধিকতর উন্নতির পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের সংকীর্তনেই যথার্থ ফল পাওয়া যায়।

—❖—

যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোকে ভায়

সকালে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গল-আরতি-দর্শন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ, ভক্ত-সঙ্গে নৃত্য-কীর্তন প্রভৃতি ভক্ত্যাঙ্গ যাজন ক'রে দিনটা আরম্ভ ক'রলে সারাদিনই ভাল যায়। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"—(শরণাগতি) ভোরবেলা প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন, ভক্তসঙ্গে কীর্তন-সহযোগে পরিক্রমা, আদরের সহিত, প্রিয়তার সহিত, প্রাণের রস মাখিয়ে দিনটা আরম্ভ ক'রলে দিনটা শুভ হয়। অর্থাৎ সেদিন হরিসেবা, হরির সুখানুসন্ধান, হরি-রুচিকর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিনটা অতিবাহিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমঙ্গল-আরতি দিনের প্রথম লীলা। "প্রভাতে হেরিলাম তব মুখ, দিন যাবে ভাল।" শ্রীশ্রীমূর্ত্তির দর্শন ক'রে দিনের যাত্রা শুরু ক'রলে মঙ্গল-লাভ হয়। এমন লোক আছে, যাকে দেখ্‌লে দিনটা খারাপ যায়। শ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি-কীর্তন, পরিক্রমায় যোগদান ক'রলে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা-পয়সা ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়,—এরূপ মনোভাব ভাল নয়। এতে আত্মমঙ্গল লাভ হয় অর্থাৎ তাঁর সেবায়, তাঁর অনুশীলনে, শ্রবণে, কীর্তনে দিনটা অতিবাহিত হয়। তবে এই প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান প্রাণহীনভাবে ক'রলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। যারা seriously (আন্তরিকতার সহিত),

earnestly (নিষ্ঠার সহিত) হৃদয়ে প্রেম মাখিয়ে ক'রতে পারে, তাদের দ্রুত মঙ্গল লাভ হয়। The childhood shows the man, as morning shows the day."—(John Milton) ভোরবেলাটা দেখ্‌লে সারাদিনটা কেমন যাবে, তা বুঝা যায়; তেমনি শিশুর বাল্যকালের মনোভাব, জীবনযাত্রা, likes (পছন্দ), dislikes (অপছন্দ) দেখলে বুঝা যায় যে, বড় হলে সে কেমন মানুষ হবে। প্রথম থেকেই শ্রীহরির সুখ বিধানের মধ্য দিয়ে যদি দিনটা আরম্ভ করা যায়, তবে সারাদিনটা শ্রীহরি-সেবায় কাট্‌তে পারে। শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে যদি দিনটা আরম্ভ হয়, তা'হলে খুব ভাল কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু জীবনের সব সময় শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ পাওয়া যায় না। তখন কি শ্রীঠাকুরের প্রাতঃকালীন লীলাগুলিতে যোগদান ক'রতে হবে না ? তা নয়, শ্রীঠাকুরের প্রাতঃকালীন লীলাগুলি সাধক-মাত্রেরই মঙ্গলকর। মোটে না খাওয়ার থেকে চিড়ে খাওয়া ভাল। অন্ন পাওয়া গেল না; সুতরাং চিড়েও খাই কেন, এ বিচার ঠিক নয়, তেমনি শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গ না পেলেও মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ক'রলেই মঙ্গল হয়। আদরের সঙ্গে, প্রিয়তার সঙ্গে যে যতটা ক'রতে পারে, তার তত বেশী ফল লাভ হয়।

ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত হরিস্মৃতির মধ্যে জাগ্রত রাখার জন্য গুরুবর্গ সাধকগণের সাধনার সৌকর্যার্থে এই সমস্ত programme (কার্য-তালিকা) ক'রছেন।

বাইবেলে আছে—সারা সপ্তাহে যে পাপ, অন্যায়, অশুচিতা ও মলিনতা হৃদয়ে জমে, সেইটা গির্জায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রলে ধুয়ে মুছে যায়; দৈন্যের সঙ্গে প্রার্থনা ক'রলে সপ্তাহের পুঞ্জীভূত আবিলতা মার্জিত হয়, দূরীভূত হয়। ওরা সপ্তাহে একবার করে; কিন্তু শুদ্ধভক্তের প্রত্যকটি দিন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত শ্রীহরিসেবায় ব্যয়িত হয়।

ভোরবেলায় মঙ্গলারতির দর্শন ও কীর্তন, পরিক্রমাদি প্রাণহীন routine-works (কার্যসূচী) এর মত ক'রে গেলে খুব ভাল ফল লাভ

হয় না। তবে একেবারে না করার থেকে routine (কার্যতালিকা) এর মতোও করে যাওয়া ভাল। প্রীতির সঙ্গে আরতি দর্শন করলে শ্রীঠাকুরের সুখকর হয়, সাধকেরও আনন্দ লাভ হয়।

ভাল ডাক্তার ঔষধের prescription যেমন করেন, তেমনি খাবারের chartও ক'রে দেন; এক ছক এঁকে দিয়ে যান, যাতে শীঘ্র রোগ নিরাময় হয়। তেমনি আমাদের গুরুবর্গ দৈনন্দিন সেবা-তালিকার chart ক'রে দিয়ে দিয়েছে, এতে পারমার্থিক জীবনের দ্রুত উন্নতিলাভ সম্ভব। গুরুবর্গ পারমার্থিক জীবনের অভিভাবক। তাঁরা আশ্রিতের বা শিষ্যের মঙ্গল চান। সেই জন্য তাঁরা বলেন,—এ রকম ভাবে চল্‌লে, এই ভাবে সেবা ক'রলে, নিয়ম-পদ্ধতিগুলি ঠিক ঠিক মত ক'রলে পরমার্থ সম্পদ লাভ হ'বে। আমাদের সঙ্গে সেই আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশকে follow ক'রলে (মেনে চল্‌লে), অনুসরণ ক'রলে, যথাযথ পালন ক'রলে সাধনটাও ঠিক হয়। আনুগত্য-সহকারে তাঁদের নির্দেশ মেনে চল্‌তে পারলে ভজনে উন্নতি হয়। ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। শিক্ষকগণ ছাত্রদের যেমন direction দেন বা চালনা করেন, যেমন coaching (শিক্ষা) দেন, সেইবাবে পড়লে, মুখস্থ করলে ভাল result (ফল) করতে পারে, তেমনি শুদ্ধ-ভক্তি-সাধকগণও গুরুদেবের নির্দেশ, আদেশ ও উপদেশ ঠিকমত পালন ক'রলে ভাল ফল পেতে পারে। যে সব সৎসাধক ঠিক ঠিক হরিভজন ক'রতে চায়, তাদের গুরুদেবের নিকট থেকে আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ নিয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে চল্‌তে হবে। গুরুবর্গ শ্রবণ, কীর্তন, পরিক্রমণ ও সেবাদির নির্দেশ ও ইঙ্গিত দান করেন। সেই নির্দেশানুসারে কাজ আরম্ভ ক'রলে ফল-লাভ সুনিশ্চিত। গুরুদেবের নির্দেশে যে seriously (দৃঢ়তার সহিত) সাধন করে, সে দ্রুত ফল দেখ্‌তে পায়। যে কেবল হুজুকে মাতে, নিজের ভজন-নিষ্ঠা ও সাধনের প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য নেই, তার ফল-লাভ অনিশ্চিত ব্যাপার। যে ছাত্র যা খুশী তাই পড়ে, desultory (শৃঙ্গলাহীন ভাবে) reading পড়ে, সে ভাল ফল ক'রতে পারে না।

Seriously (দৃঢ়তার সহিত), sincerely (আন্তরিকভাবে সহিত), নিষ্ঠার সঙ্গে হরিভজন করা দরকার। গুরুদেবের নির্দেশ-মত চল্‌লে এক বছরের মধ্যে ভাল ফল পেয়ে যায়। যাদের Seriousness নেই, নিষ্ঠা নেই, তাদের ফল পেতে দেরী হয়। Seriousness-টাও সাধন। Seriousness-টা আসে গুরুদেবের কাছ থেকে। তিনি যে সমস্ত কথা বলেন, নির্দেশ দেন, ইঙ্গিত করেন, সেগুলি হৃদয়ে গেঁথে রাখ্‌তে হয়। যে কথাটা, যে নির্দেশটা তিনি দিচ্ছেন, সেই নির্দেশের প্রতি tenacity (নাছোড়বান্দা ভাব) থাকা চাই। হরিভজন যারা ক'রতে চায়, তাদের গুরুদেবের প্রদর্শিত পথে তাঁর নির্দেশে চল্‌তেই হবে। অনেক সময় গুরুদেব হয়ত "এটা করো, সেটা করো", এরকম clear (স্পষ্টভাবে) বল্‌ছেন না। কিন্তু তাঁর দিকে যাদের নজর আছে, তাঁর নাক, মুখ, চোখ, কান দিয়ে কি বেরুচ্ছে, তারা তাঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌তে পারে। তিনি কথায়, ইশারায় সাধনের ইঙ্গিত দিয়ে যান। যারা বুদ্ধিমান্ (intelligent), তা বুঝে নিয়ে সাধনায় লেগে যায়। Intelligent মানে যারা খুব মুখস্থ ক'রতে পারে, ভাল reproduce ক'রতে পারে, ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারে—এসব লোকের কথা বলা হচ্ছে না। তবে বুদ্ধিমান্ কারা ? তারা ঐ সব ইঙ্গিত পেয়ে জীবনে practice (সাধন) করে, অনুশীলন করে, অভ্যাস করে তাদের বুদ্ধিমান্ বলা হচ্ছে। গুরুদেবের কাছ থেকে সাধনের inspiration (অনুপ্রেরণা) আসে। গুরুদেবই ভজন-সাধন-পথের পথপ্রদর্শক, তিনি light (আলো), তিনি আমাদের guide (পরিচালক)। গুরুদেব অনক সময় শুধু ইঙ্গিত করেন, শিষ্যরা সে ইঙ্গিত বুঝে সাধন ক'র্‌তে পারে। যেমন পাঠশালার মাষ্টার মহাশয়রা ছেলেদের হাতে ধ'রে লিখে দেন। কিন্তু Post-gradiate Professor বা Theacher তা করেন না, শুদ্ধ hint (ইঙ্গিত) দিয়ে যান। সেই রকম সাধনরাজ্যে যাঁরা গুরুদেবের ইঙ্গিত, তাঁর হৃদয়ের ইচ্ছে বুঝ্‌তে পেরে সেই অনুসারে কাজ করেন, তাঁর অল্প সময়ের মধ্যে ফল লাভ অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ ক'রতে পারেন।

—❖—

দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সংকীর্তন

যাঁরা কৃষ্ণদাস কৃষ্ণসেবক, তাঁদের প্রধান লক্ষণ হ'লো—তাঁরা দীন। কৃষ্ণদাসগণের প্রধান পরিচয় হ'লো দীনতা অর্থাৎ তারা নিজেকে দীন-হীন মনে করে। 'দীন' মানে কিছু নেই, যোগ্যতাহীন, আমি যে কিছু করতে পারি, এ বোধটা থাকে না। আমি যা কর্‌তে যাই, সবই খারাপ হয়ে যায়; সেব্যের সুখবিধান হয় না। "দৈন্য'টা অন্য ভাষায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

—(শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোক)

নিজে অমানী অর্থাৎ নিজে কোন মান চায় না, অথচ অন্যকে মান দেয়—এর নাম হ'লো সুনীচতা। দৈন্যই হ'লো বৈষ্ণবের ভূষণ, বেশ, অলঙ্কার। দৈন্যই বৈষ্ণবের সৌন্দর্য এনে দেয়। বৈষ্ণবের শোভা বা পোষাক-পরিচ্ছদ হ'লো এই দৈন্য। এই দৈন্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বড় প্রীত হ'ন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের দৈন্যে তিনি বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বৈষ্ণবদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে প্রসাদ পেতে চান নি। তাঁকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি বল্‌লেন,—"বৈষ্ণবগণ আগে প্রসাদ পান, আমি পরে পাবো।" শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আলিঙ্গন কর্‌তে চান্, কিন্তু শ্রীসনাতনপ্রভু নিজেকে যবন, অস্পৃশ্য, নীচ জাতি বলে দূরে রাখ্‌তে চান; অথচ নিজে কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ, অত বড় পণ্ডিত, তবু তাঁর কি দৈন্য ! "আমি untouchable (অস্পৃশ্য), তোমাতে আমার কিছুমাত্র প্রীতি নেই, সেবাবৃত্তি নেই।" শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্সরাসম ভার্যা ছেড়ে এত বড় qualified (গুণী) হ'য়ে পুরীতে নর্দমা থেকে পচা অন্ন ধুয়ে ধুয়ে খেয়ে হরিভজন ক'রেছেন। কারও দৈন্য দেখ্‌লে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের অত্যন্ত আনন্দ হয়। বৈষ্ণবগণের সবচেয়ে

বড় ভূষণ—দৈন্য। যার দৈন্য নেই, তার বৈষ্ণবতা নেই। "আমি খুব বড় সেবা করি, আমি না হলে এটা ওটা হয় না।"—এগুলি দাম্ভিকের কথা, অহঙ্কারীর কথা, এগুলি বৈষ্ণবতা নয়। এত সেবা করেও যে নিজেকে হীন মনে করে অর্থাৎ "আমি দীন-কাঙ্গাল, আমি কিছু ক'রতে পারি না, যা করি তাতে ত্রুটি থেকে যায়।" এ-মনোভাব বৈষ্ণবের অলঙ্কার। এ-দীনতাই তাঁর শোভা। যে বৈষ্ণবের যত দীনতা আছে, সে তত শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীহরিদেবের কৃপা আকর্ষণ ক'রতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ সবার আগে গিয়ে বসে, তাতে মর্যাদা-লঙ্ঘন হয়। আগে দাঁড়াবার, আগে বসবার যোগ্যতাই নেই। এগুলি দম্ভ, এগুলি মর্যাদা-লঙ্ঘন। "মর্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে।"—(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৬) এর বিপরীতে হলো দীনতা। "তৃণাদপি সুনীচেন"—তৃণ যেমন মাটির সঙ্গে লেগে থাকে, তেমনি এই তৃণের থেকে আরও নীচ হ'তে হ'বে। যাদের এ-দৈন্য আছে, তাদেরই সহিষ্ণুতা-গুণের উদয় হয়। যত নিন্দা, যত উৎপীড়ন আসুক, তবু সে কাউকে আঘাত করে না। আমাকে মর্যাদা দিচ্ছে না—আমাকে appreciate (সম্যক্ সমাদর) ক'রছে না, আমার গুণ গ্রহণীয় হচ্ছে না, তথাপি সব সয়ে যাচ্ছি। বৃক্ষকে কাট্‌ছে, কোপাচ্ছে, তবু কিছু বল্‌ছে না। এটা সহিষ্ণুতা। দৈন্যের থেকেই এ-সহিষ্ণুতা আসে। লোকে বলে,—এর বড় যোগ্যতা, সুন্দর লিখ্‌তে পারে, ভাল বক্তৃতা দিতে পারে—কত সেবা করে ! অন্যে এসব বলতে পারে। কিন্তু যে যথার্থ সেবক, সে ভাবে কিছু ক'রতে পারলাম না, আমার সেবায় তাঁর সুখ হয় না। কারণ তিনি অদ্বিতীয় সম্ভোক্তা, তাঁর সুখসেবা আমি কি ক'রতে পারি ? আমার সেবা অনেক নিম্নস্তরের। "বহু সেবা অল্প করি মান। "আমি কিসের বৈষ্ণব, আমি কিসের সেবক, পদে পদে আমার অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে। আমার অযোগ্যতার দরুণ কত হাঙ্গামা সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রকে একজন ব্রাহ্মণ গিয়ে বল্‌লেন,—"তোমার পাপের জন্য তোমার রাজ্যে অকাল মৃত্যু হচ্ছে। রাজা হ'য়ে তুমি কিছু ত্রুটি, অন্যায় করেছ, তার

ফলে Premature death (অকাল মৃত্যু) দেখা যাচ্ছে।” মঠের আমি কত ক্ষুদ্র সেবক ! আমার অযোগ্যতার ফলে সেবায় কত ত্রুটি-বিচ্যুতি হ’য়ে যাচ্ছে।

দীনতা বৈষ্ণবের ভূষণ। যার ভিতরে যত দৈন্য আছে, তার প্রতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তত প্রসন্ন। শ্রীহরিকীর্তন ক’রতে হ’লে অমানিতা, সুনীচতা ও দীনতা দরকার। কীর্তনে, শ্রবণে, বন্দনে—সমস্ত ভক্ত্যাঙ্গে তৃণাদপি সুনীচতাদি গুণগুলি প্রয়োজন। শুধু যে হরিকথা বল্‌বে, তারই দৈন্য দরকার, যে অর্চন ক’রবে, তার দৈন্য দরকার নেই—এমন নয়। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে দৈন্য চাই। ভক্তিযোগ সাধন ক’রতে হ’লে সুনীচতা অভ্যাস ক’রতে হ’বে। যে ভক্তি-সাধক যত দৈন্য আন্‌তে পারে, সে তত বড় বৈষ্ণব।

দৈন্য, অমানিতা, সুনীচতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ্‌তে পারে, thesis লিখ্‌তে পারে, ভাল বক্তৃতা দিতে পারে ; অথচ যাদের এক বিন্দু দীনতা, সুনীচতা, সহিষ্ণুতা ও অমানিতা গুণ নেই, তারা বৈষ্ণব নয়। ‘দৈন্য’ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া সহজ, ব্যাখ্যা করা সহজ। কিন্তু সুনীচ হওয়া একটা আলাদা জিনিষ, অনুশীলন করা কঠিন।—“বৈষ্ণব হবার ছিল বড় সাধ। তৃণাদপি সুনীচ শ্লোকে পড়ে গেল বাধ॥” জীবনে হরিভজন ক’রতে হ’লে এ-গুণগুলি অনুশীলন করা দরকার। সুনীচতা practice (অভ্যাস) করা দরকার। সাহিত্যিকের লেখা, বক্তৃতা দেওয়া সহজ। কিন্তু এগুলি অনুশীলন করা কঠিন। যতটুকু সুনীচতা, আমানিতা, দীনতা আস্‌বে, ততটুকু বৈষ্ণবতার পথে চলার সুযোগ হ’বে। সারা জীবন ধরে এ-গুণগুলি সাধন ক’রতে হবে। দণ্ড নেওয়া, লাল কাপড় পরা অনেক সহজ ; কিন্তু সুনীচ হওয়া সারা জীবনে সাধন ক’রতে হয়। দীনতা, সুনীচতা, সহিষ্ণুতার জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কাছে কৃপা প্রার্থনা ক’রতে হয়।

—❖—

শ্রীহরিকথা-প্রচারের আদর্শ

স্নিগ্ধ অনুগত শিষ্যগণ গুরুগৃহ ছাড়া অন্যত্র থাকেন না। প্রচারে গেলে ত অন্যত্র থাক্‌তে হয়। তখন সেখানে গুরুগৃহ, আশ্রম ও মঠের atmosphere (আবহাওয়া) স্বষ্টি ক'রে নিতে হয়। যখন যেখানে থাক্‌বো, মনে রাখ্‌তে হবে যে, আমার ঠাকুর আছেন, আমার গুরুদেব আছেন, আমার সেবা আছে। এ-রকম ভাবটা সর্বদা মনে রাখা চাই। কলির ব্রহ্মাণ্ডে বৈষ্ণবগণ থাকেন না। শ্রীহরিসেবা, শ্রীগুরুসেবার নিকেতনে তাঁরা থাকেন। প্রচারে গেলে মঠেই আছি—এ ভাবটা রাখ্‌তে হয়। মঠে যেমন ভোরবেলা পাঠ-কীর্তন, মঙ্গল-আরতি, তুলসী-পরিক্রমা, হরিসেবা, হরিকথা থাকে, তেমনি প্রচারে গেলেও হরিসেবাময়, হরিকথাময়, পাঠকীর্তনময় জীবন কাটাতে হবে। এইসব নিত্য অনুশীলনীয় ভক্ত্যাঙ্গগুলি নিয়মপূর্বক সংরক্ষণ কর্‌তে হয়। যতটা পারা যায়, এই ভাবগুলি রক্ষা ক'রে চল্‌লে নিজের ভজনে উন্নতি হয়। তা না হ'লে মায়া আক্রমণ ক'রতে পারে। সেবার আনুকূল্য-সংগ্রহই প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। শুধু টাকা পয়সার মধ্যে পড়্‌লে ভজন থেকে ছুটি হ'য়ে যায়। যতদূর সম্ভব মঠের আবহাওয়া স্বষ্টি ক'রে নিয়ে তাতে থাক্‌তে হয়।

প্রচারে গিয়ে ভক্তির অনুকূল আবহাওয়া স্বষ্টি ক'রে নিতে হয়। নিজেরা যখন পাঠ কীর্তনাদি ক'রবে, তখন পাশের শ্রদ্ধালু লোকদিগকে সেই কীর্তনে যোগদান দেওয়ার জন্য উৎসাহিত ক'রবে। নিজেদের আত্মরক্ষা অর্থাৎ ভজন বা সেবা সংরক্ষণের জন্য মঠের আবহাওয়া-স্বষ্টি বিশেষ প্রয়োজন। দেখা যায় যে, সন্ন্যাসীরা চারিপাশে আগুন জ্বেলে মাঝখানে বসে থাকেন। এই আগুন জ্বালায় কেন? যাতে ঠাণ্ডায় collapse (অবসন্ন) না হ'য়ে যায়। পাঠকীর্তন, হরিসেবা, গুরুসেবাই আগুন। এই সেবারূপ ধুনী জ্বেলে রেখে জীবনে সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে হয়। এই আগুনটি কি? তা হলো-ভজন-চতুরতা। নিজেদের

মঙ্গল ও অপরের মঙ্গলোদয় করানোর জন্যই প্রচারের ব্যবস্থা। একা একা প্রচারে যাওয়া সুবিধাজনক নয়। বৈষ্ণবসঙ্গে প্রচারে যাওয়া সুবিধাজনক। বৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়া থাকা উচিত নয়। একা একা যারা প্রচারে যায়, তাদের ভাগ্য মন্দ।

প্রচারে গিয়ে এ-ভাবটা সর্বদা রাখা উচিত যে, আমি শ্রীবিগ্রহের সেবা অর্থাৎ শ্রীগুরু, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহনের সেবার জন্য এসেছি। বহু জায়গায় প্রচারে গিয়ে মঠ পাওয়া যায় না, শ্রদ্ধালু লোক পাওয়া যায় না। সেজন্য মঠ সৃষ্টি ক'রতে হয়।

—❖—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ

'দীক্ষা, মানে আত্মসমর্পণ। দীক্ষাকালে আমি তোমার—এ-বোধটা জাগে। 'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৩) নিজের স্বতন্ত্রতা, আমিত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে দেয়। দীক্ষাকালে নূতন জন্মলাভ হয়। আমি ব্রাহ্মণ, আমি ছোট জাত, আমি ভাল, আমি মন্দ—এসব ভাব থাকে না। আমি এখন তোমার হ'লাম—এভাব অন্তরে উদিত হয়। হে কৃষ্ণ ! আমি তোমার সেবক, আমি তোমার দাস, তুমি তোমার যে সেবায় লাগাতে চাও, আমি সেই সেবাই ক'রতে চাই। আমার অহমিকা, দম্ভ, requisition (প্রভুত্বসহকারে চাওয়া) যা কিছু আছে, সব কিছু দীক্ষাকালে সমর্পণ ক'রতে হয়। দীক্ষাকালে আত্মসমর্পণ চাই অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দেওয়া চাই। নিজেকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী গঠিত হওয়ার জন্য তাঁর শ্রীচরণকমলে ছেড়ে দেওয়া। তিনি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে, তা করুন।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।"

—(শ্রীচৈ. চ. অ ৪।১৯২)

যে ভক্ত হতে চায়, যে ভক্তিযোগে দীক্ষিত হতে চায়, নিজের অহমিকা, অহংবোধ বা অহংভাবটা ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকে বরণ কর, আমাকে গ্রহণ কর। আমার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সব এখন তোমার। তুমি আমাকে guide (পরিচালনা) কর, পথ দেখাও। কোন রকম hesitation (দ্বিধা) না ক'রে absolutely surrender to His Lotus Feet (শ্রীগুরুপাদপদ্মে শর্তশূন্যভাবে আত্মসমর্পণ কর)। দীক্ষার meaning (তাৎপর্য) হ'লো এই আত্মসমর্পণ। যে যতটা আত্মাকে নিবেদন করতে পারলো, তার জীবনে ততটা success (সাফল্য) এলো। "সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।" —(শ্রীচৈ, চ, অ ৪।১৯২-১৯৩)। 'আত্মসম' মানে নিজ-সম। নিজ-সম মানে কি চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ হয়ে যাওয়া নাকি ? তা নয়। তাঁর সেবায় উপযোগী ক'রে নেন, অর্থাৎ যে যত surrender (আত্মসমর্পণ) করে, তিনি তত তাকে আত্মাসৎ করেন। Stiffness (কাঠিন্য), objection (আপত্তি) এবং বাধা যেন কোনরূপে না আসে। 'দীক্ষাকালে ভক্তে করে আত্মসম'—অর্থাৎ জড়ত্ব, জড়-অভিমান, জড়াশক্তি ছাড়িয়ে দিয়ে অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই দীক্ষার ideal (আদর্শ)। এই আদর্শে পোঁছাবার জন্য মূল্য দিতে হয়। যে যত বেশী মূল্য দিতে পারে, তার তত্ত্ব success (সাফল্য)। যেগুলি তোমার আছে, সেগুলি কত দিতে পারছো, তার জন্য প্রস্তুত (Prepared) থাকা চাই। যে বি. এ. পাশ ক'রতে চায়, তাকে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে যেতে হবে। দীক্ষা হ'লেই সিদ্ধি হ'য়ে যায় না। দীক্ষাকালে গুরুকৃপাসিঞ্চিত হ'য়ে অনুশীলন ক'রতে হয়। যে যতটা Seriously (আন্তরিকতার সহিত) এবং অকপটভাবে গুরুদেবের আনুগত্য ও ইচ্ছানুসারে চল্‌তে পার্‌বে, সে ততটা success (সিদ্ধি) বা ফল ক'রতে পার্‌বে।

দীক্ষা না হলে ভজন হয় না। দীক্ষা গ্রহণ না ক'রে নাম জপ ক'রছি, পূজা ক'রছি, কীর্তন ক'রছি,—এগুলি unscientific (অবৈজ্ঞানিক)। "আদৌ গুরু-পদাশ্রয়ঃ"—গুরুপদাশ্রয় ক'রলেই সব হ'য়ে যায়, তা

নয়। এটা আরম্ভ হ'লো মাত্র। যেমন কলেজে ভর্তি হ'লেই পাশ হ'য়ে যায় না। তবে পাশের সম্ভাবনা দেখা যায়।

দীক্ষার পর কি ? 'শ্রবণ-কীর্তন-জলে ক'রয়ে সেচন।" —(শ্রীচৈ, চ, ম ১৯।১৫২) শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন ও সেবা ক'রতে হবে। প্রিয়তার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে, প্রাণের রস মাখিয়ে তাঁর সেবা ক'রতে হবে। তিনি কিসে সুখী হন, সে বিষয়ে সর্বদা চিন্তা ক'রতে হবে। তাঁর সুখ-বিধানে তৎপরতা এবং তাঁর সুখের দিকে নজর থাকা চাই। তাঁর সুখের জন্য sacrifice (স্বার্থত্যাগ), তাঁর সুখের জন্যই সেবা। দীক্ষা না হ'লে, কৃপা না হ'লে তিনি সেবা স্বীকার করেন না। সেবা গ্রহণ করা না করা সবই তাঁর উপর নির্ভর করে। নিজের তরফ থেকে application প্রার্থনা পাঠানো চাই। পারমার্থিক অনুশীলনের পদ্ধতি হ'লো এই দীক্ষা। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে না চল্‌লে ফল আস্‌বে না। পারমার্থিক জীবনের প্রথম কর্তব্য হ'লো দীক্ষা।

—❖—

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা দরকার। জ্ঞান-যোগের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা হয়। জ্ঞানানুশীলন ও ভক্তি-অনুশীলন দু'টি আলাদা। জ্ঞানযোগের বৈশিষ্ট্য হ'লো গ্রন্থানুশীলন, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন— বৈরাগ্য-সাধন, শাস্ত্র-পাঠ ইত্যাদি।

কেবল গ্রন্থানুশীলন intellectualism (বুদ্ধি-ঘাটতি ব্যাপার) ছাড়া কিছু নয়, তার হৃদয়ে আছে জ্ঞানযোগের বীজ। জ্ঞান-যোগের সাধন-বৈশিষ্ট্য হ'লো নির্জনে-বাস, কৌপীন-ধারণ, সমাধি-লাভ ও শাস্ত্রানুশীলন। এটা কিছু খারাপ নয়। তবে এগুলি হ'লো জ্ঞানযোগের

সাধন। Ramkrishna Mission দু'টো দিক্। একটা Mission, আর একটা মঠ। যাঁরা Mission-এর কাজ করেন, তাঁরা relief work (দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকেদের সাহায্যার্থ কার্য), Hospital (চিকিৎসালয় বা রোগি-নিবাস), স্কুল-কলেজ ইত্যাদি করেন। আর যাঁরা মঠে থাকেন, তাঁরা শাস্ত্র অনুশীলন ও ব্রহ্মের উপাসনা ক'রে থাকেন। বৈরাগ্যানুশীলনের দ্বারা সম্ভোগ থেকে দূরে থাকে। এর দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হ'য়ে যায়। এসব লক্ষ্য যাদের থাকে, তাদের বই-পড়ার দিকে ঝোঁক। Tendency (ভাবপ্রবণতা বা ঝোঁক) দেখে কে কর্মযোগের অধিকারী, কে জ্ঞানযোগের অধিকারী, কে ভক্তিযোগের অধিকারী, তা বোঝা যায়। পরতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকগণ কার রুচি কোন্ দিকে, তা নির্ণয় করেছেন। বই পড়া, বৈরাগ্যসাধন, নির্জন-বাসের দিকে যাদের ঝোঁক, তাদের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। নির্বিশেষে, নিরাকার ব্রহ্মে লীন বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এ সমস্ত জ্ঞনযোগের কথা। ভক্তি-প্রতিষ্ঠানে অনেক লোক আছে, তারা অন্য পথে পরিচালিত হয়। ভক্তিযোগে কথা হ'লো—"শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, আত্মনিবেদন ইত্যাদি।" ভক্তি-প্রতিষ্ঠানে এসেও অনেকের বই পড়ার দিকে ঝোঁক থাকে কেবল গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রপাঠ ক'রতে চায়। গুরুমুখে শ্রবণই ভক্তিযোগ। অধ্যয়নকে ভক্তিযোগ বলেন নি। অধ্যয়ন হ'লো নিজে নিজে পড়া। কিন্তু শ্রীমদ্-ভাগবত living personality-র কাছ থেকেই শ্রবণ ক'রতে হয়। গুরুদেব তাঁর উপলব্ধি, অনুভূত সিদ্ধান্তের কথা যখন প্রাণের রস মাখিয়ে বলেন, সেই বাণী শ্রবণ করাই হ'লো ভক্তি। ভক্তিযোগের মধ্যে অধ্যয়নের স্থান নেই। গুরুদেবের শ্রীমুখে কিংবা গুরুদেবের প্রিয়জনের মুখে সিদ্ধান্ত ও উপদেশবাণী শ্রবণ ক'রতে হয়। শ্রৌতবাণী নিজের রুচির মত twist (প্রকৃত অর্থ থেকে বিচ্যুত) ক'রে বলে না। গুরুদেবের বাণী, ঠিক ঠিক অনুশীলন ও অনুসরণ ক'রে ব'লে। গুরুদেবের কথা কীর্তনকারীর হৃদয়ে উপলব্ধি হয়। গুরুমুখে যা শোন, সেইটা বলো। নির্জনে ধ্যান

ভক্তিযোগে নেই। হরিকথা বলাই কীর্তন। গান গেয়ে কীর্তন হতে পারে, বক্তৃতা দিয়েই কিংবা লিখেও কীর্তন হতে পারে। এই কীর্তন ক'রতে হলে শ্রোতা চাই। যে একা থাক্‌তে চায়, নির্জনে থাক্‌তে চায়, সে কীর্তন ক'রতে পারে না। কীর্তন ক'রতে হ'লে শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতা চাই। শ্রোতা নিয়ে থাক্‌তে হ'লে নির্জন-বাস থাকে না। অসৎ সঙ্গ নিয়ে থাকা ভক্তি নয়। সৎসঙ্গ অর্থাৎ শ্রদ্ধালুর সঙ্গে থাক্‌তে হয়। "একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম-সংকীর্তনে।"—(শরণাগতি) নির্জনে থাক্‌লে কীর্তন করা চলে না, ধ্যান চল্‌তে পারে। কীর্তনকারী গুরুদেবের কাছে গেলে শ্রবণ হয়। ভক্তিতে স্মরনাঙ্গও আছে। কি স্মরণ ? নাম, রূপ, গুণ, লীলা-পরিকরাদির স্মরণ। স্মরণের অপেক্ষা রাখে শ্রবণ ও কীর্তন। কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হ'বে। জ্ঞানযোগে ধ্যান ভক্তিযোগে স্মরণ, শ্রবণে ও কীর্তনে স্মরণ হয়। জ্ঞানযোগের ধ্যানটা যে অভিধেয় নয়, তা বলা হচ্ছে না। কিন্তু ভক্তিযোগে স্মরণের পর অর্চন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের পরিচর্যা বা সেবা ক'রতে হয়।

যে ভক্ত-সংঘারামে থেকে সাধন ক'রতে চায়, তাকে নজর রাখতে হ'বে শ্রবণ, কীর্তন ও অর্চনের প্রতি। ভক্তযোগীর এগুলি সাধন। ত্যাগ, বৈরাগ্য বা সমস্ত লোক থেকে দূরে থাকা—ভক্তিযোগের সাধন নয়। যারা ভগবত-সেবা, ভগবৎ-প্রেম, ভগবদ্-ভক্তি চায়, তাদের শ্রবণ-কীর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যারা ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে বৈরাগ্যের দিকে ও বই পড়ার দিকে ঝোঁক দেয় জ্ঞান চর্চা ক'রতে ভালবাসে, তাদের ঠিক পুরোপুরী ভক্তি-সংস্কার নেই। অহৈতুকী বা কেবলা ভক্তিতে কোন মিশ্রণ থাকে না। ভক্তিযোগ করে, রাজযোগ করে, শাস্ত্রানুশীলন করে—এগুলি মিশ্রা ভক্তি। কেবলা ভক্তির অঙ্গ হ'লো শুধু শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, আত্মনিবেদন ইত্যাদি। অনেকে জ্ঞানাযোগের কিংবা রাজযোগের ভেজাল দিয়ে ভক্তিযোগ করে, স্কুল করে, আবার হরিকথার lecture (বক্তৃতা) দেয়।

এখানে কর্মযোগের মিশ্রণ। কেবলা ভক্তিতে অন্য কিছু মিশ্রণ থাক্‌বে না। যার যেমন ভাগ্য, যার যেমন রুচি, যার যেমন পূর্বসংস্কার, সে তেমনি ফল লাভ করে। শক্তিশালী মহাজনের কৃপা পেলে পূর্ব-সংস্কার ও মিশ্র-সংস্কারকে পরিবর্তন করে দিয়ে তিনি কেবলা ভক্তি দিতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তের অহৈতুকী ও অবঞ্চনাময়ী কৃপা যদি বরণ করতে পারে, সেরকম মহাভাগবতোত্তমের কৃপা, সঙ্গ ও আশীর্বাদ পায়, তাঁর আদর্শ ও উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই জীবের শুদ্ধা ভক্তির পথে চলবার মত ভাগ্যোদয় হয়। কেবলা ভক্তি বা অব্যভিচারিণী ভক্তিতে অন্য কোন রকম ভেজাল নেই।

অনেক রকম ভক্তিসাধক আছে যথা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি-সাধক, কর্মমিশ্রা ভক্তি-সাধক, যোগমিশ্রা ভক্তি-সাধক ও কেবলা-ভক্তি-সাধক। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের যে ধারায় আমরা অবস্থিত, তা শুদ্ধা ভক্তির ধারা। শুদ্ধভক্তের কৃপা লাভ হলে কেবলা ভক্তি-লাভ হয়। ভক্তিযোগে প্রাপ্য হলো ভগবান্। এ ভক্তিতে আছে কৃষ্ণানুশীলন। গ্রন্থানুশীলনের কথা নেই। শ্রদ্ধা মানসিক বৃত্তি, ভক্তি ক্রিয়াময়ী শ্রবণ-কীর্তন-অর্চন সবই ক্রিয়া। গুরুদেব ভজনের ইঙ্গিত দিয়ে যান।যে ইঙ্গিত ধ'রতে পারে, গ্রহণ ক'রতে পারে, সে শুদ্ধা ভক্তির পথে এগিয়ে যাবে। যে বুদ্ধিমান্ হয়, সে বুঝতে পারে কর্মমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থেকে কেবলা সম্পূর্ণ পৃথক্। কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা কেবলা ভক্তিতে হয়। ভক্তযোগীদের মধ্যে যারা হুঁশিয়ার, তারা Royal Road-টা ঠিক ভাবে ধরেন, অন্যদিকে diverted হন না। যারা জীবনে শ্রেষ্ঠ জিনিষ পেতে চায়, তাদের চতুর হতে হয়। যা শুনলাম' তাই গ্রহণ করলাম— তাহলে হবে না। জোর কপাল দরকার, বড় ভাগ্য প্রয়োজন। এরকম ভাগ্য বেশী লোকের হয় না। শুদ্ধা ভক্তির কাছাকাছি হয়ত অনেকে যান, কিন্তু রাগানুগা কেবলা ভক্তি লাভ করা খুবই কঠিন।

—❖—

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য"

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য-তত্ত্ব; আর সব আরাধিকাতত্ত্ব। তিনি সেব্য, আর সকলে দাস।

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"
—(শ্রীচৈঃ চঃ আ ৫।১৪২)

শ্রীকৃষ্ণই সকলের সেব্য—একমাত্র আরাধ্য, তাঁর সেবার জন্য সকলে চেষ্টা ক'রছে। কেউ ফুল তুলছে, কেউ মালা গাঁথছে, কেউ অর্চন ক'রছে, কেউ রান্না ক'রছে, কেউ কীর্তন ক'রছে, কেউ ভিক্ষা ক'রছে, কেউ ঝাড়ু দিচ্ছে, কেউ বাসন মাজ্‌ছে, কেউ বা পরিবেশন ক'রছে—সকলেই তাঁর সুখের জন্য ক'রছে। যার যেমন যোগ্যতা, যার যেমন রুচি, সেই রকম ভাবে সকলে সেবা ক'রছে। সকলেই তাঁর সেবক ও সেবিকা। সকলেই প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন সেবায় নিযুক্ত। সেই জন্য একজনের সঙ্গে আর একজনের বিরোধ আস্‌তে পারে না। পরস্পরের কলহ, দ্বন্দ্ব, মাৎসর্য ও হিংসা থাকে না। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বরেশ্বর, আর সকলে ভৃত্য। কেউ মানুক আর না মানুক, সকলেই তাঁর ভৃত্য। এই দৃষ্টিতে সকলকে দেখলে পরস্পরের দ্বেষ-হিংসা, ঝগড়া কলহ থাকে না। 'সকলেই ভগবানের সেবক'। সেইজন্য কাউকে নিন্দা করে না, হিংসা করে না, ঘৃণা করে না, মাৎসর্য বা ঈর্ষা করে না। যাঁরা কৃষ্ণদাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছেন, তাঁদের কোন রকম ভেদ দৃষ্টি থাকে না। বৈষ্ণবগণ ভাবেন যে, সবই ভগবানের স্বষ্ট পদার্থ। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ ইত্যাদি সকলেই প্রভুর সেবা ক'রছে। "প্রভুর আরতি করে চন্দ্র ও তপন।" যত দেব-দেবী আছেন, তাঁদের তাৎপর্য্য এক। কিন্তু সকলের function (কার্যশক্তি) বিভিন্ন। নির্দিষ্ট সেবা দেব-দেবীগণ ব্রহ্মা-শিবাদি লোকপালগণ ক'রে যাচ্ছেন। তাঁরা সকলেই সেবক, সেইজন্য কাউকে ঘৃণা ও অবহেলা করা চলে না।

কেউ যদি বিষ্ণুর সেবক-সেবিকাকে অবমাননা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও নিন্দা করে, তবে সে সবই বিষ্ণুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। কোন দেবদেবীকে ঘৃণা ক'রলে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রলে, অমর্যাদা ক'রলে আরাধ্যদেব কৃষ্ণকেই নিন্দা করা হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কাউকে নিন্দা করেন না। কারণ ঘৃণা, নিন্দা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-ভাব থাক্‌লে বিষ্ণুদাস্য হয় না। কোন জীবের অন্তরে বিষ্ণু-দাস্য-রূপ সম্বন্ধ জাগলে তিনি কাউকে নিন্দা ক'রতে পারেন না। সেজন্য—

"কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥

—(শ্রীচৈ. ভা. ম. ১০।৩১২)

যে লোকটা ঘুঁটে দিচ্ছে, যে লোকটা বাসন মাজছে, তাদের ঘৃণা ক'রলে, অবহেলা ক'রলে ভুল করা হয়। এরাও সেবক—এ বিচার থাকার জন্য কাউকে নিন্দা ক'রতে পারে না। সেই জন্য কৃষ্ণভক্তগণ সকলের কাছে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি দাও' বলে প্রার্থনা করেন। প্রভুর প্রতি তোমাদের যে রকম ভক্তি বা প্রীতি, আমাকে সেই রকম ভক্তি বা প্রীতি দাও। ব্রজদেবীগণ চীরঘাটে কাত্যায়নীদেবীর নিকট কৃষ্ণ-ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণসেবা প্রার্থনা ক'রছেন। তাঁহাদের ব্যাকুল প্রার্থনা ছিল,—"হে দেবী ! আমার নন্দগোপসুতে ভক্তি হোক্, প্রীতি হোক্॥" ব্রজদেবীরা দেবদেবীরে সম্মান দিয়েছেন। শ্রীরাধারাণী সূর্যপূজার ছল ক'রে কৃষ্ণপূজা ক'রেছেন। সূর্যকে তিনি অনাদর করেন নি। সূর্যের কাছে কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা করেছেন। ব্রজবাসিগণ বা বৈষ্ণবগণ শিবকে অগ্রাহ্য করেন না। তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন—"হে শম্ভো! তুমি নিরন্তর পঞ্চমুখে হরিনাম কর্‌ছ। তোমার যেমন শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, প্রীতি ও প্রেম আছে, আমাদের সেই রকম প্রীতি দাও।" শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিব-পার্বতী, মথুরায় গো-কর্ণেশ্বর প্রভৃতি আছেন। ভক্তগণ তাহাদের কাছে প্রার্থনা করেন,—"আমার ভক্তি নেই, তোমরা আমাকে ভক্তি দাও।" বৈষ্ণবগণ শান্তদের সঙ্গে ঝগড়া

করেন না। সম্বন্ধ-বোধ যাদের হয়নি, তারা ঝগড়া ও নিন্দা, তর্ক করে। বৈষ্ণব-মহাজন দেব-দেবীকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা ঈশ্বরীজ্ঞানে পূজা ক'রতে নিষেধ করেন। কারণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি নামাপরাধ-মূলক। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাতেই দেবদেবীগণ যে যার সেবা ক'রে চলেছেন, তাদের সম্মান ক'রতে হবে, অন্যদেবে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা ক'রতে হবে না। যাঁদের হৃদয়ে কৃষ্ণ বসেছেন, তাঁরা স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে কখনও পূজা করেন না। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁর সম্বন্ধ হয়েছে, তাঁর কারও সঙ্গে বিবাদ থাক্‌তে পারে না। কোন দেবদেবীকে, কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা ক'রতে পারে না। কাউকে নিন্দা ক'রলে অপরাধ হয়। ভক্তিতে সুন্দর কথা আছে। যারা অন্যের কৃষ্ণদাসত্ব দেখে না, তারা বৈষ্ণব নয়। যে বৈষ্ণব, সে অন্যের কৃষ্ণদাসত্ব দেখে। সে যথার্থ সেবক, সে ঘুঁটে দেওয়ার লোককে কিংবা পায়খানা পরিষ্কারকারী লোককে ঘৃণা ক'রতে পারে না। স্বতন্ত্র ঈশ্বরবোধে কারো পূজাও করে না, নিন্দাও করে না। এই সিদ্ধান্ত জেনে নিজেদের জীবনে এই দৃষ্টি, এই বিচার, এই ভাব আনা দরকার। এ ভাব থাক্‌লে আরাধ্যদেবের কাছ থেকে বিচ্যুত হবে না। মথুরায় ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর প্রভৃতি আছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষেত্রপাল শিব রেখেছেন। শ্রীল গুরুদেব শ্রীমঠে শ্রীসদাশিব-গঙ্গাধর রেখেছেন। এঁরা সব কৃষ্ণদাস, এঁরা নৃত্যসহকারে গৌরগুণ গান করেন। নীলাচলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য যমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, কপালমোচন প্রভৃতি শিব আছেন। এইসব শিবকে বৈষ্ণব গণ অগ্রাহ্য করেন না। বৈষ্ণবধর্ম অতি চমৎকার, কিন্তু আচরণ করা খুবই কঠিন। এটা প্রেমের ধর্ম। কাউকে ঘৃণা, বিরোধ, বিদ্বেষ করে না ও তাদের মধ্যে rivalry (প্রতিযোগীতা) থাকে না। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে বিরোধ, মাৎসর্য থাকে না। বৈষ্ণবদের হৃদয়ে ঘৃণা থাকে না। তা'দের ব্যবহারেও ঘৃণার ও বিদ্বেষের স্থান নেই। কংস এত বড় বিদ্বেষী, তবু তাঁকে বৈষ্ণবগণ প্রণাম করেন। কেন ? কংস ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার ক'রেছেন। যারা নিম্ন অধিকারী, যারা বৈষ্ণবতার উপরের স্তরে যায়নি, তারা অনেক সময় ঘৃণা করে, নিন্দা করে। যাঁরা

কৃষ্ণপ্রেমিক, তাঁরা ঘৃণা ক'রতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দর "আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল"—সকলকে প্রেমালিংগন দিলেন। দৈত্য, নাস্তিক, পাপী সকলকে প্রেমিক ভক্তগণ প্রেমাংলিগন দিয়ে থাকেন। প্রেমধর্মে বিরোধ নেই, নিন্দা নেই, বিদ্বেষ নেই,—এই প্রেমধর্ম্মটা যে যতটা সাধন ক'রবে, সে ততটা লাভবান্ হবে। তার আপনা থেকেই ক্ষমার ভাব এসে যায়। যাঁরা প্রেমের ভূমিকায় আছেন, তাঁরা দুশ্চরিত্র লোককেও ঘৃণা করেন না। অনেক বলে থাকেন যে, মঠে চোরের স্থান, দুশ্চরিত্র লোকের আড্ডা সেখানে থাকা যায় কি করে? মহাজনগণ কেন এইসব লোককে রাখেন। ঐ চোর বদমায়েশ লোকগুলোকে সংশোধনের জন্য রাখেন, তাদের মঙ্গলের জন্য রাখেন। তাঁর এ রকম প্রেম-দৃষ্টি। যার ভিতরে প্রেম এসেছে, সে কাউকে ঘৃণা ক'রতে পারে না। এই ভাবে আমাদের জীবন গঠন করা দরকার।

—❖—

শ্রীগুরুদেবই শিষ্যের প্রাণকেন্দ্র

শ্রীগুরুদেবই শিষ্যের একমাত্র আশ্রয়। যে শিষ্য হয়েছে, সে তাঁর পূর্ণানুগত্যে থাক্‌বে। স্বতন্ত্রতা থাক্‌লে শিষ্যপদবাচ্য হবে না। মন্ত্র নিতে পারে, দীক্ষা নিতে পারে, যদি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য বা শাসন স্বীকার না করে, তাকে প্রকৃত শিষ্য বলা হবে না। গুরুদেবের বহু সম্পত্তি আছে। তার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রলে তাঁর সম্পত্তির অধিকার লাভ করা যায়। রাজার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রলে রাজপুত্র হয়। তেমনি গুরুদেবের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রলে তাঁর শিষ্য বা সন্তান হওয়া যায়। গুরুদেবের সম্পত্তি বল্‌তে মঠ, মন্দির, দালান-বাড়ী, টাকা-কড়ি নয়; তাঁর সম্পত্তি হলো শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম। গুরুদেবের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রলে—এইসব পারমার্থিক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়। সেই

গুরুদেবের সেবা ছেড়ে যারা দূরে যেতে চায়, তারা কপাল-পোড়া। গুরুদেবের প্রতি কোন রকম অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস এলে ভক্তিরাজ্যে কপাট পড়ে যায়। কেননা গুরুদেব অসন্তুষ্ট হলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কিছুতেই ক্ষমা করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যখন জগাই-মাধাই আঘাত করে, তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করেন। কিন্তু শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু তাদের ক্ষমা ক'রে শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রশমিত করেন। গুরুদেবকে বোঝা অত সহজ নয়। ক্ষুদ্র বস্তুকে বোঝা যায়। কিন্তু মহান্ত গুরুদেবকে বোঝা কঠিন। কারণ তিনি বৃহৎ, তিনি মহান্।

গুরুদেব আর বৈষ্ণব এক কথা নয়। যেমন বাবা কাকা এক নয়। সন্তানের অমঙ্গল হ'লে, মৃত্যু হ'লে বাবার শোক হয়, মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন। কাকা বা প্রতিবেশীর এক-আধটু দুঃখ হ'তে পারে।

তীব্রবেগে ভক্তির পথে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ accident হলে দশ বছরের সাধনা নষ্ট হয়ে যায়। গাড়ীটা এবার বেগে ছুটে চলেছে কিন্তু পথে accident হলে চুরমার হয়ে যায়। তেমনি ভক্তিপথে উন্নতি করা সুকঠিন, কিন্তু নেমে যাওয়া খুবই সহজ, uphill করা কঠিন। তাতে কত সময় কষ্ট করতে হয়। কিন্তু মুহূর্তে নীচে নেমে যাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন,—'তোমাদের Delhiর টিকিট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দিল্লী পর্যন্ত না গিয়ে বর্ধমানে নেমে গেলে। এতে তোমাদের ক্ষতি হলো। হরিভজন ক'রতে এসে লাভ না উঠিয়ে লোকসানে পড়ে যাবে। ঘরবাড়ী ছেড়ে এসে ভক্তি বা প্রীতি লাভ কর্তে না পারলে, যথার্থ সেবা করতে না পারলে জীবনটা বৃথাই যাবে।

গুরুদেব আগুন থেকে শিষ্যকে রক্ষা কর্তে পারেন। তিনি কখন কি ভাবে সেবা করেন, তা বোঝা কঠিন। সেইখানে কণ্টক পড়ে গেলে খুবই মর্মান্তিক কথা। বৈষ্ণব-অপরাধ ভক্তিপথের বিরাট অন্তরায়। কে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব আমি কি চিনি ? সেইজন্য বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্যবহারের

ত্রুটি হ'লে ভক্তিপথে কাঁটা পড়ে যাবে। গুরুদেবের চরণে অপরাধ হ'লে আর কি থাক্‌লো ? ভক্তিজীবন একেবারে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

—❖—

জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্বরসসার

যার যেটা স্বাভাবিক, যার যে সেবা, তার পক্ষে সেইটাই শ্রেষ্ঠ, সেইটাই শোভন ও সুন্দর।

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।৩৫)

উন্নত উজ্জ্বল-রস সর্বরসের সেরা। মধুর রসের সেবায় যাদের অধিকার, স্বাভাবিকভাবে যাদের চিত্তে ঐ রসের সেবায় স্ফূর্তি আসে তাদের পক্ষে এটা ভাল। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও সখারসে যাদের অধিকার, তাদের পক্ষেও ঐ রসের সেবা ভাল। কিন্তু যার অর্চন-সেবায় অধিকার, সে যদি বলে কীর্তন-সেবায় যাবো, তা সমীচীন হবে না। আবার যার কীর্তনে অধিকার, তার রন্ধন-সেবায় যেতে হবে না। প্রত্যেকের স্বরূপে যে সেবা স্বাভাবিকভাবে উচিত হয়, সেইটাই ভাল। অন্যের অনুকরণ কর্‌তে যাওয়া ঠিক নয়। গুরুদেব যার যেটা সেবা, তা তিনি পরিস্কাররূপেই জানেন। তাঁর নির্দেশানুযায়ী যার যেটা স্বরূপের সেবা, সেইটা করা ভাল। এতেই সেবাতে স্ফূর্তি হয় মঙ্গল উদিত হয়।

পারকীয় রস সর্বরসসার হলেও শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি সখ্যরস ছেড়ে শৃঙ্গার-রসের দিকে যান নি। শ্রীশ্রীনন্দ-মহারাজ বাৎসল্যভাবকে ছেড়ে মধুররসের সেবা করতে যান্ নি। সুতরাং অন্যের ভক্ত্যাংগকে অনুকরণ করা ঠিক নয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যকে অতিক্রম ক'রে মধুর-রসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সার বল্‌লেন কেন ? এর মধ্যে একটি বিশেষ নিগূঢ় তাৎপর্য আছে।

অনেক ধর্মপরায়ণ নীতিবাদিলোক বৃন্দাবনের পারকীয় রসকে অন্যায়, গর্হিত মনে করেন। কৌমার ধর্ম, বৈবাহিক ধর্ম ছেড়ে দিয়ে অর্বিবাহিতা কুমারীরা শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ছুটে চলেছে; এটা অশোভন ও অসুন্দর,—এতে সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই সব সাধারণ নিম্নস্তরের moralist ব্যক্তি পারকীয় রসের মাধুর্য অনুভব করতে পারে না। এই রস যে অনেক বড় কথা—এ ধারণা ক'রতে তারা অক্ষম। এই নিম্ন স্তরের নীতিবাদিগণ পাছে অপরাধ করে বসে, সেইজন্য "জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরসসার।"—এইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এইটাই সমীচীর বলে মহাজনগণ তাদের সাবধান ক'রে দিলেন। শ্রীউদ্ভব মহারাজের উক্তিতে পারকীয় রসের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হ'য়েছে। তিনি পারকীয় রসের উপাসিকাগণের চরণধূলি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষ ক'রেছেন। গোপীদের পায়ের ধূলি শ্রীউদ্ধব মহারাজ চাচ্ছেন না? কেননা এঁরা পারকীয় রসের সেবিকা। আর্যপথ, নীতিপথ, বেদপথ সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে পারকীয় রসের কথা সেবা ক'রেছেন। সেইজন্য এঁরা সর্বরস-শিরোমনি। সুতরাং হে নীতিবাদিগণ! এঁদিগকে তোমার গর্হণীয়, বর্জনীয় মনে করো না। নিম্নস্তরের moralist-দের বোঝাবার জন্য এই সাবধান বাণী মহাজনগণ উচ্চারণ করেছেন। এঁরা ছোট নন, নিন্দনীয় বা গর্হণীয় নন, এঁরা সকলের শ্রেষ্ঠ।

গুরুদেব যখন যাকে যে সেবায় নিযুক্ত রাখেন, সেইটাই শ্রেষ্ঠ। গুরুদেবের অর্চনাংগ, কীর্তনাংগ, শ্রবণাংগ প্রভৃতির মধ্যে আমাকে যেটা দিয়েছে, সেইটা মনেপ্রাণে করে যাওয়া খুব ভাল। কিন্তু আমি সে সেবাটা ছেড়ে অন্যটা করতে চাচ্ছি। এখানেই গোলমান সৃষ্টি হবে। আমাকে গুরুদেব কীর্তনাংগ দিয়েছেন, কিন্তু আমি কীর্তনাংগ ছেড়ে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। কেননা, বক্তৃতা ক'রতে গেলে ফুলের মালা পাওয়া যায়, হাততালি ও প্রশংসা লাভ করা যায়। গুরুদেব কাউকে রন্ধন সেবা দিয়েছেন। কিন্তু সেই রন্ধন-সেবা ছেড়ে দিয়ে শৃঙ্গার-

সেবা ক'রতে চায়। এগুলি ঠিক নয়। গুরুদেব চেনেন কার কি সেবা ? কারও অনুকরণ ক'রতে গিয়ে নিজের স্বভাবের বৃত্তি-অনুসারে সেবা যদি ছেড়ে দিই, তাহলে সেবা সুষ্ঠুভাবে হবে না। গুরুদেব চান কলসী গড়তে। কিন্তু আমি যদি বলি যে, আমি কলসী হবো না, ঘট হবো বা হাঁড়ি হবো ; এটা ভুল হবে।

গুরুদেবের আদিষ্ট সেবা— যে যেটা ক'রছে, সেটাকে নিন্দা করো না ; অসুবিধায় পড়ে যাবে। নিজের স্বরূপের সেবা করে যাও। অন্যের সেবাট গ্রহণ বা নিন্দা করো না, অনুকরণটা ভাল নয়। কিন্তু গুরুদেবের অনুসরণ করা ভাল। কার কোন্‌টা স্বরূপের ধর্ম, তা গুরুদেব জানেন। তাঁর নির্দেশটা অনুসরণ করা ভাল। তিনি বল্‌লে কি হবে। আমার ওটা ভাল লাগে না—এটা কোন কথা নয়।

—❖—

শ্রীনিতাইর করুণায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভ

"নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর-চরণ দু'খানি ॥"

—(শ্রীল নরোত্তম -গীতি)

শ্রীনিতাই-চাঁদের করুণা কি করে হয় ? শ্রীনিত্যানন্দ সংকীর্তনের পিতা, সংকীর্তনের অধিদেবতা। কীর্তনে যদি রস পাওয়া যায়, তবে নিতাইর করুণা লাভ হয়। 'কীর্তন' মানে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নয়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কীর্তন শুনে আনন্দ পাবেন। শ্রীনিতাইচাঁদকে আনন্দ দেওয়ার মত যোগ্যতা-লাভ, কীর্তনে অধিকার-লাভ ও কীর্তনে আনন্দ-লাভ খুব বড় কথা বিরাট্ ভাগ্যের কথা। তাঁর করুণায় কীর্তনে আনন্দ-লাভ হয়। কীর্তনে যদি নিত্যানন্দ প্রভু রস পান, তাঁর যদি ভাল লাগে, তিনি

যদি নন্দিত হন, কীর্তনকারীর ভিতরেও তার reflection পড়্বে অর্থাৎ তারও আনন্দ লাভ হবে। 'কীর্তন'মানে সংগীত; সুরভাঁজা বা ওস্তাদী নয়। কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীনিতাইচাঁদকে নন্দিত ক'রতে পারলে— তিনি কীর্তনে রস বা আনন্দ লাভ ক'রলে ব্রজের রাধাকৃষ্ণকে পাওয়া যায় অর্থাৎ বৃন্দাবনের শৃঙ্গার-রসের, মাধুর্যভাবের সেবায় অধিকার পাওয়া যায়। কীর্তনে যাদের রসবোধ আছে, সেই কীর্তনদ্বারে ব্রজের রাধাকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুগতজন কীর্তনের ভিতর দিয়ে ব্রজের রাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ ক'রেছেন। গৌড়ীয়গণের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর কীর্তন দিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের আরতি, তাঁদের ইন্দ্রিয়ের সুখবিধান করেন। ইহা অত্যন্ত রসস্যময়ী সেবা। গোপীগণের আনুগত্য ছাড়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ হয় না। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়জনগণ গৌরবিহিত কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সুখবিধান, তাঁদের আরতি ক'রে থাকেন। 'নিতাইর করুণালাভ' মানে কীর্তন-রসে অধিকার-লাভ। যে উন্নত উজ্জ্বলরসের সেবালাভ গোপীজনের আনুগত্য ছাড়া হয় না, সেই সেবা লাভ হ'তে পার্বে শ্রীগৌরবিহিত গানে, কীর্তন-সেবার মাধ্যমে। শ্রীনিতাইচাঁদের অনুগত পন্থায় নিতাইর সুখবিধান কর্তে পার্লে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ হয়; এটি একটি মজার কথা, অত্যন্ত রহস্যময়ী কথা, খুব গূঢ় কথা। গোপীগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ অত্যন্ত কঠিন কথা, খুব বড় কথা। পুরুষাভিমান নিয়ে কখনও আনুগত্য স্বীকার করা যায় না।

কীর্তনের ভিতর দিয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, তাঁদের আরতি হয়। এর দ্বারাই তাঁদের আকর্ষণ করা যায়। এই রহস্যপূর্ণ নিগূঢ় কথা ভক্তিসাধকদের মধ্যেও অনেকেই জানেন না।

এই কীর্তন-মানে গান গাওয়া নয়, সুর-তাল-মান-লয় নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে গাওয়া নয়। গৌড়ীয় গুরুবর্গ বিশেষ করে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ এদের একেবারে বর্জন ক'রেছেন। গান গাইতে গাইতে

মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি দেয়। এই সব physical কসরৎ, ভণ্ডামি— ইহা লোকদেখানো। পূর্ববঙ্গে কীর্তনের সময় অনেক ব্যক্তি এই রকম প্রেমের দশায় পড়েছে বলে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই সমস্ত ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। 'কীর্তন' মানে এ সমস্ত ভণ্ডামি নয়।

'নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে'—এ দুটো কথার link (যোগসূত্র) কোথায় ? ব্রজের শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা শৃঙ্গার-রস ছাড়া হয় না। 'নিতাইর করুণা হবে'—অর্থাৎ কীর্তন-রসে তাঁকে সুখী ক'রতে পারলে ব্রজের রাধাকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়।

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে সরসো মতঃ ॥"

—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শুদ্ধসত্ত্ব পরিমার্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে কীর্তনরসের আবির্ভাব হয়। এ খুব বড় কথা। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব না হ'লে কীর্তন-রসের আবির্ভাব হয় না। নিতাইর কৃপা ছাড়া, তাঁর করুণা ছাড়া এই কীর্তনরসেরও আবির্ভাব সম্ভব নয়। সেই নিতাইর করুণা ছাড়া ব্রজের রাধাকৃষ্ণের সেবালাভ হয় না। নিতাইর কৃপাসিঞ্চিত জনগণ কীর্তনের মাধ্যমে তাঁকে সুখী ক'রে ব্রজের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ ক'র্‌তে সমর্থ হন।

—❖—

শ্রীভগবানের সেবায় মঙ্গল-লাভ সুনিশ্চিত

"তোমার সংসারে করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।"

—(শরণাগতি)

নিরন্তর সেবা করে যাও, যোগ্যতা ও সামর্থ্যানুযায়ী কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করতে পারলে নিত্য বাস্তব মঙ্গললাভ সুনিশ্চিত। যাঁরা নিষ্কপটে সেবা করেন, তাঁরা শ্রীহরির প্রিয়জন; আর যাঁরা সাধ্যাতীতভাবে সেবা করেন, তাঁরা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ প্রিয়তম জন, শ্রেষ্ঠজন। সেবায় সব সময় উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধৈর্য থাকা চাই।

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।"

—(শ্রীউপদেশামৃত ৩য় শ্লোক)

ভগবান্ প্রিয়। সেই প্রিয়তম ভগবানের সেবা না করে ক'রবে কি? শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ইত্যাদি সেবা না করে সংসারকে জোর করে আকড়ে ধরবে নাকি? দোকানকে আরও ফাঁপিয়ে তুলবে নাকি? ছেলেগুলিকে আরও বুকে জড়িয়ে ধ'রবে নাকি? ভগবানের নিরন্তর প্রীতিপূর্ণ সেবা ছাড়া জীবের গত্যন্তর নেই।

সেবায় অতৃপ্তি বা দৈন্য থাকা ভাল। এটা দোষের কিছু নয়। যতই সেবা করি বা কেন, প্রয়োজনানুসারে অত্যন্ত কম। আমার আরও প্রচুর সেবা করা দরকার। যে সেবা করেছি, খুব করেছি, আর কি? এ রকম মনোভাবটা ভাল নয়। প্রয়োজনানুসারে আমার আদর্শের তুলনায় অনেক কম কর্‌ছি,—এ রকম ভাবটা ভাল। সেবা করে অতৃপ্তিবোধটা খুব ভাল—এটা ভক্তিবিরোধী নয়, অতৃপ্তিটা ভক্তি-অনুকূল। যা সেবা কর্‌ছি, তাতে আমার আদর্শ পূর্ণ হচ্ছে না। এই মনোভাব আরও বেশী সেবার দিকে এগিয়ে দেয়।

এ সব সেবা ক'রে কি হবে? যা কর্‌ছি, এতে কিছু হ'বে না। এই রকম মনোভান যাদের, তাদের চিত্তে বিশ্বাসের অভাব। ইহা ভক্তিবিরুদ্ধ কথা। এই অনাস্থা, অবিশ্বাস থেকে চঞ্চলতা আসে এবং পরে নাস্তিক্যভাব উদিত হয়। যেদিন যার চিত্তে এ অবিশ্বাস আস্‌বে, সেদিন তার পারমার্থিক জীবনের মৃত্যু হবে। অবিশ্বাসটা মারাত্মক। ভগবানের সেবা না ক'রলে মায়ার সেবা ক'রতে হ'বে। ভগবানের সেবা-যজ্ঞ থেকে ছুটি নিয়ে আরও সংসারকে বেশী করে জড়িয়ে ধর্‌বে নাকি? ভগবানের সেবায় অর্থ বুদ্ধি, বাক্য ব্যয় করতে পার্‌ছো না। তার

কারণ তোমার সংসারের প্রতি এখন আসক্তি বা মোহ আছে। কৃষ্ণের সংসারে সেবা করে যাও। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেমের ঠাকুর। ঠাকুরের প্রতি আপনবোধ এ'লে সেবায় আনন্দ ও উৎসাহ পাবে। শ্রীল গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভুর কথা বলতেন। প্রভুর শ্রীবিগ্রহ-সেবায় প্রাণের স্পর্শ দেখতে পাই। মা যেমন ছেলেকে নিত্য নূতন পদ করে খাওয়ান। উনি খুব সহিষ্ণু ও সেবাপ্রাণ। এ সেবার পুরস্কার পাবেন। অনেকে পাঠ-বক্তৃতা করে, সিদ্ধান্ত বলে; প্রবন্ধ লেখে, বড় বড় মুখস্থ করা বুলি আওড়ায়। কিন্তু এঁর কাছে যেতে তাদের অনেক দেরী আছে।

ঠাকুরকে তো অনেকে দর্শন ক'রতে আসে এবং দর্শন করে চলে যায়। কিন্তু ঠাকুর দর্শন করে কাকে ? কে কি দেখতে এসেছে, তা ঠাকুর সব জানেন। তিনি কারও দিকে তাকান না। যদি কোনদিন কারও দিকে একটু শুভ দৃষ্টিপাত করেন, তা'হলে তার জীবন ধন্য হ'য়ে যায়।

—❖—

শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানময় আচরণই ভক্তির প্রাণ

বুদ্ধদেব সংসারের জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু ইত্যাদি দেখে তপস্যা করবার জন্য গৃহত্যাগ করেন। তপস্যা ক'রে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করেন। তিনি জগৎকে মুক্তির পথ বা মহানির্বাণের পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু ভক্তগণ মুক্তিও চান না। তাঁরা ক্লেশ ও হাসিমুখে বরণ ক'রতে পারেন, যদি তাঁর সুখ হয়।

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ"

—(শরণাগতি)

ভক্তরা তাঁর সুখবিধানের জন্য দুঃখ চান। তাঁর জন্য কাঁদতেও রাজি আছেন। কান্না থেকে অব্যাহতি পেতে চান না।

দুঃখ চায়—এমন লোক খুব কম। ভগবানের নাম ক'রছি, সেবা ক'রছি; যাতে ভালভাবে থাক্‌তে পারি। দুঃখ যাতে না হয়, এটাই চাই। আমার শরীরটা খারাপ না হোক, কোন অভাব না থাকুক, ব্যারাম না হোক—এই জন্যই ভগবানের সেবা করি। যে নিজের শরীরের জন্য চায়, সে শরীর থেকে জাত পুত্রকন্যাদের জন্যও চাইবে। এই সমস্ত নানাবিধ ক্লেশ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য জগতের লোক ব্যস্ত। ভগবানের সুখের জন্য দুঃখও স্বীকার করতে রাজী,—এমন ভক্ত খুবই বিরল। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।"—একথা বলা সহজ। কীর্তন করাও সহজ। কিন্তু আচরণে আনা খুবই কঠিন। "আমার দুঃখ হয় হোক, কিন্তু তুমি সুখী হও।"—এ সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ নয়। মুক্তি চাই না, নির্বাণ চাই না, —এ সব কথা বক্তৃতায় বল্‌তে পারে, প্রবন্ধে লিখ্‌তে পারে, লোককে উপদেশ দিতে পারে,—এগুলি সহজ। কিন্তু আচরণে আনা অত সহজ নয়। যাঁরা শুদ্ধভক্ত, তাঁদের ইহা স্বাভাবিক অবস্থা। মা ছেলের জন্য রান্না করতে ধুঁয়ায় কষ্ট পায়, তবু পরিপাটির সঙ্গে রান্না করে। কারণ মা তার সন্তানকে ভালবাসে। সেখানে স্নেহ আছে, প্রীতি আছে, মমতা আছে। যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্য কষ্ট স্বীকার ক'রতেও প্রাণ চায়। ভক্তি চাই, মুক্তি চাই না—এ কথা বলে, উপদেশও দেয়। কিন্তু জীবনে আচরণে ফুটিয়ে তোলা অত সহজ নয়। ময়নাপাখীকে 'হরে কষ্ণ' বুলি শেখায়। শেখানো বুলি 'হরে কৃষ্ণ' নাম ও উচ্চারণ করে। লোক আস্‌লে 'বসুন' 'বসুন' এবুলিও আওড়ায়। কিন্তু বিড়াল এসে টুঁটি চেপে ধর্‌লে 'হরে কৃষ্ণ' বুলি আর আওড়াতে পারে না। তখন ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ তার মুখ থেকে বের হয়। সেই রকম পাঠ ক'রতে বসে, 'ভুক্তি চাই না, মুক্তি চাই না', বলে। কিন্তু যখনই দুঃখে পড়ে, তখনই বলে উঠে—'প্রভু ! আমার দুঃখ দূর করে দাও।" তখন "ন ধনং ন

জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা” এই শ্লোকের গভীর তাৎপর্য ভুলে যায়। কিন্তু যারা ভুলে না, তাদের খুব বেশী ভাগ্য আছে, বুঝ্‌তে হবে। এই বাক্যানুসারে জীবন গঠিত করা এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা খুব বড় কথা। কিন্তু পারা অত সহজ নয়।

যদিও আমার অধিকার নেই, তবুও শোনা দরকার, বলা দরকার। যেহেতু আমি ত এটা পারি না, সুতরাং বল্‌বো কেন ? এটা কোন কথা নয়। বল্‌তে বল্‌তে, শুনতে শুনতে লোভ আসবে। এটা করার ইচ্ছা জাগবে। আদর্শের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বল্‌তেন,—“তুমি ত’ পড়ে গেলে। যে লেখছিল, সে টের পেয়েছে।” তুমি ত কীর্তন ক’রলে, বক্তৃতা কর্‌লে—‘কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবলি বিষের ভাণ্ড।’ কথাটা কত বড় ! যিনি লিখেছেন, তিনিই জানেন। বক্তৃতা করি, পাঠ করি, কিন্তু নিজেদের আচরণ যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্য রকম করি। প্রচার করা সহজ, বলা সহজ। কিন্তু আচার করাই কঠিন, জীবনে পালন করা কঠিন। বক্তৃতা দেওয়া, প্রবন্ধ লেখা সহজ। কীর্তনের পদটা সুরে-তালে গেয়ে যাওয়া সহজ। কিন্তু কীর্তনের ভাবটার দিকে, গভীর অর্থটার দিকে খুব কম লোকেরই দৃষ্টি থাকে। সত্য কথা বল্‌তে গেলে অধিকাংশ লোকের এদিকে দৃষ্টি থাকে না।

“প্রভু ! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা’ ধন, জন॥”
—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গীতি)

পদটা সারাজীবন গেয়ে যায়। কিন্তু ভাবটার সঙ্গে নিজের identification নেই। আরতি-কীর্তন করছে, কিন্তু ঠাকুরের দিকে লক্ষ্য নেই। লোকেরা যারা শুন্‌ছে; তাদের ভাল লাগছে কিনা সেইটা লক্ষ্য করে। ঠাকুরের ভাল লাগ্‌ছে কি না এটার দিকে নজর নেই। ঠাকুরের সুখ হচ্ছে কিনা যখন এইটা বোধ ক’রতে পারবে, তখন হবে শুদ্ধভক্তি।

শ্রীহরির সেবায় লেগে থাক্‌তে হবে। এ-কথাটা বলার হয়ত আমার অধিকার নেই, তবু শুন্‌তে হবে। শুন্‌তে শুন্‌তে বল্‌তে বল্‌তে নিজের অধিকারের কথা চিন্তায় আস্‌বে। নিজের প্রতি উপদেশ—পরের প্রতি উপদেশ নয়, এ-কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

—❖—

জগতে গুরু ও শিষ্য সুদুর্লভ

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌।"

—(শ্রীভা ১১।৩২১)

যিনি মঙ্গল লাভ ক'রতে চান; তাঁকে সদ্‌গুরুতে প্রপন্ন অর্থাৎ শরণাগত হ'তে হ'বে। সদ্‌গুরু জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। সদ্‌গুরুর আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ অনুসরণ বা অনুবর্তন ক'রতে পারলে শিষ্য হওয়া যায়। জগতে অনেক মন্ত্রদাতা গুরু আছেন, তাঁর প্রণাম ও প্রণামী আদায় করেই কর্তব্য শেষ করেন। শিষ্যের উপর এরূপ দৌরাত্ম করবার অনেক গুরু আছেন। কুলগুরু, জড় বিদ্যা-শিক্ষার গুরু, বিষয়ের গুরু আছেন। কিন্তু পরমার্থিক গুরু সুদুর্লভ। পারমার্থিক গুরুর কৃপায় মঙ্গল-লাভ হয়। এ রকম সদ্‌গুরু যদিও সুলভ হয়, তথাপি যথার্থ শিষ্য পাওয়া যায় না। যারা শুধু মন্ত্র গ্রহণ করে, তারা প্রকৃত শিষ্য নয়। অবশ্য শিষ্যত্ব লাভ ক'রার জন্য মন্ত্র গ্রহণ দরকার আছে। কেননা মন্ত্র গ্রহণ না ক'রলে শিষ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে, 'পরমহংস' বলে জয় দিচ্ছি পায়ে, ফুল দিচ্ছি, মালা পরাচ্ছি, ভোজ্য দিচ্ছি—এগুলি শিষ্যত্বের লক্ষণ নয়। শিষ্যত্ব মানে গুরুদেবের প্রতি প্রিয়ত্ববোধ। গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ-বোধ চাই। ইনিই আমার মঙ্গল-বিধাতা,—এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁর সেবা ক'রতে হ'বে। তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করা, তাঁকে প্রসন্ন রাখাই শিষ্যত্বের লক্ষণ। শিষ্যের আচরণ, তার কথাবার্তা এমন হওয়া চাই, যা'তে গুরুদেব তা'র প্রতি

প্রসন্ন থাকেন। গুরুদেবের সেবা করা মানে তাঁর সুখানুসন্ধান করা। গুরু-শিষ্যের এ রকম সম্বন্ধ না থাক্‌লে মঙ্গল লাভ হয় না।

গুরুদেবের নিকট মন্ত্র নিয়েছি; অথচ তাঁর আদেশ-নির্দেশ উপদেশ পালন করি না। শিষ্য হ'য়ে এমন আচরণ, এমন ক্রিয়া করে, যা'তে গুরুদেব প্রাণে আঘাত পান; তিনি উদ্বেগবোধ করেন; শিষ্যের ব্যবহারে ক্লিষ্ট হন। এ রকম ব্যবহারের জন্য শিষ্য মঙ্গললাভ ক'রতে পারে না। গুরুদেবের আদেশ নির্দেশের বিপরীত আচরণশীল শিষ্য অসুবিধায় পড়ে এবং নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। পক্ষান্তরে যাঁরা গুরুদেবকে সুখী ক'রবার চেষ্টা করেন, তাঁরা এমন ব্যবহার বা আচরণ করেন, যাতে তিনি প্রসন্ন হন; তিনি ক্লেশ পান, এমন কোন ক্রিয়া করেন না, তাঁদের মঙ্গললাভ অনিবার্য। যথার্থ অনুগত শিষ্য যাঁরা তাঁরা গুরুদেবের আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ পালন করেন, শাসন স্বীকার করেন এবং কোন প্রকার উদ্বেগ পান—এমন কাজ করেন না। তাঁরা দ্রুত বৈকুণ্ঠের পথে অগ্রসর হ'য়ে যান। গুর্ব্বাপরাধীরা তাঁর পায়ে ফুল ছড়ায়, স্তব স্তুতি আওতায়। গুরুদেবের পক্ষ হ'য়ে লড়াই করে, বাহিরে দেখায়—গুরুদেবকে কত ভালবাসি ! গুরুদেব যেন কত আপনজন ! কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি যা'তে কষ্ট পান, এমন আচরণ করে থাকে। বাহিরে কপট গুরু-ভক্তি দেখায়। এরূপ কপট শিষ্যনামধারীর সংখ্যাই বেশী। সদ্‌গুরু যেমন দুর্লভ, সৎ শিষ্যও তেমনি দুর্লভ। হাজার হাজার শিষ্যের মধ্যে এমন শিষ্যও অত্যন্ত বিরল। শিষ্য হ'য়ে শিষ্যত্বের অধিকার লাভ করা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। যিনি যথার্থ শিষ্য, তাঁর মঙ্গললাভ হ'বেই হ'বে। তাঁর শান্তি, আনন্দ ও প্রেমলাভের পথে কোন বাধা হ'তে পারে না। যারা কপট, ভিতরে নানা প্রকার অসদ্-আচরণ দ্বারা গুরুদেবের অপ্রসন্নতা অর্জন ক'রে সর্বনাশের পথে তারা এগিয়ে যায়। এদের এ রকম কপট ব্যবহারের জন্য এদের অমঙ্গলের পথ থেকে কেউ রক্ষা ক'রতে পারে না। বাহিরে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রলাম, খাওয়ালাম, জামা দিলাম, এ রকম ক'রে গুরুদেবকে

ঠকান যায় না। গুরুদেবের যথার্থ শিষ্য হ'লে গুরুদেবের সুখবিধানের দিকে শিষ্যের সর্বক্ষণ লক্ষ্য থাক্‌বে। এ রকম শিষ্যের দর্শনে ও সঙ্গলাভে গুরুদেব উল্লসিত ও প্রীতি হ'ন। অনেকে ভাবে যে, গুরুদেব আমাদের কপটতা বুঝ্‌তে পারছেন না। এরা অত্যন্ত হতভাগা—এদের জীবনে দুঃখ অনিবার্য। এদের জীবনে ক্লেশের অন্ত নেই। এরা সদ্‌গুরুর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যায়। গুরু যেমন কম মিলে, শিষ্যও তেমনি খুব কম। অনেককে বাহিরে দেখা যায় যে, আলেখ্যে ফুল দেয়, স্তব-স্তুতি করে দেখায় গুরুদেবকে সুখী ক'রছি; অথচ ভিতরে কপট, ধূর্ত, নরক-পথের যাত্রী। এরা জন্মে-জন্মে কষ্ট পাবে। কপটতা তাহাদিগকে অধঃপাতে নিয়ে যাবে। গুরুদেবকে কেউ ঠকাতে পারে না। যারা গুরুদেবকে বঞ্চনা করে, তারাই ঘোর বিপদ ও ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়।

ইহলোকে ও পরলোকে তাদের জীবনে শান্তি নেই। পক্ষান্তরে যাঁরা বাস্তবিক শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁরা উপদেশ পালন করেন, তাঁদের মঙ্গললাভ অনিবার্য। আর যারা ঢঙ্গাতি করে, তাদের ভীষণ ক্লেশ, ভীষণ বিপদ। তাদের জন্মে-জন্মে দুঃখ। যেখানে গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধবোধ নেই, সেখানে তাদের মঙ্গল নেই; সেখানে শয়তানি, দুষ্টামি। যথার্থ শিষ্য না হ'লে ভজনও হয় না। শিষ্য না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে ভজন ক'রতে পারলে শুভ লাভ হয় এবং বৈকুণ্ঠের পথে চলে যায়।

—❖—

স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর”

শ্রীহরিভজন বা শ্রীহরি-সেবা যারা করে না, তারা অসৎ। কিন্তু যাঁরা শ্রীহরির সেবা করেন, তাঁরা সাধু। শ্রীহরির কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন ইত্যাদি ভক্তি। শ্রীহরির সেবায় জন্য পুষ্পচয়ন, মালা

গাঁথা, চন্দন ঘসা, মন্দির মার্জন করা, তাঁর শৃঙ্গার করা, তাঁর খাওয়ার জন্য রন্ধন করা, তাঁর সেবার জন্য বাসন মাজা—সবই ভক্তি—সবই সেবা। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন—এই সব ভক্ত্যাঙ্গের কোন একটি যে করে না, সে অভক্ত। এ রকম অভক্ত থেকে দূরে থাক্‌তে হবে। যারা ভজন ক'রতে চায়, তারা যেন এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। যারা ভজনে আগ্রহশীল, অভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে যাতে ভজনে তাদের বাধা স্বষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

'অসৎ' বল্‌তে যারা চুরি করে, লাম্পট্য করে, মিথ্যা কথা বলে—অসচ্চরিত্র ইত্যাদি। মিথ্যাবাদী, চোর, অসচ্চরিত্র—তারা ত অসাধু বটে। এ ছাড়া যারা শ্রীহরিভজন করে না, তারাও অসৎ। শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চনাদির মধ্যে কোন একটি অঙ্গ যে করে না, সে সচ্চরিত্র, সত্যবাদী হলেও অসৎ। এই সব অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ না ক'রলে সাধুসঙ্গ-লাভ হয় না।

"অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।"

—(শ্রীচৈ চ ম ২২।৮৭)

যে কোন রকম ভক্তি যাজন করে না, সে নিতান্ত আত্মীয়, পুত্র স্বজন হ'লেও তার সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে হ'বে। হরিভক্তি হীন লোকের সঙ্গ ক'রলে ভক্তিতে বাধা স্বষ্টি হয়। এদের সঙ্গ ক'রলে সময় ও অর্থ নষ্ট হয় এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। এই অন্য ভক্তিসাধকগণ গৃহ-দ্বার, পুত্র ছেড়ে মঠে বাস করে এবং অসৎ-সঙ্গ হতে দূরে থেকে হরিসেবায় আত্ম-নিয়োগ করে। মঠে থেকেও যারা গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে মিথ্যা কথা বল্‌তে দ্বিধাবোধ করে না, তাদের সঙ্গও ত্যাগ ক'রতে হ'বে। মঠে থেকেও ভক্তির অনুষ্ঠানে যোগদান করে না, যাদের সংযম নেই, তারাও অসৎ। এ রকম অসৎ-এর সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে না পারলে ভজনে উন্নতি হবে না; যেমন প্রকৃত ডাক্তার রোগীকে ঔষধ দেন এবং কুপথ্য খেতে নিষেধ করে দেন। শুধু ঔষধ খেলে অসুখ ভাল হয় না, যদি কুপথ্য

খায়। ঔষধও খাচ্ছে, কুপথ্যও খাচ্ছে—এতে ফল পাওয়া যায় না। সে রকম ভক্তিসাধনেও বিধিগুলি যেমন পালন ক'রতে হ'বে নিষেধগুলি তেমনি বর্জন ক'রতে হ'বে। শ্রবণ, কীর্তন স্মরণ, অর্চন ও বন্দনাদি কর্‌ছে; কিন্তু অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছে না, তাতে ভক্তিসাধনের ফল পাবে না। মঠের মধ্যে অসৎ সঙ্গ হওয়ার সুযোগ কম। তথাপি মঠের মধ্যে যারা প্রজল্প করে, পরনিন্দা ও পরচর্চা করে, তাদের সঙ্গও অসৎ সঙ্গ। জীবনের এত বড় সুযোগ নষ্ট কর্‌ছে ! এরা হতভাগ্য—এরা পাপ, অপরাধ করে, তাই ভক্তিসাধনে উৎসাহ পায় না, মনমরা ভাব, বিষাদ্, বিপদ ও অসুবিধা ভোগ করে থাকে।

"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"

—(শ্রীচৈ চ ম ২২/৮৭)

কৃষ্ণ-অভক্ত অসৎ। যারা অসচ্চরিত্র, লম্পট, অসদ্ উপায়ে অর্থোপার্জন করে, দুর্নীতি-পরায়ন, পাপী-অপরাধী, তারা ত অসৎ বটেই। আর যারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন—যে কোন একটি ভক্ত্যাঙ্গ যাজন করে না, তারা সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, নীতি-পরায়ণ হ'লেও অসৎ। এদের ছাড়া যারা স্ত্রীসঙ্গী, তারাও অসৎ। পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গ করে, কিংবা স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে করে—উভয়েই অসৎ। যারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করে, তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাক্‌তে হ'বে। এদের সঙ্গ বর্জন না ক'রলে ভক্তিদেবীর কাছে অপরাধ হ'বে এতে কোন রকম মঙ্গল উদয় করাবে না গৃহস্থেরা বিবাহ ক'রেও যদি অসংযত জীবন যাপন করে, শাস্ত্রের নিয়মকে না মেনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, তারাও স্ত্রীসঙ্গী। বিবাহ্ ক'রে অসংযত জীবন যাপন করাটাও অন্যায়, অশোভন। এসব স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ ক'রলে ভক্তিসাধনে কোনও ফললাভ হতে পারে না। এরা পাপী, অপরাধী এবং জন্মে-জন্মে কষ্ট পায়। অন্যায়, পাপ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে যারা ভক্তির অনুষ্ঠানগুলি ক'রে যায়, তারা অল্পকালের মধ্যেই ফল পেয়ে যায়।

সঙ্গ নানাপ্রকার নানাভাবে হ'তে পারে। অসদ্ বৃত্তি নিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেও সঙ্গ হয়। কাম-ভাবাপন্ন হ'য়ে কা'রও দিকে তাকালে সঙ্গ হয়। তাকাচ্ছে না, কাছেও যাচ্ছে না, কিন্তু মনে মনে চিন্তা ক'রছে—এতেও সঙ্গ হয়। পুরুষেরা মনে মনে স্ত্রীলোকের কথা চিন্তা করে কিংবা স্ত্রীলোকেরা মনে মনে পুরুষের কথা ভাবে,—এরা সকলেই স্ত্রীসঙ্গী বা পুরষ-সঙ্গী। মনে মনে যেমন সঙ্গ হয়, তেমন সাক্ষাৎ দর্শন এবং স্পর্শনাদিতেও সঙ্গ হয়। স্ত্রীসঙ্গীরা বা পুরষসঙ্গীরা ভক্তিসাধন ক'রলেও ফল দেখ্তে পায় না। এই সমস্ত অভক্ত ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুদেবের কৃপা, সেবা ও শাসনকে যদি বরণ করে নেয়, মঙ্গললাভ হয়। শরীর থাক্লে যেমন রোগ হয়, তেমনি সাধকদেরও নানা অনর্থ থাক্তে পারে। রোগ হলে যেমন ভাল বৈদ্যের পরামর্শানুযায়ী ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার ক'রলে অচিরেই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তেমনি সদ্গুরুর আনুগত্যে ভক্তি সাধন ক'র্লে ভক্তিপথের কণ্টকগুলি, অসুবিধাগুলি দূরে চলে যায়। শ্রীগুরুদেবই ভক্তিলাভের পথে পরম বান্ধব। তাঁর নির্দেশ-উপদেশ পালন ও নিষিদ্ধাচারগুলি বর্জন ক'রলে মঙ্গললাভ অনিবার্য। যারা সদ্গুরুর শাসন-নিয়ম মেনে চলে, তাদের খুব শীঘ্র মঙ্গল হয়। সাধু-গুরুর মত এ জগতে আর কেউ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নেই। পিতা যেমন পুত্রকে খারাপের দিকে যেতে দেখলে শাসন করেন এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তেমনি সদ্গুরুও তাঁর শিষ্যদের শাসন ক'রে বিপদ ও অধঃপতন থেকে রক্ষা করেন।

অভক্ত, স্ত্রীসঙ্গী, বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্ত, স্ত্রৈণ ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রতে হ'বে। গৃহস্থেরাও অনেকে স্ত্রীসঙ্গী। হরিভজনের পথে বিঘ্নজনক যে কোন সঙ্গই অমঙ্গলের দিকে শীঘ্র টেনে নিয়ে যায়। যারা ভক্তি-সাধন আরম্ভ করেছে, যে কোন রূপ অসৎ-সঙ্গ থেকে বহু দূরে থাকবে; নতুবা বহু পরিশ্রম ক'রেও ফল লাভ ক'রতে পারবে না। পাপী, অপরাধী, অভক্ত, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীদের

সঙ্গ থেকে বহু দূরে অবস্থান ক'রে খুব সাবধানে ভক্ত্যাঙ্গগুলি সাধন ক'রলে ফললাভ নিশ্চয়ই হবে।

—❖—

শ্রীল রূপগোস্বামীর শিক্ষামৃত

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলেছেন,—বাক্যের বেগ বা বাক্যের অসংযম ভক্তিসাধনের পথে মস্ত বড় একটা বাধা। যা মনে আসছে, তাই বলে দিল, যা দেখ্‌লো, তাই বলে ফেল্‌লো, যা শুনলো, তাই নিয়ে প্রজল্প করলো—এর ফলে ভক্তি বিনষ্ট হয়। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ যারা সংযত ক'রতে পারে না, তারা ভক্তি সাধন ক'রলেও ফললাভ ক'রতে পারে না। শ্রীহরির কথা শুন্‌ছি, বল্‌ছি, তাঁর স্তবস্তুতি ক'রছি, তাঁর অর্চন-বন্দনাদি ক'রছি—এই সমস্ত ভক্ত্যাঙ্গ-যাজনে একটা ফল পাওয়া যায়। এই সব ভক্তির অনুষ্ঠান কর্‌লে ভগবানে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম উদয় হয়। কিন্তু যারা বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, কামের বেগ, উদরের বেগ, সংযত ক'রতে পারে না, তাদের ফল লাভ ত দূরে থাকুক, পরন্তু যা সঞ্চিত থাকে, তাও বিনষ্ট হয়। যেমন ফুটো ঘটিতে জল রাখ্‌লেও সব বেড়িয়ে যায়; সেই রকম সাধনভজন যা কর্‌ছে ছেঁদা থাক্‌লে সব বেড়িয়ে যাবে। ষড়্‌রিপুর দমন নেই; সংযম নেই—এই ছিদ্র দিয়ে সাধন-ভজনের ফল সব বেড়িয়ে যায়। প্রজল্প ভক্তিপথের প্রধান কন্টক। হরিকথা ছাড়া আর সব বাজে কথা। বাক্যবেগ দমন ক'রতে না পেরে যারা পরনিন্দা ও পরচর্চা ক'রে তারা কোন কালেও ভক্তিপথে উন্নতি ক'রতে পারে

না। যারা পরের চরিত্রের সমালোচনা করে, তাদের মঙ্গললাভ হবে না; তাদের ভক্তিপথের প্রগতি হ'বে না।

"কাহারে না করে নিন্দা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজেয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥"

—(শ্রীচৈ ভা ম ১০।৩২২)

নিন্দা ক'রলে চৈতন্যকে জয় করা যাবে না। আবার সহজেই তাঁকে পাওয়া যায়। পরনিন্দুক বা বিশ্বনিন্দুকের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা হয় না। মনে যা এলো, তাই বলে দিল। যা শুন্‌লো—তাই বলে দিল, যা দেখ্‌লো—তাই বলে দিল; অথচ কৃষ্ণ নাম ক'রছে। পঁচিশ হাজার করুক, পঞ্চাশ হাজার করুক কিংবা এক লক্ষ কৃষ্ণনাম করুক্ সেই জিহ্বায় যদি কারও নিন্দা করে, তাহ'লে ফল পাবে না। পর-নিন্দা ক'রলে ভক্তি নষ্ট হ'য়ে যায় এবং ভক্তিজীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। অন্ন খেলে পেট ভরে, স্বাস্থ্য রক্ষা পায়। কিন্তু চানাচুর খেলে পেট ভরে না; স্বাস্থ্য রক্ষা পায় না, অথচ উহা মুখরোচক বলে খায়। সেই রকম পরনিন্দাই মুখরোচক। পরের ছিদ্র শুন্‌তে, বল্‌তে, দেখ্‌তে খুব ভাল লাগে। এদের কোন কালেই মঙ্গললাভ হয় না। এরা গোল্লায় চলে যায়। যত কিছু শ্রবণ, কীর্তন ও হরিনামাদি কর্‌ছে, সব নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। অন্যের দোষ-দর্শনে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আর যাঁরা মহাজন, তাঁরা পরচর্চ্চা করেন না, বরং বৈষ্ণবের প্রংশসা করেন। মহাজনগণ বৈষ্ণবের দোষ বলেন না, শুন্‌লেও দেখলেও দোষটি বলেন না। যারা নিজেরা কামুক, স্ত্রীজিত, স্ত্রীসঙ্গী ও নিতান্ত অসংযত, নিজেদের মধ্যে বহু অসুবিধা আছে; তারাই পরের দোষ দেখে বলে বেড়ায়। যারা নিজের অসংখ্য দোষ দেখতে পায় না, কিন্তু পরের ছিদ্র বেশী করে দেখে। উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ থেকে রক্ত পড়ে, তবু ছাড়তে পারে না; তেমনি যারা ভক্তি সাধন ক'রতে এসে পরনিন্দা, পরচর্চা ছাড়তে পারে না, তাদের মঙ্গললাভের আসা নেই। ভক্তিসাধকগণকে খুব সাবধানে ভক্তিপথে চল্‌তে হয়। এই সব সাবধানী বাণী পালন না

ক’রে যারা পরনিন্দা ক’রে বেড়ায়, তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে। পরছিদ্রান্বেষীরা ও পরচর্চকের খুব স্ফূর্তি ক’রে নিন্দা ক’রে বেড়ায়। অনেকে বলে, “আমরা ত দেখছি তাকে প্রসাদ চুরি ক’রে খেতে, সত্যকথা বলছি, তাতে দোষের কি হলো ?” ঐ সত্য কথাটা বলাই দোষ—বাক্যের দোষ। যে খেয়েছে, সে ত ফল পাবেই। কিন্তু তুমি যে তার দোষ বলে বেড়াচ্ছ, এতে তোমার বেশী ক্ষতি হ’য়ে যাবে। সৎসঙ্গে, সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ক’রেও এই পরনিন্দুক ফল লাভ ক’রতে পারে না। এরা গোল্লায় যায়, শূন্যের মধ্যে পড়ে যায়। এরা বঞ্চিত হ’য়ে যায়, জীবনে ঠকে যায়। পর-দোষ দেখতে নেই, শুন্‌তে নেই দেখে শুনেও বলতে নেই। কেউ ভাণ্ডার থেকে চুরি করে খায়। তুমি কি বিধাতা ? চুরি ক’রতে দেখলাম—সত্য কথা বল্‌লাম—তাতে দোষের কি হ’লো ? ঐ সত্য কথা বলাই দোষ, এতেই সর্বনাশ হয়,—ভক্তিসাধক অধঃপাতে চলে যায়। সে জীবনে যত ভাল কাজ করুক, জিহ্বায় যত হরিনাম করুক, তার মঙ্গল আসে না। সে অমঙ্গলের পথে, অসুবিধার পথে, মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। এই সব সাবধানী বাণী যারা শ্রবণ করে না, তাদের পোড়া কপাল।

যারা কুলগুরু, অসদ্ গুরু আশ্রয় করে, তাদের অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার ক’রবার কেউ নেই। কিন্তু সদ্‌গুরু danger singal দিয়ে দেন। তিনি যথাসময়ে ঠিক ঠিক উপদেশ দেন। গুরুদেবের উপদেশ শুন্‌লে মঙ্গল হয়। কিন্তু তাঁর উপদেশ না শুন্‌লে অধঃপাতে যায়। কাম, ক্রোধ মনে জাগলে যেন অস্থির হ’য়ে পড়ে। এরা যত ভক্ত্যাংগ যাজন করুক, অধঃপাতে চলে যাবে। চোখের উপর দেখা যাচ্ছে—কত ভাল গুণ আছে, কত সেবা ক’র্‌ছে; কিন্তু পরচর্চা ও পরনিন্দা করার ফলে অধঃপাতে চলে যাচ্ছে। যে ছিদ্র সে বলছে, তার শত গুণ বেশী প্রভাব নিজের উপর বিস্তার ক’রে। খুব সাবধান। পরছিদ্র অন্বেষণ ক’রতে কখনো যেও না। ঐ সত্য দেখা, বলাই অত্যন্ত দোষ। ঐ সত্যই সর্বনাশ এনে দেবে। এই সব হুশিয়ারী করা সত্ত্বেও যারা সংশোধিত হয়

না, তারা জন্ম-জন্ম কষ্ট পায়। অনেক ভাল গুণ থাকলেও ভক্তিপথের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। পরনিন্দুক ও পরচর্চকের ক্রিয়ামুদ্রায় গুরুদেবের প্রাণে খুব আঘাত লাগে। মহতের প্রাণে আঘাত দিয়ে কিছু মঙ্গললাভ হয় না।

—❖—

স্ত্রীসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয়

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ।
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু॥"

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৭।২৪)

নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে একান্তভাবে যাঁরা ভগবদ্ ভজন করতে চান এবং যাঁরা ভবসমুদ্রের পর পারে যেতে চান, তাঁদের বিষয়ীদের সঙ্গে বেশী বন্ধুত্ব, মেলামেশা, কটুম্বিতা, আত্মীয়তা কিংবা ঘনিষ্ঠতা করা অত্যন্ত অন্যায় ও অশোভন। যারা পুরুষ হ'য়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা করে কিংবা স্ত্রী হ'য়ে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, তারা উভয়েই অসাধু। যারা হরিভজন ক'রতে চায়, হরিকে সুখী ক'রতে চায়, তাদের পক্ষে বিষয়ীর সঙ্গ করা এবং স্ত্রীলোকের বা পুরুষের সঙ্গ করা—বিষ খাওয়ার থেকেও অধিকতর অমঙ্গলকর। বিষ খেলে যত অনিষ্ট না হয়, তার থেকে বেশী অনিষ্ট হয় বিষয়ী ও স্ত্রীলোকের সঙ্গের দ্বারা। নিষ্কিঞ্চন কারা ? যারা সংসারের সব সুখ ত্যাগ ক'রে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেছেন। স্ত্রীসঙ্গ ও ছেলেমেয়েদের আসক্তি ছিন্ন ক'রে যাঁরা ভগবৎ-সেবা ক'রতে চান, তাঁরা নিষ্কিঞ্চন। এঁরা ভগবৎ-সেবা ছাড়া জগতের সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকেন। জীবনের

মূল উদ্দেশ্য ভগবদ্-ভজন। সংসারে অবস্থিত থেকেও নিষ্কিঞ্চন হতে পারেন। গৃহস্থ হ'য়েও নিষ্কিঞ্চন হন। গৃহেতে অবস্থান করেও ভিতরে ভিতরে গৃহে বাস ক'রার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ভগবদ্ গৃহে বা গুরুগৃহে বাস করার একান্ত ইচ্ছা। এঁরা বাহ্যতঃ ত্যাগ না ক'রলেও মনের থেকে সত্যি সত্যিই এঁদের সংসার মুছে গেছে। এরা অন্তরে ভগবৎ-সেবার জন্য স্থির সংকল্প গ্রহণ ক'রেছেন।

যারা হরিভজন ক'রতে চায়, তাদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে দূরে থাক্‌তে হবে। এই শ্লোকে-সাধকদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন। সন্দর্শন মানে লোলুপ দৃষ্টিতে, কামবুদ্ধিতে, ভোগ্যবুদ্ধিতে তাকানো কিংবা মনে মনে তাদের চিন্তা করা। দেখা হলে কামবৃত্তি নিয়ে স্ত্রী-লোকদের দিকে তাকানো, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আদান-প্রদান, তাদিগকে খাওয়ায়, তাদের প্রদত্ত খাবার খাওয়া, একাকী গুহ্যকথা আলাপ করা,—এগুলির দ্বারা সঙ্গ হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের সঙ্গ এবং পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের সঙ্গ বিষভক্ষণ থেকেও অধিকতর অমঙ্গলজনক। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবা ক'রে সঙ্গলাভ করতে চায়, তাদের এ সব বিষয়ে খুব সাবধান থাকতে হয়। সংসারের মধ্যে পড়ে যদি ডুবে মরতে না চাও, নানারকম উদ্বেগ ও অসুবিধা থেকে অব্যাহতি পেতে চাও, তবে বিষয়ীদের কাছ থেকে দূরে থাক্‌তে হবে। বিষয়ী কারা ? যারা ধন, স্বাস্থ্য, উপার্জন করাকেই মস্ত বড় কাজ বলে মনে করে। বিষয়ী তারা, যারা মনে করে পরীক্ষায় পাশ ক'র্‌লেই মস্ত বড় লাভ—পরীক্ষায় ফেল করলেই জীবনটা ব্যর্থ। বিদ্যা, ধন, স্বাস্থ্য, প্রতিষ্ঠা, সম্ভোগ-বিলাস জোগার করায় ব্যস্ত এবং ওগুলোকেই জীবনের সার মনে করেছে, তারা বিষয়ী। এই সব বিষয়ীদের সঙ্গে মেলামেশা করা, খুব ঘনিষ্ঠতা করা, এদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করা, এগুলি ভক্তিসাধকের পক্ষে বিষ-ভক্ষণের চেয়েও অধিকতর ক্ষতিকর। সাধকদের হুঁশিয়ারি হ'য়ে চলতে হয়। যার এ সব বিষয়ে হুঁশিয়ারি নেই হরিভজনের আনন্দ ও মঙ্গললাভ থেকে তার ছুটি হ'য়ে যায়। সে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যায়।

হরিভজনেচ্ছুগণকে এ সব বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন ক'রে চল্‌তে হ'বে। গুরুবর্গের কৃপা, উপদেশ পালন না ক'রলে অধঃপাতে যাবে, জন্মে-জন্মে ক্লেশ পাবে; নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়্‌বে। নানবিধ শারীরিক ক্লেশ, মানসিক উদ্বেগ, দুর্ভোগ ও নরক যন্ত্রণা তাদের ভাগ্যে রয়েছে। বিষয়ী ও স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে সাধকদের সাবধান হ'য়ে চলা দরকার।

— ❖ —

রন্ধন ও শৃঙ্গার শ্রীবিগ্রহ-সেবার প্রধান অঙ্গ

অর্চন করা, শৃঙ্গার করা, মন্দির মার্জন করা শ্রীবিগ্রহ সেবা। কিন্তু অর্চনের প্রধান কাজ হ'লো রন্ধন। ভাল ক'রে পরিপাটির সঙ্গে রান্না ক'রে কৃষ্ণকে খাওয়ালে তাঁর সুখ হয়। "তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে॥"—(শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি) কোন মতে রান্না করে দিয়ে খালাস—কোনটাতে নুন বেশী, কোনটাতে কম, কোনটাতে ঝাল বেশী, কোনটাতে মশলা কম। এই সব রান্না খেয়ে তাঁর তৃপ্তি হয় না। ভাল রান্না হ'লে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে রসাস্বাদন হয়। রন্ধন-সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-সেবা, রন্ধনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শ্রীজগন্নাথমন্দিরে, শ্রীনাথদ্বারে, শ্রীগোবিন্দজীর ভোগমন্দিরের দিকে বিশেষ নজর থাকা দরকার। রন্ধনশালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই, ভোগের থালাখানি সুন্দর ক'রে চাই। সোনার থালায় ভোগ দিল, কিন্তু ভোগ ঠাকুর মুখে দিতে পারলেন না। ভাল রান্না হ'লে পাতাতে দিলেই খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যারা অর্চন করে, মন্ত্র পড়ে, ঘণ্টা নাড়ে, লোকেরা তাদেরই পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু যাঁরা ভজন-চতুর, তাঁরা জানেন রন্ধনকারীই বড় সেবক।

স্তব-স্তুতি করার থেকে রন্ধন-সেবা অনেক বড়। পূজারীর থেকেও রন্ধন-সেবার মূল্য অনেক বেশী। ঠাকুরের সোনার চূড়াযুক্ত মন্দিরের চারিদিকে electric light (বিজলী আলো) ঝলমল ক'রছে; কিন্তু ঠাকুরের দৈনন্দিন খাবারের দিকে দৃষ্টি নেই। এতে তাঁর সেবা সুষ্ঠু হয় না। ঠাকুরের প্রধান স্থান হ'লো ভোগ-মন্দির। ঠাকুরের ভোগ রান্নায় মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হ'বে, রান্না গোপনে হ'বে, কেউ দেখবে না। ঐ ধ্যানে, ঐ সেবায় ডুবে যেতে হ'বে।

রন্ধনের পরেই শ্রীবিগ্রহসেবায় শৃংগারের মূল্য। শ্রীবিগ্রহে মালা পরায়, লোকে দেখে প্রশংসা করে। কিন্তু রন্ধন-সেবা কেউ দেখ্‌তে পায় না। রন্ধনকারীকে যারা সাহায্য ক'রবে, তারাও ফল পাবে। ভাল বাজার ক'রে আনা হ'লো, কিন্তু ভাল রান্না হ'লো না। সব ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সুতরাং রন্ধনসেবা খুব মনোযোগ ও পরিপাটির সঙ্গে করা দরকার।

—❖—

সম্বন্ধবোধযুক্ত বৈষ্ণব সকলের পূজ্য

শরীরটার সঙ্গে মনটার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ-বোধ আছে। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার আত্মীয়—এই রকম আমার বোধ যেখানে, সেখানেই সম্বন্ধ। কিন্তু যেখানে আমার বোধ নেই, সেখানে সম্বন্ধ হয় নি। সংসারী লোকের স্ত্রী, পুত্র, মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্বন্ধ-বোধ থাকে। ভক্তিসাধকেরও সম্বন্ধ-বোধ থাকা চাই। কাদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাক্‌বে ? শ্রীহরি-ঠাকুর ও বৈষ্ণব-ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধ-বোধ থাকা চাই। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্যামসুন্দর আমার ঠাকুর, আমার আরাধ্য, আমার সেব্য—এই রকম আপনবোধ হৃদয়ের মধ্যে থাকা চাই। নিজের হৃদয়ের মধ্যে শ্রীশ্রীহরি-ঠাকুর ও শ্রীগুরু ঠাকুরকে বসানো

চাই। আমার ঠাকুর কৃষ্ণ, আমার গুরুদেব—এইরূপ আপনবোধ হ'লে ভজন আরম্ভ হ'বে। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে যার সম্বন্ধ-বোধ হ'য়েছে অর্থাৎ আমার বোধ বা আপনবোধ হ'য়েছে, তার ভজন আরম্ভ হ'য়েছে। যার ভাগ্যে এমন সম্বন্ধ-বোধ হ'য়েছে, তার ভক্তিপথে চলা শুরু হ'য়ে গেছে। শ্রীহরি-ঠাকুর, শ্রীগুরু ঠাকুর কিসে সুখী হন, তা আমাকে দেখতে হ'বে। আমার ঠাকুর ত সকলের ঠাকুর। কিন্তু সকলে তাঁর সেবা, তাঁর সুখ-চিন্তা করুক বা না করুক—আমাকে ত ক'রতেই হ'বে। ঠাকুরের আজ রান্না হয়নি, তাঁর আরতি হ'লো না, তাঁর কীর্তন হয় নি—এতে আমার কি ? আমায় সেবা ত বাসন মাজা বা ভিক্ষা বা ভিক্ষা করা। যার সম্বন্ধ-বোধ হ'য়েছে, সে উদাসীন হ'য়ে থাক্‌তে পা'রবে না; যেহেতু ঠাকুর আমার। ঠাকুরের আজ খাওয়া হয়নি, আমার প্রাণে ব্যাথা লাগছে। ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধবোধ থাক্‌লে তাঁর সর্বাঙ্গীণ সেবার প্রতি দৃষ্টি থাকে। যার সম্বন্ধবোধ এসেছে, তাঁর সেবার মধ্যে Compartmental ভাব মনে আস্‌বে না। আমার কাজ শুধু ফুল তোলা, বাসন মাজা, আমার কাজ শুধু কীর্তন—এ রকম ভাব যাদের আছে, তাদের পরিপূর্ণ সম্বন্ধবোধ হয় নি।

এই মমত্ববোধ কিসের থেকে হয় ? শ্রদ্ধা, ভক্তি বা প্রীতি থেকে এই মমত্ববোধ আসে। আত্মীয়তা-বোধ, স্বজনবোধ ও সম্বন্ধবোধ নিয়ে ভজন আরম্ভ হয়। কিন্তু ভাগবত পড়ে এ বোধটা হ'বে না। গুরুদেবের যারা দাস গুরুদেবের যারা প্রিয়জন, গুরুদেবকে যারা ভালবাসে, তাদের সঙ্গেও সম্বন্ধবোধ হয়। শ্রীহরি-ঠাকুর, শ্রীগুরু-ঠাকুর ও বৈষ্ণব-ঠাকুরের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্বন্ধ, ভক্তির সম্বন্ধ বা প্রীতির সম্বন্ধ যদি হয়, তবে ভক্তি-সাধন আরম্ভ হ'লো। আপনবোধ নেই, প্রিয়তা নেই আমার-বোধ নেই, তবু ফুল দিয়ে গেল, একটা আম দিয়ে গেল,—এতে সম্বন্ধ নেই, বুঝে নিতে হবে। যেখানে আপনবোধ নেই, সেখানে সম্বন্ধ নেই, সেখানে ভজনও নেই।

আরও একটু গভীর রহস্যময় মজার কথা আছে। শ্রীহরি-ঠাকুর

আমার আরাধ্য, আমার সেব্য। কিন্তু শ্রীহরি-ঠাকুরের সঙ্গে সহসা আপনবোধ আন্‌তে পারা যায় না। শ্রীহরি-ঠাকুর রক্তমাংসের চেহারা ধারণ ক'রে আমার কাছে আসে না। তাঁর আদর, তাঁর স্নেহ, তাঁর সঙ্গে আলাপন, তাঁর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান directly (সাক্ষাদ্‌ ভাবে) করা যায় না। কিন্তু শ্রীগুরু-ঠাকুরের কাছ থেকে আদর, স্নেহ, directly পাওয়া যায়। শ্রীহরিঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধবোধের চেয়ে শ্রীগুরু-ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধবোধের Particability (বাস্তবতা) বেশী। তিনি খান, কথা বলেন, তিনি ঘুমান, তিনি শাসন করেন, তিনি আমার ভালমন্দ দেখা-শোনা করেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির সম্বন্ধ-বোধটা শ্রীগুরুঠাকুরের সঙ্গে সহজে হয়। মা তার ছেলেকে সহজে ভালবাসে। কেননা তাকে কোলে করে এবং দুধ খাওয়ায়; তার সঙ্গে কথাবার্তা, আলাপ, হাসি-কান্না চলে। সুতরাং ছেলেকে ভালবাস্‌তে সুবিধা। কিন্তু কোন ফটোর সঙ্গে তেমন ভালবাসা চলে না। গুরুদেব রক্তমাংসের চেহারা ধরে আছেন। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধবোধ সহজে হয়। গুরুদেবের সঙ্গে আপনবোধ বা মমত্ব-বোধ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির ভাব আনা সহজ। গুরুদেবকে যাঁরা আপন জন বলে জানেন, তাঁদের সঙ্গেও আমার আপনবোধ হয়।

গুরুদেবের কাছ থেকে শুধু মন্ত্র নিলেই সম্বন্ধবোধ হয় না। যে কারণে হো'ক গুরুদেবকে যদি কেউ ভালবাসে, তার সম্বন্ধবোধ হ'য়েছে। পূর্ব সংস্কার-বশতঃ হো'ক, ভাগ্য বশতঃ-হোক, যে কোন কারণে না কেন, যদি গুরুদেবের সঙ্গে আপনবোধ, মমত্ববোধ সম্বন্ধবোধ হয়, তা'হলে ভক্তিপথে চলা শুরু হ'য়ে গিয়েছে। ইহা ভক্তিপথের প্রথম সোপান। যা'র আপন-বোধ আছে, তার শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি আছে।

'গুরুদেব আমার'—এ বোধ যা'র জন্মায় নি, তা'র ভজন আরম্ভ হয় নি। মা আমার, দিদি আমার এটা আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু শ্রীহরিঠাকুর আমার, শ্রীগুরুঠাকুর আমার—এটা বুঝতে শিখি নি; অথচ "জয় গুরু" বলে আলেখ্যে খুব ফুল ছড়াচ্ছি। এটা দোষের কিছু

নয়। কিন্তু সম্বন্ধ-বোধটা আনতে হ’বে। আমি গুরুদেবকে ভালবাসি, তিনি আমায় ভালবাসেন। হৃদয়ের এই প্রীতির সম্বন্ধ শাস্ত্র পড়ে বুঝতে পারবে না, কীর্তনের বই পড়ে বুঝতে পারবে না। ভক্তি প্রাণের থেকে বা হৃদয়ের থেকে উঠে। তখন খুব অল্পকালে দ্রুত ভজনরাজ্যের উন্নতি হয়। আমার গুরুদেবের দুই হাজার শিষ্য আছে। তারা দেখুক বা না দেখুক আমাকে ত দেখ্‌তে হবে আমার মন্দির, আমার ঠাকুর। আজ ঠাকুরের ভাল রান্না হয় নি। তিনি ত না খেয়ে থাক্‌লেন। এতে আমার প্রাণে ব্যথা লাগবে। যার মমত্ববোধ আছে, তা’র ভজন হ’বে। তা’র পাপ, অপরাধ, দোষ-ত্রুটি থাক্‌তে পারে। কিন্তু ঐ ভুল-ত্রুটি বেশী দিন থাক্‌বে না। সম্বন্ধবোধ এলে প্রেমের বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যা’বে। আপন-বোধের এত জোর—এত তার শক্তি ও সামর্থ্য! আমি তাঁকে হৃদয়ে বসিয়েছি—এ বোধটা এলে গুরুকরণ সার্থক হয়েছে।

যা’র এ সম্বন্ধ এসেছে, সেই নমস্য। যার সম্বন্ধবোধ এসেছে, সে যদি ছোট্ট মেয়ে হয়, কিংবা সে যদি বুড়ো হয়, সেই পূজ্য। সে অন্যায় ক’র্‌লেও সে হরি-ঠাকুর ও গুরু-ঠাকুরকে ভালবেসেছে, সেই আমার প্রণম্য। সে হয়ত গান গাইতে পারে না, রান্না ক’রতে পারে না। অর্থাৎ তা’র কোন যোগ্যতা নেই, তথাপি সে হরি-ঠাকুর ও গুরু-ঠাকুরকে ভালবেসেছে বলে তা’র পায়ে কোটি নমস্কার। সে নিতান্ত বালিকা হ’তে পারে’ সে অকর্মণ্য হ’তে পারে, তা’র কোন গুণ না থাক্‌তে পার, তথাপি সে পূজ্য ও নমস্য।

—❖—

দিব্যজ্ঞান তথা সম্বন্ধ-জ্ঞান

“দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥”

—(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৯)

দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা সমূলে নির্মূল হয়। সেজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে “দীক্ষা” নামে অভিহিত করেন।

কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য,—এটা যাঁরা উপলব্ধি ক’রেছেন তাঁরা তত্ত্বদর্শী। ভক্তি-বৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন যে, যাঁর থেকে দিব্য-জ্ঞান পাওয়া যায়, তিনিই তত্ত্বদ্রষ্টা বা দিব্যদ্রষ্টা। দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান—যথার্থ সম্যগ্ জ্ঞান। ভগবান্ ও জীবের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, হৃদয়ে তার উপলব্ধি করাকেই দিব্যজ্ঞান বলে। এই দিব্যজ্ঞান লাভ ক’র্‌লে হৃদয়ের অন্ধকার চলে যায়, সত্যের আলোক উদ্ভাসিত হ’য়ে উঠে।

জ্ঞান অনেক রকম আছে। স্কুল-কলেজ ও ইউনিভারসিটিতে যে জ্ঞান হয়, তা হ’লো জড় জ্ঞান। অঙ্ক শেখা, ইংরেজি শেখা, ডাক্তারি শেখা—এগুলিকে দিব্যজ্ঞান বলে না। যে জ্ঞানের দ্বারা সাবধান করে দেন। তাঁরা বলেন,—“নিজের দোষ দেখ। অন্যের দোষ না দেখে তার গুণগুলি দেখ। নিজের দোষ দেখতে শিখলে অন্তরে দৈন্য আসবেই আস্‌বে। ‘দীনের অধিক দয়া করেন ভগবান্।’ যার দীনতা আছে, তার বাক্যে, আচরণে, ভাবের মধ্যে দীনতা ফুটে উঠবে। তার প্রতি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা বর্ষিত হয়। হামবড়াভাব থাক্‌লে ভক্তিরাজ্য থেকে বিচ্যুত হ’য়ে যাবে। এর ফলে বৈষ্ণবের কৃপা ও আশীর্বাদ আকর্ষণ ক’রতে পারবে না। অমানী মানদ হলে শ্রীগৌর-করুণা লাভ করবে। যার মধ্যে বাস্তবিক ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়েছে, তার অন্তরে দৈন্যের ভাব এসে যাবে। যার সর্বনাশ উপস্থিত, তার মধ্যে দাম্ভিকতা দেখা দেবে। সুতরাং নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যের দোষ দেখা ভক্তিপথের বিরাট বাধা। এই বাধা সম্পর্কে সচেতন থেকে ভক্তি-অনুষ্ঠানগুলি করে গেলে নিত্য মঙ্গললাভ অনিবার্য।

—❖—

শ্রীহরিতোষণই শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘের প্রাণ

আজকে সংঘের সাধারণ সভা। এখানে আজ বিশিষ্ট বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত আছেন। মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সর্বদা সজাগ থাক্‌তে হ'বে। কৃষ্ণ-দাস্য, কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানই আমাদের মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কৃষ্ণানুশীলনই জীবের একমাত্র ও সর্বপ্রধান কর্তব্য।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

—(শ্রীচৈ চ ম ২০।১০৮)

কৃষ্ণদাস্য, কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি যাতে লাভ করতে পারি, সেইজন্য মহাজনগণ এই সংঘ স্থাপন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমষ্টিগত জীবনে যাতে কৃষ্ণলাভ ক'রতে পারা যায়, তার জন্য এই সংঘের উদ্ভব। কৃষ্ণের প্রীতিময় সেবার জন্য যা কিছু দরকার, যা কিছু তাঁর সেবার অনুকূল; তাই আমাদের গ্রহণ করতে হ'বে; কিন্তু ভক্তিপ্রতিকূল যা কিছু, তা সব বর্জন ক'রতে হ'বে। তাই মহাজন বলেছেন—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জনম্"—(বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)

জীবনে যাতে কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানে আনুকূল্য করতে পারি, তজ্জন্য মিশনে বাস। সংঘের মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণানুশীলন যেন কখনও আমরা বিস্মৃত না হই। সংঘের যোগদানের মূল উদ্দেশ্যটা যাতে কখনও আবৃত না হয়, সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সকলেরই কর্তব্য। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমষ্টিগত জীবনে শ্রীহরিতোষণই মূল কথা—ইহাই central ও fundamental কথা। ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে থেকে এই কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান বৃত্তি যাতে দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—সেদিকে নজর রাখা উচিত। ভক্তিপথে যাতে সকলের Progress কিংবা Promotion হয়, সংঘের পরিচালকগণ যেন এই মূল বিষয়টির প্রতি নজর রাখেন। কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানকে পিছনে রেখে যদি অন্য কোন ক্রিয়াকলাপের প্রতি

জোর দিই, তাহলে ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করেও ঠক্‌তে হ'বে। আমাদের দৃষ্টি যেন কোন দিকে diverted না হয়, সেদিকে নজর না দিলে জীবনে সাফল্যলাভ হ'বে না ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে এসে যদি কর্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য দিই, তাহলে মঠ স্থাপনের মহান্ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে হবে, ইহা suicidal বা আত্মহত্যারই কথা। পৃথিবীতে অনেক মিশন আছে, সেখানে কর্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য। সেখানে গণ-তোষণ ও দেহ-মনের উপকার নিয়ে তারা ব্যস্ত। কোন প্রতিষ্ঠানে intellectual Pursuit এর প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মিশনের মূল উদ্দেশ্য হ'লো শ্রীহরির তোষণ। গুরুবর্গগণ কৃষ্ণানুশীলন সংঘ নামে একটি সংস্থা গঠন ক'রেছেন। এর পিছনে যে বিরাট আদর্শ রয়েছে, তা আমাদের প্রত্যেককে মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রতে হবে। আমাদের জীবনধারণের মর্ম কথা হলো কৃষ্ণানুশীলন; কিন্তু আমাদের বহির্জতের নানা পরিস্থিতির মধ্যে থাক্‌তে হ'চ্ছে। বহির্জগতের বাধাবিঘ্ন এসে উৎপাত স্বষ্টি ক'রে যাতে আমাদের কৃষ্ণসুখানুসন্ধান থেকে ভ্রষ্ট ক'রতে পারে না পারে; তজ্জন্য গুরুবর্গ এই সংঘকে registered society-তে পরিণত করেছেন। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে যাতে আমরা কৃষ্ণানুশীলন ক'রতে পারি, তজ্জন্য গুরুবর্গ যুগোপযোগী এই কৌশল আবিষ্কার ক'রতে পারি, তজ্জন্য গুরুবর্গ যুগোপযোগী এই কৌশল আবিষ্কার ক'রেছেন। অনেক সময় আমরা অনেক কথা বলে থাকি— মিশনে এই রকম করতে হবে এটা করতে হবে,—ওটা করতে হবে,— এই সব আলোচনার সার্থকতা কোথায়? কৃষ্ণসুখানুসন্ধান যতটা হলো, ততটাই এর সার্থকতা। এই মূল উদ্দেশ্য ছেড়ে দিয়ে বা ভুলে গিয়ে দূরে গেলে সংঘের ব্যর্থতা। যেমন বেঁচে থাক্‌তে হ'লে শ্বাস-প্রশ্বাসটা অপরিহার্য। শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ রেখে কেউ স্নান করে না, খায় না বা ঘুমায় না। শ্বাস-প্রশ্বাসটা সব সময় চাইই চাই। শ্বাস-প্রশ্বাসটা বজায় রাখার জন্যই স্নানাহার ও বিশ্রাম ইত্যাদি আবশ্যক হয়। শ্বাস প্রশ্বাস না থাকলে স্নানাহার ইত্যাদির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তেমনি মিশন-

জীবনে যদি আমরা মুহূর্তকাল শ্রীহরিতোষণরূপ মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হই, তাহলে আমরা জীবন্মৃত। সুতরাং আমরা মঠে যা Programme করি না কেন কেন্দ্রে শ্রীহরিতোষণ থাকা চাইই চাই। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা রকম social ও Political Problems দেখা যাচ্ছে। সেই সব Problems-এর adjustment ক'রে মিশনের ভজনপদ্ধতি chalk out করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝখানেও আমরা যাতে কৃষ্ণানুশীলন করতে পারি, তার জন্য সংঘের উদ্ভব।

সঙ্গ না ক'রে নির্জন ভজনও করা চলে,—এ রকম চিন্তা কারও কারও মনে জাগ্‌তে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে থেকে নির্জন-ভজন বা ব্যক্তিগত ভজন নির্বিঘ্নে করা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরঘুনাথগোস্বামী প্রভৃতি গুরুবর্গ শ্রীবৃন্দাবনে যে ভজনাদর্শ দেখিয়েছেন, তা বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে সম্ভব হবে না। আজকের দিনে ঠিক সেইভাবে কৃষ্ণানুশীলন হবে না। আমাদের পক্ষ ঐ রকম ভজন আর Practical হবে না।

এ যুগের কথা চিন্তা করেই সময়োপযোগী কৃষ্ণানুশীলন করার জন্য গুরুবর্গ সংঘ স্থাপন করেছেন। এটা তাঁদের বিরাট অবদান—তাঁদের করুণা-বিতরণের এই যুগোপযোগী ভঙ্গী আজ সকলকে মর্মে মর্মে অনুভব ক'রতে হ'বে। এই সংঘের প্রাণকেন্দ্র হ'লো নির্বিঘ্নে শ্রীহরিতোষণ। প্রাণটাকে বাদ দিয়ে দেহ-মনের উপর জোর দিলে আমাদের বঞ্চিত হ'তে হবে। গুরুবর্গের করুণা থেকে আমরা দূরে চলে যাবো। মিশনের মূল উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত বা আচ্ছাদিত না হয়; সেজন্য বহির্জগতের সঙ্গে তাল ঠুকে চলার জন্য কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ সাময়িকভাবে করতে হয়। জগতের লোককে ভোগা দেওয়ার জন্য এই রকম ব্যবস্থা। ঘরে বসে যাতে নির্বিঘ্নে ভজন ক'রতে পারি, সেইজন্য প্রাচীর, গেট ও দ্বারোয়ান রাখার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রাচীর

ও গেটের উপর যদি আমরা জোর দিই, তাহলে ঠিক হ'বে না। আমাদের Constitution-এ কোন কোন বিষয়ের প্রাধান্য দেওয়া আছে—সত্য। কিন্তু সংঘের মূল spirit বা অন্তর্নিহিত ভাবটা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই, সেজন্য পরিচালকগণের তীব্র দৃষ্টি থাকা দরকার। আমাদের প্রাণকেন্দ্রটাকে কখনও আচ্ছাদিত করতে দেওয়া হ'বে না। প্রাণকেন্দ্রটা আবৃত হয়ে গেলে আমাদের মিশনের ব্যর্থতা এসে যাবে। Constitution-এর Cumborous situation মূল উদ্দেশ্যকে অনেক সময় আচ্ছাদিত ক'রতে চায়—এই সময় খুব হুঁশিয়ার থাক্তে হয়। মূল উদ্দেশ্য শ্রীহরিতোষণ সেই সময় forefornt-এ আন্তে হবে।

শ্রীমতী বিনোদবাণী তাঁর homage এর মধ্যে একটি কথা অতি সুন্দরভাবে বলেছেন। তিনি বাহ্যিক আড়ম্বরকে Sensational deeds বলে আখ্যা দিয়েছেন। বহির্জগতের কাছে outwards show এর একটা value আছে। ভক্তির নাম করে অনেকে জনসমাজে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে। এটা Sensational deeds বা Spectacular deed অর্থাৎ বাহ্যিক demonstration. বহির্জগতের লোককে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য ভক্তির নাম করে যারা demontration করে, তাদের জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ভক্তিরাজ্যে অনেক গ্রন্থ-প্রকাশের মধ্যেও intellectual show আছে। বহু বই, বহু পত্রিকা-প্রকাশ ও জ্ঞানরাজ্যের spectacular deeds আমাদের চোখকে ঝল্‌সে দেয়। বড় বড় বক্তৃতা, বড় বড় সভা, বহু লোকের হাততালি সংগ্রহ করার মধ্যে demonstrative value আছে। এই সব জিনিষগুলি ভক্তিরাজ্যে আমাদিগকে সাহায্য করতে পারে যদি মূলের দিকে তীব্র লক্ষ্য থাকে। এই সব জিনিষ এক-আধটু হ'লে ক্ষতি হয় না। কিন্তু এগুলি যদি আমদের চোখকে ঝলসিয়ে দেয়, এর চাকচিক্যে যদি আমরা জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যাই, তাহলে সেটা দোষাবহ ও বর্জনীয়। অনেকে এই সব ক'রতে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের কথা উল্লেখ করে। তিনি মহাভাগবতোত্তম। তাঁর পক্ষে এই সব শোভা হ'য়েছে। এই সব করেও তাঁর ইষ্ট দর্শন আবৃত হ'য়ে যায় নি। এ সব

বস্তুকে তিনি শ্রীহরিতোষণে নিযুক্ত করেছেন। তিনি এমন চতুর, এমন ভজনবিজ্ঞ ছিলেন যে, বহু গ্রন্থাদি প্রকাশ ক'রে বহু মঠমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বড় বড় সমিতি ক'রে তিনি ইষ্টেরই সুখবিধান করেছেন। তাঁর অধিকারে এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণে তাঁকে নকল করতে গিয়ে যারা এসব করে, তাতে শ্রীহরিতোষণরূপ মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হ'বার আশংকা আছে। বাস্তবিক কেউ যদি অধিকারী হ'ন তাহলে এগুলি করেও ভক্তিরাজ্যের শোভা বর্ধন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণতোষণের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত। তিনি গুরু সাজেন নি,—স্বতঃসিদ্ধ মহাজনরূপে এ প্রপঞ্চে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। যারা তাঁকে অনুকরণ ক'রতে যাচ্ছে, শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা হ'য়েছিল ব'লে চিৎকার ক'রে ঘোষণা করছে, এদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক নিম্ন স্তরের। তাঁর মতকে অনুকরণ ক'রে মনে ক'রছে,—এতেই জীবনের সার্থকতা। যদি তাঁর শিষ্য হিসাবে অনুকরণ ক'রতে চাই, অথচ মর্মে মর্মে তাঁর ভজনপদ্ধতির Spirit অনুভব না করি, তাহলে জীবনের সার্থকতা আস্‌বে না। শ্রীল প্রভুপাদের জনগণের মধ্যে এই রকম বিপদ এসে পড়েছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের Spectacular deed এর উপর তারা জোর দিচ্ছে। তাঁর শিষ্য হিসাবে শুধু যদি আনুষ্ঠানিকতার উপর জোর দিতে চায়, অথচ তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন নেই,—এ রকম অনুকরণের ফলে তারা ভক্তিরাজ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে,—অতল সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে, তাদের ভক্তিরাজ্যে অভ্যুদয় হচ্ছে না। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণে মঠ-মন্দির, Exhibution, সভা-সমিতি, গ্রন্থ প্রকাশ চল্‌ছে। এগুলি প্রাণহীন অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়। বহির্জগতের ক্রিয়া-কলাপের দিকে ঝোঁক না দিয়ে নিজ নিজ অধিকার-অনুসারে ভক্তিপথে চলাই শ্রেয়।

"স্বেস্বেহর্ধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥"

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২১২)

অধিকার অনুসারে চললেই মঙ্গল। এতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সুখী হবেন। তোমাদের যা আছে, তাই দিয়ে তাঁর সন্তোষবিধান করো। তোমাদের অর্থ, বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য—সব কিছু দিয়ে তাঁর সুখময়ী সেবা করো, মংগল অনুবার্য। তোমাদের যা resources আছে, তোমাদের ধনবল, জনবল—অর্থাৎ তোমাদের সর্বস্ব দিয়ে তাঁর সেবা করো। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ, শ্রীল রায়রামানন্দ, শ্রীল প্রভুপাদ মহাজনগণ তাঁদের সর্বস্ব দিয়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিবিধান করেছেন। তাদের এই মহান্ আদর্শকে অনুসরণ করা উচিত। তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ না ক'রে যদি অনুকরণ করতে যাও; তাহলে ভুল হবে। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বৃন্দাবনে এক একদিন একটি গাছতলায় রাত্রি যাপন ক'রে শুষ্ক চানা চিবিয়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিবিধানের জন্য কত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এই অত্যুজ্জ্বল আদর্শকে অনুসরণ করে অনুকরণ করলে জীবনে বিপর্যয় আসবে। তাঁকে ভ্যাঙ্চানো হ'বে। তেমনি শ্রীল প্রভুপাদকেও অনুকরণ করার দরকার নেই। তাঁকে জীবনে অনুসরণ করো। তোমার সামর্থ্যে যতটুকু পারো, ততটুকু সেবা করো; তাতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর খুশি হবেন। তিনি যেটা তোমার কাছে চান না, সেটা করাটা ঠিক হবে না। তোমাদের জনবল, অর্থবল যা আছে, তার মধ্যে শাঠ্য করো না, অলসতা করো না। হে অন্তর্যামী ঠাকুর ! তুমি আমাকে বুদ্ধিযোগ দাও, যাতে তোমার সেবায় শাঠ্য কিংবা অনধিকার চর্চা না করি।" কপটতা, প্রতিষ্ঠা, প্রতিযোগিতা, অন্যাভিলাষ সেবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। অন্যের দেখাদেখি, অন্যের অনুকরণে যেন তোমাদের মতি না যায়। বাহিরের চাকচিক্য যেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-শোভা থেকে দূরে টেনে নিয়ে না যায়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আমাদের বল কোথায়? কয়েকজন নিষ্কপট শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ কত বড় ভাগ্য,—এ ভাগ্যের তুলনা নেই। একজন শুদ্ধ নিষ্কপট বৈষ্ণবের সঙ্গ জীবনে যথেষ্ট। এরা কোন, দুষ্ট শয়তানী মতলব নিয়ে মিশনে আসে নি, কোন Position পাওয়ার জন্য আসে নি। হয়ত এদের খুব বেশি যোগ্যতা নেই। কিন্তু এতে কিছু যায় আসে না। ভয়

শুধু সেইখানে, যদি তোমার পাদপদ্ম সেবা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। হাজার হাজার শিষ্য, গণ্ডায় গণ্ডায় মন্দির চাই না। লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার নেই। রজস্তমোগুণ-তাড়িত বহু লোকের সমাগম চাই না। Quantative success চাই না; qualitative success চাই। অনেক লোক হ'লে লাঠালাঠি হ'বে। বহু লোকের হাতে যদি দণ্ড দাও, শেষে দণ্ড নিয়ে মারামারি হবে। সন্ন্যাসীর দণ্ড যদি লাঠিতে পরিণত হয়, তাহলে ভক্তিরাজ্যে মহা দুর্যোগ ঘনীভূত হয়ে উঠে। দণ্ড দিয়ে যেন লাঠালাঠি না করি, ভক্তিবল যাতে বৃদ্ধি হয়, সেদিকে যেন তীব্র দৃষ্টি করি। বৈরাগী হয়ে যেন আলস্যপরায়ণ হয়ে জীবন না কাটাই,—সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। পঞ্চাশ জন শুদ্ধ নিষ্কপট বৈষ্ণব পাওয়া যায়, তাহলে ভক্তিকে আবৃত করবে না। এতে ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, এতে কোন উৎপাত স্বষ্টি হবে না, কর্মের দিকে ঝোঁক ও জ্ঞানের দিকে ঝোঁক ভক্তিকে আবৃত করে। কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করা, কতকগুলি মঠমন্দির করা অনেক সময় ভক্তিকে আবৃত করে। সেবার যখন প্রয়োজন, তখন যেন ঘুমিয়ে না পড়ি, ঘুমিয়ে পড়লেও বন্ধুরা আমাকে পরিচালন করবেন।

—❖—

গুর্বানুগত্য ও গৌড়ীয় গুরুবর্গের কৃপা বৈশিষ্ট্য

ভগবানের করুণামূর্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবলি ভকতি সদ্ম। ভূতদ্রষ্টাজীবগণ গুরুদর্শন করতে পারে না। সেজন্য তারা বাস্তব মঙ্গল থেকে দূরে অবস্থান করে। গুরুদেব ভগবানের সেবা মূর্তি—এই দর্শনই সুদর্শন। গুরুদেবকে শ্রুতির সাহায্যে দর্শন করা যায়। জড়চক্ষুর দ্বারা গুরুপাদ-পদ্মের যথার্থ দর্শন হয় না, শ্রৌতদর্শনের মাধ্যমে গুরুদেবের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়।

বেদদৃক্-জনই শ্রীগুরুদেব। তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবের সঙ্গ, কৃপা ও সান্নিধ্য লাভে জীবের ভুত-দর্শন বা মাংস দর্শনের উপরম হয়। ত্রিবিধ তত্ত্ব-দৃষ্টি-সম্পন্ন তিন শ্রেণীর গুরু আছেন। জ্ঞানী গুরুর সঙ্গ কৃপায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করা যায়। যোগী গুরুর সঙ্গ ও কৃপাসান্নিধ্যে পরমাত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় কিন্তু ভগবদ্‌দ্রষ্টা ভক্তগুরুর সঙ্গ ও কৃপায় ভগবদ্‌দর্শন, ভগবানের প্রীতিময়ী পরিচর্য্যা লাভ হয়।

ভগবান্ ভক্তি বা প্রীতির বিষয়। ভগবান্ এবং ভক্তের মধ্য ভক্তি নিত্য বর্তমান। গুরুপাদপদ্ম ভগবদ্ প্রেষ্ঠজন। ‘গুরু কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ জনেরে’। গুরুদেবের কৃপায় ভগবত্তত্ব-ও ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় এবং ভগবানে প্রীতিলাভ হয়। প্রীয়ত্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরুদেবকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও পরিচর্য্যার দ্বারা ভগবদ্দর্শন ও ভগবদ্-সেবা প্রাপ্তি হয়।

গুরুদেবের হৃদয়-কমলে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ নিত্য বিলসিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের সম্পদ স্বরূপ। আশ্রিতজনকে তিনি কৃষ্ণকে প্রদান করতে পারেন। তাঁর কৃপা ও সঙ্গ ব্যতীত জীবের সংসার সমুদ্র হতে নিস্তারের অন্য কোন উপায় নেই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত অনর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। তাঁর শ্রীচরণাশ্রয়ের ফলে ভগবদ্-সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং সংসারের আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্যবোধ ও আসক্তি বা মমত্ববোধ দূরীভূত হয় ; অর্থস্বরূপ ভগবানের কথা এবং সেবায় শ্রদ্ধা-রুচি-আসক্তি—ভক্তির ক্রমানুযায়ী পরিবর্ধিত হয়। ভগবান্ কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে কৃপা করেন না। গুরুদেবের মাধ্যমেই আশ্রিতজনের প্রতি কৃষ্ণ-কৃপা বর্ষিত হয়। তিনি শিষ্যবর্গকে কেবল নাম মন্ত্র প্রদান করেন তা নয়, নাম মন্ত্রের সঙ্গে কৃষ্ণ সম্বন্ধবিজ্ঞান এবং ভজন শিক্ষা উপদেশ প্রদান করে শিষ্যের বাস্তব মঙ্গল লাভের পথ পরিষ্কার করে দেন। গুরুদেবের কৃপা, সঙ্গ ও শিক্ষাদি প্রাপ্তজনের হৃদয়ে ভগবন্নাম ও মন্ত্রাদি স্বাভাবিক স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়।

ভক্তিতর সাধকগণ অর্থাৎ জ্ঞানী এবং যোগীগণও তত্তৎ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন, কিন্তু তত্তৎ সাধনের মধ্যে মুক্তি বা

সিদ্ধিলাভের পর গুরুসেবা বা গুরুপূজা তাঁরা পরিত্যাগ করে থাকেন। ভক্ত সাধকগণ কিন্তু সাধনকালে যেমন গুরুসেবা করে থাকেন, ভক্তির সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমলাভের পর নিত্যকাল গুরুসেবা করে থাকেন।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবিহীন কোমল শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভক্তগণ ভগবদ সেবার জন্য চেষ্টাশীল থাকেন। তাঁরা গুরুসেবার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না, কিন্তু তাঁদের সেই প্রকার ভগবদ্ সেবা বিজ্ঞান সম্মত হয় না অর্থাৎ ভগবানের সুখে পর্য্যবসিত হয় না। সেজন্য ভগবান তাহা প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভগবদ্-সেবাকুশলী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার ফলে, সেবার পরিপাটি সহজে হৃদয়ে উপলব্ধ হয়। গুরুপাদপদ্ম ঐকান্তিক ভক্তের সেবাটি আত্মসাৎ করেন না। তিনি সমাশয় নিত্য মঙ্গল সাধন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যাঙ্গ যাজনের কথা বলতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমে গুরুপাদাশ্রয় এবং গুরুদেবের নিকট ভগবদ্ বিষয়ক শিক্ষা ও দীক্ষাদি গ্রহণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ভক্তসাধক মাত্রেরই গুরুসেবা ও গুর্বানুগত্য চরম এবং পরম প্রয়োজন। গুরুদেবের কি অভিপ্রায়, তাঁর কি মনোভীষ্ট, তিনি কিসে সুখী হবেন, এটা শিষ্যের একমাত্র চিন্তনীয় এবং করণীয়। অনুরূপে গুরুদেবও শিষ্যের পরমার্থ পথের নিত্য বান্ধব, সঙ্গী এবং নিত্যমঙ্গলকামী। গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধটি নিত্য বর্তমান থাকে।

গৌড়ীয় গুরুবর্গ রসিকশেখর কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবারস উপাসনার শিক্ষা দেন। যাঁরা গুরুদেবকে কেবলমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-স্বরূপ বলিয়া বন্দনা করেন, তাঁরা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্-স্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপায়—জ্ঞান, যোগ ও বৈধী ভক্তির উপাসনা করে থাকেন। রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ-ব্রহ্ম পরমাত্মা-ভগবানের অংশী ও মধুর রস-স্বরূপ এবং মধুর প্রেমভক্তির বশ্য। মধুর প্রেমভক্তির স্থান গোলোক। তথায় রসিকশেখর কৃষ্ণ মধুর রসের পরিকরবর্গের মধুর-প্রেমরসের বিষয় হয়ে, মধুর প্রেমরসের আশ্রয় পরিকরবর্গের

সেবা স্বীকার করে প্রেম-রস আস্বাদন করেন ও তদাশ্রিতগণকে প্রেম-সেবারস আস্বাদন করান। এই রসিকশেখর কৃষ্ণের প্রেম-সেবারস আস্বাদন করাতে পারেন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অংশী শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ একমাত্র শ্রীবলদেব ও হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরাধারাণী। সেইহেতু গৌড়ীয় গুরুবর্গকে অভিন্ন বলদেব বা নিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং শ্রীরাধার নিত্য কিংকরী জেনে তাঁদের আশ্রিতবর্গ বন্দনা করে থাকেন।

প্রমাণশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে নিমি নবযোগেন্দ্র সংবাদে বিদেহরাজ-নিমিকে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধঋষি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু অর্থাৎ নিজ আত্মমঙ্গলকামী, জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য গুরুপাদপদ্মের শরণ বা আশ্রয় প্রার্থনা—এই প্রসঙ্গে এবং গুরুর স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন—

"তস্মাৎগুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্মান শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মদো হরিঃ॥"

ভাঃ ১১।৩।২১-২২

আত্মার নিজমঙ্গলকামী ব্যক্তি বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য অবধারণে যিনি সুনিপুণ এবং অপরোক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন, যিনি ভাগবদ্-সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন অর্থাৎ প্রেম-নেত্রে ভগবদ্দর্শন করেছেন এবং অপরকেও যিনি কৃপাপূর্ব্বক ভগবত্তত্ব-বিজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক ভগবদ্ সাক্ষাৎকার করাতে পারেন, এইরূপ আচরণশীল (মহাভাগবত) গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করবেন। কারণ শ্রুতিশাস্ত্রে পারংগত ভগবত্তত্ত্ববিদ্-জনই জীবের সর্ব্বপ্রকার সংশয়, সন্দেহ ও তর্কের ছেদন করিতে সমর্থ। গুরুদেবকে পরমার্থ পথের নিত্য পরম বান্ধব এবং সর্ব্বদেবময় হরিস্বরূপ জ্ঞাত হয়ে তাঁর নিকট ভগবত্তোষণাত্মক ভাগবদ্ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে হবে। ভাগবদ্ধর্মানুশীলনের শিক্ষা

প্রদানকারী শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ব্যতিরেকে জীবের নিত্য বাস্তব প্রয়োজন পুরুষার্থ-শ্রেষ্ঠ ভগবদ্‌প্রেম লাভের অন্য উপায় নাই। ভাগবত-গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়কারীর ভগবদ্‌সেবা ব্যতীত ইতরাভিলাষ সমূলে চিরতরে বিনষ্ট হয়। কপটতাশূন্য হয়ে ভোগসুখ বা মুক্তিসুখ এমনকি সিদ্ধিসুখ কামনা পরিত্যাগ করে নিরন্তর গুরু-সেবার দ্বারা হৃদয়ের জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞানতা, মালিন্য, কালিমা বিদূরিত হয়; তখন পরিমার্জিত হৃদয়ে কৃষ্ণকাষ্ণ জ্ঞানে স্থিত হয়ে ভগবত্তোষণাত্মক ভগবদ্ধর্মানুশীলন করতে সমর্থ হন।

ভাগবত-মূর্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে কলিকবলিত অবিদ্যাগ্রস্ত ভগবদ্‌বিমুখ জীবকেও নামসংকীর্তনাত্মক ভাগবদ্ধর্মের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি স্বয়ং গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করণান্তর পাত্রাপাত্র যোগ্যাযোগ্য বিচার না করে আচণ্ডালে গোলকের গূঢ়ধনস্বরূপ ভগবদ্-প্রেম নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা বিতরণ করে জগদ্‌গুরুর কার্য করেছেন। তাঁর সুমহান আদর্শ ও শিক্ষা এবং নির্দেশগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না থাকলেও শিক্ষাষ্টকে তার কিছু দিগ্‌দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরবিমুখ জীবকে ভগবদ্ সাম্মুখ্য প্রদান করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক উপদেশগুলিকে গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরচিত দশমূল শিক্ষা পুস্তিকায় বিশদ্-ভাবে আলোচনা করেছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ, ঠাকুরের সময়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে অপধর্ম বা ছলধর্ম্ম দেখা দেয়। তিনি মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মের সুপ্রচারার্থে তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা লাভের জন্য উক্ত দশমূল-শিক্ষা গ্রন্থে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক বিচারে বলেছেন—গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত বেদবাণীটি প্রথম শিক্ষা এবং বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রুতিশাস্ত্রানুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা নয়টি শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়—

১। শ্রীহরি পরমতত্ত্ব ২। তিনি সর্বশক্তি সম্পন্ন ৩। তিনি অখিল রসামৃতসিন্ধু ৪। জীবসমূহ তাঁহার বিভিন্নাংশ ৫। বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত ৬। মুক্তজীব মায়ামুক্ত ৭। চিদচিৎ বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশ ৮। ভক্তিই একমাত্র সাধন ৯। প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন।"—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অবলম্বনে তিনি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক বিজ্ঞান-সম্বলিত বহু ভক্তিগ্রন্থে ভগবত্তত্ব-বিচার ও জীবতত্ত্ব বিচার আলোচনা করে অচার্য্যের কার্য করেছেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—জীবের দেহব্যাধি নিরাময়ার্থে যেমন দশমূলারিষ্ট বা দশমূল পাঁচন সেবনীয়, তদ্রূপ ভবব্যাধির উপশমার্থে দশমূল শিক্ষা গ্রন্থটি জীবমাত্রেরই অনুশীলনীয়; দশমূল শিক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত না করাইয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে পঞ্চম সংস্কার প্রদান করিলে সম্প্রদায় কলুষিত হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শে শিক্ষিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দেশে দেশে ও স্থানে স্থানে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসী প্রচারকাদি প্রেরণ করে শুদ্ধভক্তি প্রচারের সুব্যবস্থা করেছেন। তিনি ছিলেন ভাগবত বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁর উপদেশাবলীতে বলেছেন "আমরা ইট, কাঠ পাথরের মিস্ত্রি হইতে আসি নাই। বাণীর পিয়ন মাত্র।"

"শত লাঞ্ছনায় শত গঞ্জনায় আপনারা হরিকীর্ত্তন ছাড়িবেন না। যে সময় আমরা হরিকীর্ত্তন ছাড়িব পারিপার্শ্বিক অবস্থা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" তাঁর সর্বঅন্তিম উপদেশ আশ্রিতগণের প্রতি গুর্বানুগত্যের চরম উপদেশ জানিয়েছেন—আপনারা সকলে মিলিয়া মিশিয়া মূল আশ্রয়-বিগ্রহের (শ্রীগুরুপাদপদ্মের) আনুগত্যে থাকিয়া এক তাৎপর্য্যপর হইয়া শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী কীর্ত্তন করিতে থাকিবেন।"

নয় প্রকার ভক্ত্যাংগগুলির মধ্যে গৌড়ীয়গুরুবর্গ মহাপ্রভু-প্রদর্শিত নৃত্যসংকীর্তন ও শ্রীবিগ্রহের পরিচর্য্যা এই দুইটির উপর বিশেষ গুরুত্ব

দিয়েছেন। এই দুই প্রকার ভক্ত্যংগ যাজনের দ্বারা ভগবানের বাচক স্বরূপ নাম-প্রভুর এবং বাচ্যাবতার শ্রীবিগ্রহের সুখোৎপাদিকা সেবা ও পরিচর্য্যা করা যায়। গুর্বানুগত্যের সঙ্গে শ্রীহরিসন্তোষণাত্মক বৃত্তি নিয়ে নিষ্কপটভাবে গৌড়ীয়গুরুবর্গ-প্রদর্শিত ভক্ত্যাংগগুলির অনুশীলন করলে সজাতীয়াশয় ও স্নিগ্ধ ভক্তগণের প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীষ বিশেষভাবে বর্ষিত হয়।

— ❖ —

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব ও মহিমা

যস্য প্রসাদদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদ্যৎ নগতিঃ কুতোঽপি
ধ্যায়ং স্তুবংতস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও মিশনে স্থানীয় ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে আয়োজিত গুরুপূজায় ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের যে মহিমা কীর্তন করে আত্ম-কল্যাণ বরণ করেছেন—তা শুনবার সৌভাগ্য লাভ করে কৃতার্থ হয়েছি।

গুরুদেবকে জানতে হলে গুরু-কৃপা লাভ করতে হবে। ভৌতিক ভূমিকায় গুরুতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না। ভূতের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ রয়েছে অর্থাৎ পিতামাতা হয়ে পুত্রকন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে যারা প্রীতি করছে, বা স্বামী হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভৌতিক ভূমিকায় যে প্রীতি করা যায়—এই প্রীতি ক্ষণস্থায়ী, নাশশীল এবং পরিণামে দুঃখ ও তাপ প্রদান করে। পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মনের দ্বারা আপাতরম্য বস্তুর অনুশীলনে স্বাপ্নিক সুখ বা তাৎকালিক ও নৈমিত্তিক আনন্দ লাভ হয়। দেহ ও মন—জড় বস্তু।

এর মধ্যে চেতনবস্তু আত্মা রয়েছে বলে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন চেতনের ন্যায় প্রতীত হয়। আত্মার সঙ্গে বিভু ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। জীবের বাস্তব পরিচয় হল— সে বিভু চেতন স্বরূপ পরমাত্মা বা ভগবানের নিত্য দাস, শক্তি এবং অংশ। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই সম্বন্ধটি নিত্য। ভগবন্নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুকী কৃপা পরবশ হয়ে ভাগ্যবান জীবকে এই প্রকার ভগবদ্-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান প্রদান করেন। জীব তার নিজ স্বরূপ বিভ্রান্ত হওয়ার দরুণ মায়া-স্বষ্ট দেহ, গৃহ, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আত্মবোধ করে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকাদি তাপত্রয় দ্বারা জর্জরিত হচ্ছে। ভগবদ্ বিস্মৃত হয়ে আত্মীয়-স্বজন পরিবারবর্গ, দেশ-দশের সঙ্গে প্রীতির ব্যবহার করেও নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারছে না। ভগবদ্বিমুখ অবস্থায় জন্মমৃত্যু মালায় তাকে গতায়াত করতে হচ্ছে।

ভগবানের করুণামূর্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই প্রকার কৃষ্ণ ভোলা জীবের প্রতি দয়ার্দ্র-চিত্ত হয়ে, তাকে স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান দান করেন। গুরুদেবের সঙ্গ ও সান্নিধ্য এবং উপদেশ লাভ করে ভাগ্যবান জীবের মায়িক দশার উপরম হয়। তখন সে দেহ, মন আদি ভোতিক ভূমিকা হতে আত্মভূমিকায় স্থিত হয়। ভগবান্ একমাত্র প্রভু, জীব তাঁর দাস বা সেবক এবং ভগবানের সেবা করাই জীবের কর্ত্তব্য—এই বোধটা শ্রীগুরুদেব স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের হৃদয়ে জাগিয়ে দেন। স্বরূপের উদ্বোধন হলে পিতামাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজনগণের প্রতি প্রাকৃত ভূমিকা কর্তব্যবোধ শিথিল হয়ে যায়। আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভৌতিক ভূমিকায় কর্ত্তব্য করাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে। বর্ণাশ্রম-ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা সাক্ষাৎ হরিতোষণ হয় না। গুরুদেব আশ্রিত জনকে আত্মার নিত্যশান্তি লাভের জন্য ভাগবদ্ধর্মানুশীলনের উপদেশ করে থাকেন। ভাগবদ্ধর্ম্মানুশীলনের অপর নাম হরিতোষণ। হরিতোষণই গুরুদেবের একমাত্র ব্রত। তিনি নিজে হরিতোষণ সর্ব্বক্ষণ করছেন এবং অপরকেও হরিতোষণ—হরিসেবায় নিযুক্ত রাখেন। এই

প্রকার লক্ষণ গোষ্ঠানন্দী গুরুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বিবিক্তানন্দী গুরু একাকী ভজন করেন; অন্যকে ভজন শিক্ষা দান বা উপদেশ প্রদান করেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগুরুমহারাজ প্রমুখ গৌড়ীয় গুরুবর্গ গোষ্ঠানন্দীর ভজনাদর্শ দেখিয়ে তদাশ্রিত জনের নিত্য বাস্তব কল্যাণ সাধন করেছেন। তাঁরা উত্তম ভাগবত হলেও মধ্যম অধিকারে নেমে এসে ভগবানের সঙ্গে প্রীতির ব্যবহার এবং ভক্তগণের সঙ্গে মৈত্রী, অজ্ঞ জনকে কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করে থাকেন।

গুরুপাদ-পদ্মাশ্রিতজন গুরুদেবকে যে পূজা করেন, প্রকট গুরুদেব সেই পূজা পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গের মাধ্যমে শ্রীহরি দেবের নিকট পৌঁছে দেন। তিনি শিষ্যের পূজার কোন উপায়ন আত্মসাৎ বা নিজের ভোগে নিযুক্ত করেন না। প্রকট আচার্য্যে পূজার দ্বারাই যথার্থ হরিদেবের পূজা বা সন্তোষ বিধান করা হয়।

"জগতে প্রকট ভাই তাহা বিনা গতি নাই,
যদি চাও আপন কুশল।"

কৃষ্ণই জীবের নিত্য মঙ্গল বিধানের জন্য গুরুরূপে জগতে প্রকট হয়েছেন। সুতরাং বর্তমান আচার্য্যের আরাধনা ছাড়া বাস্তব কল্যাণ লাভের অন্য উপায় নেই।

গুরুতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব এক এবং অভিন্ন হলেও গুরুদেব হলেন—ভগবানের সেবক বিগ্রহ। তিনি বেদদৃক্ এবং ভগবদ্দ্রষ্টা। তাঁর সান্নিধ্য এবং কৃপায় অনতি বিলম্বেই জীবের ভূত দর্শন বা মাংস দর্শন বিনষ্ট হয়। মাংসদৃক্জন গুরুপাদপদ্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না; তারা তাঁকে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করে তার চরণে অপরাধ করে থাকে। এই অপরাধের ফলে অধোগতি হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেমন পতিত, পাপী তাপী, দীন, হীন, আচণ্ডালে কৃষ্ণপ্রেমে বিতরণ করেছিলেন। নিত্যানন্দা ভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম তেমনি যোগ্যাযোগ্য, পাত্রাপাত্র নির্বিচারে অহৈতুকী কৃপা করে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সেবা প্রদান করে

সকলকে নিত্য বাস্তব মঙ্গল লাভের পথে চালিত করছেন। তিনি ভগবদ্ তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান করে জীব-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ, অন্যাভিলাষ ও কপটতা বিদূষিত করে সকলকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুরুসেবার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপদেশ করেছেন—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনংস্তত্ত্ব-দর্শিনঃ' ॥

(গীঃ ৪।৩৪)

ভগবত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবের নিকট প্রণিপাত অর্থাৎ দণ্ডবন্নতি সহকারে এবং সহকারে এবং সেবোন্মুখ চিত্তে জীবতত্ত্ব ও পরতত্ত্বাদি বিষয়ে প্রশ্ন করলে কৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুশ্রূষু, অনুগত এবং জিজ্ঞাসুজনকে ভগবদ্-সম্বন্ধ বিজ্ঞান প্রদান করে তার ভগবদ্ ভজনের অন্তারায়-স্বরূপ সর্ব্ব প্রকার সন্দেহ ও সংশয়াদি নিরসন করে দেন। তর্ক, যুক্তি, পাণ্ডিত্য বা যোগ্যতার দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করা যায় না, গুরুসেবার মাধ্যমে অল্পকালের মধ্যে আশ্রিত জনের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে জীবতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বাদি স্ফুরিত হয়। গুরুপাদ-পদ্মের সেবা ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের সর্বপ্রকার চেষ্টা বিফল হয়।

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর বালকগণকে ভগবদ্ ভজনের উপদেশ প্রদান কালে অন্যান্য ভক্ত্যাংগ যাজন অপেক্ষা গুরুসেবারূপ ভক্ত্যাংগ অনুষ্ঠানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলব্ধার্পণেন চ।
সংগেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥

(ভাঃ ৭।৭।৩০)

গুরুশুশ্রূষার দ্বারা জীবের ভগবদ্-ইতর বিষয়াসক্তি সর্ব্বপ্রকারে বিনষ্ট হয় এবং ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধি লাভের স্পৃহাদি অন্যাভিলাষরূপ

সর্ব্বপ্রকার অনর্থের উপশম হয় ও পরমার্থ-স্বরূপ ভগবদ্ সেবা এবং পরিচর্য্যায় রুচি, আসক্তি ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হয়। ভগবত্তোষণ করতে হলে শুদ্ধভক্তি-সাধকের পক্ষে গুরুসেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র কর্ত্তব্য।

গুরুপাদপদ্ম অনুগত জনকে কেবল আশ্রয় দান করেন, তা নয়; আশ্রয় দানের সঙ্গে নাম, মন্ত্র শিক্ষা ও তত্ত্বোপদেশজ্ঞানাদি প্রদান করে শিষ্যকে ভজন রাজ্যে দ্রুত অগ্রসর করিয়ে দেন। তথাকথিত গুরুগণ শিষ্যকে কেবল নাম মন্ত্রাদি দিয়ে থাকেন; কিন্তু নাম কি বস্তু, মন্ত্র কি বস্তু এবং জীব কি তত্ত্ব ও ভগবান্ কি তত্ত্ব—এই সব সম্বন্ধ-জ্ঞান দানের চেষ্টা করেন না। এর ফলে শিষ্যের সংসার বন্ধন, অবিদ্যা ও অনর্থাদির উপশম হয় না। নাম-মন্ত্র-উপলব্ধ মহান্ত গুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সংগ, কৃপা ও উপশম লাভ না করলে নাম ও মন্ত্রাদি সুষ্ঠুভাবে স্ফূরিত হয় না। মহান্ত গুরুপাদপদ্ম শিষ্যকে নাম-মন্ত্রাদি দানের সঙ্গে ভগবদ্ শ্রুতিও দিয়ে দেন। ভগবদ্-সাক্ষাৎকার লাভ করতে হলে গুরু-পাদপদ্মের নিকট শ্রৌত-জ্ঞান লাভ করতে হবে। শ্রৌত দর্শন ছাড়া ভগবদ্ সাক্ষাৎকার বা ভগবদ্ সেবা লাভ সম্ভব হয় না। 'কান দিয়া ভগবান্‌কে দেখ'। গুরুমুখনিঃসৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে দিব্য চক্ষুর দ্বারা যথার্থ ভগবদ্দর্শন হয়।

কর্মীগণ, জ্ঞানীগণ ও যোগীগণ গুরুপূজা করে থাকেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনের ফলস্বরূপ ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি ইত্যাদি লাভ হলে তত্তৎ সাধকগণ তত্তৎ গুরুকে বর্জন করে থাকেন। শুদ্ধ ভক্তগণ নিরন্তর গুরু-আরাধনা করে থাকেন। ভক্তিতে সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমলাভ করলেও তাঁরা সর্বক্ষণ গুর্বানুগত্যই করে থাকেন; কখনও গুরুপাদপদ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন না। প্রেমিক মহান্ত গুরুর অনুগমন শুদ্ধভক্তগণ সর্বকালে সর্ব্বাবস্থায় করেন। শ্রীল জীবপাদ ভক্তিতে সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমলাভের উপায় বলেছেন—'গুরু শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, অনুগতি সিদ্ধি।

গুরুদেবের নিকটই শ্রৌত শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য অবধারণ করা

যায়। তিনি হলেন শাস্ত্রমূর্ত্তি। তিনি যেমন পরব্রহ্ম অনুভবশীল অর্থাৎ অপরোক্ষ-অনুভূতি সম্পন্ন, তেমনি শব্দব্রহ্মেও পারদর্শী। বেদসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সমস্ত সিদ্ধান্ততত্ত্ব তাঁর জিহ্বায় সর্বক্ষণ স্ফুরিত হয়। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ ও কৃপার ফলে ভক্তি সাধকের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ হয়। এই অবস্থার থেকে ক্রমশঃ রুচি ও আসক্তি প্রভৃতি ভক্তির ভূমিকায় দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় এবং গুর্বানুগত্যময়ী ও নৈরন্তর্যময়ী হরিসেবার দ্বারা ভক্তিতে সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমলাভ হয়।

গুরুর স্বরূপ হল—তিনি হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপশক্তিমদ্ বিগ্রহ। তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণকে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা নন্দিত করছেন। কৃষ্ণতোষণ ব্যতীত তাঁর আর অন্য কোন কৃত্য নেই। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সর্বপ্রকার সুখ-বিধানে তিনি সর্বক্ষণ তৎপর থাকেন। রসস্বরূপ কৃষ্ণের যথার্থ উপলব্ধি করিয়ে দেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি সৎশিষ্যকে মধুর বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতিময়ী সেবা ও পরিচর্য্যার অধিকার প্রদান করে থাকেন। তাঁর কৃপাকটাক্ষ ব্যতীত ব্রজেশ-তনয় শ্রীকৃষ্ণের মধুর প্রীতিময়ী সেবা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণ-প্রেমের প্রধান শিক্ষা-দাতা হলেন শ্রীগুরুদেব। গুরুদেবের পূজা—সাধারণ ব্যক্তিবিশেষের পূজা নয়। গুরুদেব ভগবানের কৃপামূর্তি। ভগবান্ কখনো কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে কৃপা করেন না। ভগবানের কৃপা তাঁর নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধ্যমেই সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ শিষ্যের উপর বর্ষিত হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার বিধি আছে। গুরুপূজা কেবল তিথি বিশেষে করণীয় এরূপ নয়। আশ্রিত জনের পক্ষে সর্বাবস্থায় ও সর্বকালে গুরুদেবের পূজা কর্ত্তব্য।

—❖—

করুণালীল শ্রীগৌরহরি

মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর করুণাবতার। গোলকের নিগূঢ় প্রেম, যে বস্তু জগতে ইতঃ পূর্ব্বে কোন অবতার-কর্তৃক প্রদত্ত হয়নি,

শ্রীগৌরহরি কলিহত জীবকে বেদের দুর্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রদানের জন্য এই নদীয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রায় পাঁচশত পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে। তিনি বেদ ও উপনিষদাদির সারবস্তু শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম শিক্ষা জগজ্জীবকে প্রদান করেছেন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব, জগৎ কি তত্ত্ব এবং জীবের সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ রয়েছে—ভগবদ্ বিস্মৃত জীবকে এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় বা সাধন যে শুদ্ধাভক্তি তিনি নিজে আচরণ করে সমগ্র জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভক্তি সাধনের সাধ্যবস্তু বা ফল স্বরূপ যে ভগবদ্ প্রেম— সেই বস্তুটি আপামর জীব কূলকে প্রদান করেছেন।

ভগবানের অনন্ত স্বরূপ রয়েছে। শ্রীগৌরহরি যে স্বরূপের উপাসনার কথা বলেছেন তিনি হলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্-অনন্ত লীলাবান্ এবং রসস্বরূপ। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার উৎকর্ষতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দেখিয়েছেন। মধুর লীলাবান্ শ্রীকৃষ্ণতেই সর্বপ্রকার রস এবং প্রেমের পরাকাষ্ঠার সীমা। সেই প্রেম শিক্ষাদানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং, তাঁর প্রকাশ রূপ বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, ভগবচ্ছক্তি-স্বরূপ শ্রীগদাধর, ভক্ততত্ত্ব শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব এবং গুরুতত্ত্ব এই ছয় রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। মধুর লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত অবতারের অবতারী এবং ইনিই একমাত্র আরাধ্য এইটি শ্রীগৌর-হরির অভিমত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবদ্ অবতারের মধ্যে পরিগণিত হলেও তিনি হলেন স্বয়ং ভগবান্। তাঁর থেকেই অন্যান্য ভগবদ্-স্বরূপের ভগবত্তা প্রকাশিত হয়েছে। মধুর-প্রেম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে যে সাধনের দ্বারা লাভ করা যায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দিগ্‌দর্শন শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করে সমগ্র জীবকে দিয়েছেন—

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়-প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৩)

বেদে ধর্মাদি অনুশীলনের কথা কীর্তিত-হলেও এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি লাভের উপায় বর্ণিত হলেও বেদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার শিক্ষা হল—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বিজ্ঞান উপলব্ধি। প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র সম্বন্ধীভূত বস্তু। সমগ্র চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ তাঁর শক্তির পরিণাম-বিচারে, তাঁর ভেদাভেদ প্রকাশ বিশিষ্ট। পরতত্ত্বের বহু স্বরূপের বহু লীলা আছে। সেই সেই স্বরূপের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন মধুর শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান কেবল সৃষ্টি কর্ত্তা নন বা তিনি জীবকে মুক্তি দেন এটা তাঁর বড় দান নয়। তিনি ভক্তকে নিজ প্রেম দান করেন ও ভক্ত তাঁকে বশ করেন। ভক্তের প্রীতিময়ী সেবায় ভক্তকে প্রেমদান করে তিনি ভক্তের বশীভূত হন, এটা তাঁর মহা মহা অবদান। তিনি প্রেমের বিষয় হয়ে প্রেমের আশ্রয়স্বরূপ ভক্তকে সুখ দিয়ে নিজে সুখী হন। ভক্তগণের সঙ্গে তিনি সর্বক্ষণ প্রেম ব্যবহার করে থাকেন। তিনি বহুপ্রকার ভক্তগণের সঙ্গে প্রেম ব্যবহার করলেও মধুর পরিকর ব্রজবাসীগণের সঙ্গে যে প্রেমলীলা করেন, সেই মধুর প্রেম লীলার চমৎকারিতা সর্বাপেক্ষা অধিক। ব্রজবাসীগণের মধ্যে শ্রীরাধারাণীর প্রেমাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা অধিক বশীভূত হয়েছেন। এই প্রকার শুদ্ধ নির্মল প্রেমই যে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য, যেটি গৌরসুন্দর স্বীয় আচরণ দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এই প্রেম লাভ করতে হলে ধর্ম, জ্ঞান বৈরাগ্যাদি কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নেই। ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবের ধর্মার্থকাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হতে পারে কিন্তু ঐগুলি জীবের নিত্য বাস্তব প্রয়োজন নয়। জীবের চরম বা পরম কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করতে হলে তার সাধন শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করতে হবে। প্রেমের বিষয় হল—ভগবান এবং প্রেমের আশ্রয় হল ভক্ত। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের নিত্য স্থিতি। এই প্রকার বিশুদ্ধ প্রেমের সাধন—শুদ্ধা ভক্তি শিক্ষা প্রদানের জন্য মধুর-কৃষ্ণ কলিযুগে এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই গৌরধাম ব্রজধামেরই অবতার। ব্রজধামে

যেমন মাধুর্য্যের ছড়াছড়ি, প্রেমক্ষেত্র শ্রীগৌরধাম তেমনি ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যকে ক্রোড়ীভুত করে কারুণ্যঘন বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব। কৃষ্ণই উদার শ্রীগৌর-হরি রূপে আবির্ভূত। মধুর কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীগৌরহরির আশ্রয়ে জীব অতি সহজে প্রেমের সাধন করতে পারে। প্রেমের সাধন করতে হলে সাধকের হৃদয়ে জড় বিষয় সুখ এমনকি মুক্তি-সুখ কামনা থাকলে প্রেম লাভ হবে না। প্রেমের বিষয় ভগবান এবং আশ্রয় ভক্তের সঙ্গ ও কৃপার ফলে প্রেম লাভ হয়। ঔদার্য্যে মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দর উদার পরিকরবৃন্দ সহ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয় জীবকুলকে ভক্ত-সঙ্গ শিক্ষা করার উপদেশ করেছেন।

বদ্ধাবস্থায় জীব মায়াস্বষ্ট জড়-বিষয়াদির সঙ্গ করে প্রাকৃত সুখ-দুঃখ লাভ করে। ভগবদ্-বিমুখ জীব মায়িক বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়ে ভৌতিক সত্তায় প্রীতি করছে। এই প্রকার প্রীতির অনুশীলনে সে অবিমিশ্র সুখ বা নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করতে পারে না। পিতা হয়ে পুত্রের সঙ্গ করলে বা স্বামী হয়ে স্ত্রীর সঙ্গ করলে বা মাতা হয়ে কন্যার সঙ্গ করলে তাৎকালিক ও নৈমিত্তিক সুখ লাভ করা যায়, কিন্তু ভগবান্—প্রভু, জীব তাঁর দাস বা সেবক এই ভূমিকায় স্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্য সুখ বা চির-শান্তি লাভের অন্য উপায় নেই। মুমুক্ষুগণ মায়িক জড়ীয় সঙ্গ রাহিত্য করে আত্মার সুখ অর্থাৎ সংসার থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য প্রযত্নশীল হন, কিন্তু মুক্তিই জীবের নিত্য বা চরম প্রয়োজন নয়। প্রেমাবতার—শ্রীগৌরহরি ভোগসুখ, মুক্তিসুখ ও সিদ্ধিসুখকে তুচ্ছিকৃত করে ভগবদ্-প্রেমলাভের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব স্থাপন করেছেন। ভগবদ্-প্রীতিই জীবের একমাত্র চরম পরম প্রয়োজন। করুণার মূর্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর বিষয় লুব্ধ ও অনর্থগ্রস্থ জীবের পক্ষে এই প্রেমলাভের সহজতম উপায় আবিষ্কার করে দিয়েছেন— সেটা হল প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তন। গৌর-ভক্ত সঙ্গে গৌর-প্রদর্শিত নাম সংকীর্ত্তন নিরপরাধে করলে অনতিবিলম্বে জীবের সর্ব শ্রেষ্ঠ সাধ্য কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হবে। শুদ্ধভক্ত সঙ্গে ভগবন্নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ এবং

স্মরণ ও তাঁর পরিচর্য্যার দ্বারা জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ, অবিদ্যা এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশাদি সমূলে বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিহোঁ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৩

ভগবদ্-ভক্তের সঙ্গ ও সান্নিধ্য বিশেষতঃ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সঙ্গ ও কৃপালাভে জীবের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বাসনা এবং অন্যাভিলাষাদি দূরীভুত হয়ে পরমার্থস্বরূপ ভগবানের নাম, গুণ, মহিমা ও লীলার শ্রবণ কীর্ত্তন ও সেবা পরিচর্য্যাদিতে উত্তরোত্তর রুচি বর্দ্ধিত হয়। ত্রিতাপক্লিষ্ট কৃষ্ণভোলা জীবকে অমায়ায় কৃপা করে পরমার্থের পথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীগৌরহরি যেমন ভক্তসঙ্গ শিক্ষার উপদেশ করেছেন, তেমনি তাঁর আবির্ভাব ক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ ধামের সর্ব্বোত্তম কৃপার কথা বলেছেন।

'শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি'। শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাধুর্য্য-ক্রোড়ীভূত উদার প্রেমক্ষেত্র। এই ধামের প্রতিটি অনু পরমাণু জীবকে কারুণ্যঘন শ্রীগৌরহরির স্পর্শ দেয়। এই ধামের ধুলি চিন্ময়। এটি কেবল চিন্ময় নয় বরং চিন্তামণি। এই ধামের চিন্ময় ধূলিতে গড়াগড়ি দিলে জীবের পাপ, তাপ, দুঃখ কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণার উপশম আনুসঙ্গিকভাবে সংঘটিত হয় এবং নিত্যমঙ্গল বা বাস্তব শান্তির পথে অগ্রগতি হয়। নয়টি দ্বীপযুক্ত নবদ্বীপ মণ্ডলের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিক ভক্তের চিত্তে মহাবদান্য শিরোমণি শ্রীগৌরহরির করুণামাধুরী স্মৃতি পথে উদিত হয়। ব্রজধাম যেমন মধুর লীলাক্ষত্র, তদ্রূপ গৌরধাম কৃপাবতার গৌরহরির উদার ক্রীড়াক্ষেত্র। এই ধামের জল, হাওয়া, ধূলিকণা, বৃক্ষ তরু সমস্ত কিছুই শ্রীগৌরের প্রেমে রঞ্জিত। 'বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপ ধামে বাঁধির কুটীর খানি'। কৃষ্ণধাম বা বৃন্দাবন ধাম মুক্তকুলের আশ্রয়নীয়; কিন্তু গৌরধাম—পাপী-তাপী, দীন-হীন,

পতিত দুর্গত সকলেরই আশ্রয়দাতা। ‘যে যত পতিত হয়, তব দয়া লতা তায়’।

গৌর কেবল পতিত জনের বন্ধু। কলিকবলিত কামক্রোধের ক্রীড়ামৃগ-স্বরূপ অধম জীবকুলকে আমায়ায় কৃপা করার জন্যই শ্রীগৌরধামের প্রাকট্য। সিদ্ধবাবা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীল প্রভুপাদ প্রভৃতি গুরুবর্গ এই ধাম আশ্রয় করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। গৌরধাম ও ব্রজধামে কোন ভেদ নাই। গৌরধামে থেকে কৃষ্ণভজন এবং কৃষ্ণধামে থেকে গৌরভজন একই কথা। গৌর ব্রজবনে ভেদ না দেখিব হইব বরজবাসী’।

শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগমনে এই চিন্ময় ধাম পরিক্রমা করলে গৌরসুন্দর সুখী হন। গৌরসুন্দরের পদাঙ্গ পূত নবদ্বীপ মণ্ডল এবং গঙ্গার তটভূমি— তাঁর ঔদার্য্য লীলার স্মৃতি উদ্দীপনা করে। শ্রীধাম পরিক্রমাকালে কায়শাঠ্য বা করে, গৌরবিহিত কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকভক্তের অনুগমনে পদচালনা করলে গৌরের কৃপালাভ করা যায়। ভক্তসঙ্গে গৌর নির্দ্দেশিত সংকীর্ত্তনানুশীলন ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁর কৃপা লাভ হয় না। অন্যাভিলাষ বর্জিত হয়ে হরি সুখানুসন্ধানময়ী ভক্ত্যাঙ্গ অনুশীলনই প্রেমলাভের প্রকৃষ্ট সাধন।

সমস্ত জড়কে ভগবদ্-সম্বন্ধে দর্শন করে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ জেনে এবং তদ্দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ চরিতার্থ না করে, তত্তদ্ বস্তুকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করানই যথার্থ ভক্তের পরিচয়। ভক্ত গুরুদেবের নৈরন্তর্য্যময়ী আনুগত্যে এই প্রকার সেব্য-সেবক দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে জীবের নিত্য বাস্তব প্রয়োজন প্রেম লাভ হয়। নবধাভক্তির মধ্যে শ্রীগৌরহরি বাচকাবতার শ্রীনাম-সংকীর্তনের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। অপরাধ শূন্য হয়ে গৌরপ্রবর্তিত

নাম-কীর্তনের দ্বারাই প্রেমলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। নাম-সংকীর্তন করলেও হৃদয়ের মধ্যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি কামনা পোষণ করলে, ভক্তির ফল প্রেমলাভ থেকে চিরবঞ্চিত হতে হয়। মহাজনগণ বলেছেন—

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্তগুরুর অনুগমনে সংকীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে ভগবদ্-তোষণাভিলাষ ছাড়া ইতর কামনা স্থান পায় না। শুদ্ধ ভক্তের কীর্ত্তনে গৌরহরির যথার্থ আবির্ভাব হয়। তিনি সংকীর্ত্তনের পিতা। শুদ্ধ কীর্ত্তনে তিনি অবতীর্ণ হন। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে তাঁর সর্ব্বপ্রকার শক্তি নিহিত আছে। মূল আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে হরিতোষণ তাৎপর্য্যপর হয়ে কীর্ত্তন করলে গৌরসুন্দর আনন্দিত হন। গৌরসুন্দরের আবির্ভাব অর্থ শুদ্ধ নাম-সংকীর্ত্তনের আবির্ভাব। গৌরবিহিত ভজন প্রণালীতে নাম-কীর্ত্তন না করলে প্রেমলাভের পরিবর্তে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হয় এবং এরূপ কীর্ত্তনকারী গৌরের কৃপালাভে বঞ্চিত হন। ভাগবত-গুরু আশ্রয়ে নিষ্কপটভাবে সেবোন্মুখ চিত্তে হরি কীর্ত্তনের মাধ্যমে গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং আশ্রিতজনকে কৃপাভিসিঞ্চিত করে থাকেন।

—❖—

ভক্তির দ্বারা আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ

কলিযুগের প্রারম্ভে নৈমিষারণ্যে ষাট হাজার ঋষি বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তাঁরা সুদীর্ঘকার যজ্ঞানুষ্ঠান করেও তাঁদের চিত্তের সুপ্রসন্নতা আনতে পারেন নি। একদিন তাঁরা প্রাতঃকালে যথারীতি যজ্ঞে আহুতি প্রদানের সমাপ্তিকালে বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ মুনির পুত্র শ্রীসূত গোস্বামীকে

দর্শন করেন। শ্রীসূত গোস্বামী ছিলেন সর্ব্বশ্রাস্ত্রে পারংগত। তিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় শ্রীল শুকদেবের মুখ-নিঃসৃত ভাগবত বাণী শ্রবণ করেছিলেন। শ্রীল সূতগোস্বামী ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মলাভ করলেও ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন হওয়ায় ঋষিগণ তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে জিজ্ঞাসা করলেন জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ কি ? কোন্ ধর্মের অনুষ্ঠানে আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয় ? * * * প্রভৃতি ছয়টি প্রশ্ন।

ঋষিগণের প্রশ্নের বহুমানন করে শ্রীল সূতগোস্বামিপাদ তদ্ উত্তরে বললেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে্।
অহৈতুক্যাপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ভাঃ ১।২।৭

জীব স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী বহুবিধ ধর্মানুষ্ঠান করলেও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল—ভাগবদ্ধর্ম অর্থাৎ সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবানে ভক্তি। পরধর্ম্মরূপ ভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারাই আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়। কলিযুগে ক্ষীণায়ু, মন্দভাগ্য, রোগের দ্বারা উপদ্রুত এবং নানাপ্রকার অনর্থগ্রস্ত জীব, ভগবানে ভক্তি করে অর্থাৎ ভগবানের নাম, কথা, লীলা ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তণ স্মরণাদি অনুশীলনের দ্বারা নিত্য মঙ্গল ও পরাশান্তি লাভ করতে পারে। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি ব্যতীত যাগ, যজ্ঞ, তপ, ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে আত্মার সুপ্রসন্নতা অর্জন করা যায় না। শাস্ত্রকারগণ এই ভক্তিকে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা বলেছেন। কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধন এই প্রকার শুদ্ধভক্তিকে প্রতিহত বা বাধা প্রদান করতে পারে না। গঙ্গানদীর স্রোতের যেমন স্বাভাবিক ভাবে সমুদ্রের দিকে গতি হয়, তদ্রূপ ভক্তি মন্দাকিনী প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ ও কৃপায় ভক্তিতর সুখ অর্থাৎ ভুক্তি—ভোগসুখ, মুক্তিসুখ বা আত্মসুখ এবং সিদ্ধিসুখকে তুচ্ছীকৃত করে শুদ্ধভক্তি সাধকের হৃদয়ে প্রেমলাভের

উদ্দেশ্যে অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয়। এই ভক্তির নাম কেবলা বা নির্গুণা বা সাক্ষাদ্‌ভক্তি। মায়া রচিত সত্ত্ব-রজ-তমাদি ত্রিগুণজাত কোন ধর্মাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা এই ভক্তি লাভ করা যায় না। ভক্তির কোন জন্য-জনকত্ব নেই। ভক্তিই ভক্তিলাভের হেতু। ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্ত, অধোক্ষজতত্ত্ব ও নিত্য বস্তু। কিন্তু কি প্রকারে ভক্তি লাভ করা যায়? বিষয় বিগ্রহ শ্রীভগবান্ এবং আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এই ভক্তি লাভ হয়। কর্মাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা জড়বিষয় ভোগ অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণ করা যায়, এর থেকে অধিক স্বর্গসুখ এমনকি ব্রহ্মার পদবীও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এইগুলি নৈমিত্তিক সুখ। প্রলয়ে ব্রহ্মলোকেরও বিনাশ হয়। 'কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্' নৈমিত্তিক কর্মাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অমিশ্র সুখ বা নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করা যায় না। কর্মাদির ফল নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর জেনে কর্মানুশীলন পরিত্যাগ ক'রে জ্ঞানীগণ বৈরাগ্যাদির অনুশীলন করে জড় বিষয়-ভোগ-সুখ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আত্ম ভূমিকায় স্থিত হওয়ার জন্য যত্নশীল হন। এই ভূমিকায় জীব বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং আত্মার আনন্দ লাভ করলেও আত্মার নিত্যসুখ বা বাস্তব শান্তি লাভ করতে পারে না। অনুসচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা যে পর্য্যন্ত বিভু সচ্চিদ্দানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা বা ভগবানের সঙ্গে প্রীতির ব্যবহার না করতে পারে অর্থাৎ ভগবান্ সেব্য এবং আরাধ্য ও জীব তাঁর সেবক এই ভূমিকায় স্থিত হয়ে ভগবানের সেবা, পরিচর্য্যা, পূজাদি ভক্ত্যানুশীলন না করা পর্যন্ত জীবের বাস্তব ও নিত্য শান্তিলাভের অন্য উপায় নেই।

আত্মার সুপ্রসন্নতা আনতে হলে কর্ম, জ্ঞান যোগাদির অনুষ্ঠান না করে নিত্যকাল এক মন দিয়ে ভগবানের গুণ, লীলা, মহিমার শ্রবণ-কীর্তন স্মরণ এবং তাঁর পরিচর্য্যা বা সেবা করতে হবে। সর্বেন্দ্রিয়ে ভগবদ্-অনুশীলনের নাম ভাগবদ্ধর্ম বা ভক্তি ধর্ম। ভক্তির দুইটি অবস্থা আছে—একটি সাধনভক্তি অপরটি প্রেমভক্তি। প্রেমলাভের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা, পূজা ও তাঁর গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি

অনুষ্ঠানের নাম সাধনভক্তি। সাধনের পরিপক্কাবস্থাকে প্রেমভক্তি বলে। ভক্তির সাধনকালে, ভক্ত সাধকের ভগবদ্-ইতর বস্তু জড়-বিষয় ভোগাদিতে স্বাভাবিক বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা আসে।

শাস্ত্রাদিতে স্বভাব এবং গুণ-কর্মানুসারে বর্ণাশ্রম পালনের বিধান আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি বর্ণে অবস্থিত হয়ে স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমোচিত ধর্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যদি নিত্য এবং বাস্তব মঙ্গলদায়ক ভগবানের নাম, লীলা-কথা শ্রবণ কীর্তনাদিতে রুচি উৎপাদিত না হয় তবে তবে উক্তপ্রকার বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মপালনের ব্যর্থত্ব—প্রমাণশাস্ত্র চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্তিত হয়েছে। 'ধর্ম-মূলং হি ভগবান্'—ধর্মাদি অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল হরি সন্তোষ। হরি সন্তোষের দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মাদির অনুষ্ঠান করলে হরিকথায় রুচি উৎপন্ন হয়। ভগবানের কথায় রুচি লাভই সর্ব্বপ্রকার ধর্মাদি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য। বর্ণাশ্রমাদি ধর্মানুষ্ঠানের ফল বা উদ্দেশ্য অর্থ লাভ নয়। ধর্মানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল তত্ত্ববস্তুর প্রতি জিজ্ঞাসার উদয় করান। তত্ত্ববস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্। ত্রিবিধ তত্ত্বের মধ্যে যে কোন একটির প্রতি সাম্মুখ্য লাভ করলে জীব, সংসারের কর্মবন্ধন থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। নির্বিশেষ প্রকাশ ব্রহ্মকে জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করা যায় এবং যোগানুশীলনের দ্বারা আংশিক সবিশেষ-প্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই অবস্থায় জীব সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-কষ্টের থেকে নিবৃত্তি লাভ করলেও মুক্তিই জীবের পরম এবং চরম প্রয়োজন নয়। জীবের আত্যন্তিক প্রয়োজন হল ভগবদ্ প্রেম বা ভগবানে প্রীতি। হরিতোষণ বা হরির সুখানুসন্ধানময়ী ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পরুষার্থ স্বরূপ ভগবদ্-প্রেম লাভ হয়। ভক্তির সাধন অতীব সহজ এবং আয়াসশূন্য। কিন্তু জ্ঞান যোগাদি সাধন অত্যন্ত শ্রমবহুল। জ্ঞান যোগাদি সাধন দ্বারা মুক্তি, সিদ্ধি, প্রভৃতি যে ফল লাভ

করা যায়, ভক্তগণ ভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারা অনায়াসে উক্ত ফল লাভ করে থাকেন।

ভক্তির সাধন—ভগবানের নাম, গুণ, লীলা মহিমার শ্রবণ-কীর্তন স্মরণাদি। ভগবদ্দ্রষ্টা মহাজনগণ নিত্যকাল এক মন দিয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুশীলনের বিধি দিয়েছেন। নিরন্তর ভগবানের পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকার দরুন ভক্ত-সাধকের চিত্তে ধর্ম্ম, অর্থ কামাদি অভিলাষ স্থান পায় না; হরি-ভজনের অন্তরায় স্বরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ দেহাত্মবোধ এবং অহং-মম অভিমান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। ভগবানই একমাত্র সেব্য এবং জীব তাঁর সেবক—এই প্রকার উদিত বিবেকরূপ খড়গদ্বারা জীবের স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিসকল সমূলে ছেদিত হয়। যারা নিতান্ত মন্দভাগ্য ও অনর্থগ্রস্থ তাদের স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের কথায় রুচি আসে না। তাদের হরি কথায় রুচি উদয় করানোর জন্য তত্ত্বদর্শী মহাজনগণ হরি কথায় রতিপ্রাপ্ত-ভক্ত গুরুপাদ-পদ্মের পরিচর্য্যা বা সেবা করার বিধি দিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নৈরন্তর্যময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের কথায় রুচি আসে। গুর্ব্বানুগত্যের সঙ্গে নৈরন্তর্যময়ী ভগবানের নাম, গুণ-লীলার শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি দ্বারা স্বসুখ বাসনা, সর্ব্ব-প্রকার অনর্থ এমনকি লাভ—পূজা প্রতিষ্ঠা কামনাদি বিদূরিত হয়ে হৃদয় সম্পূর্ণরূপে শোধিত ও পরিমার্জিত হয়। এই প্রকার ভক্ত ভগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা এবং ভগবন্নাম লীলা সমন্বিত গ্রন্থ-ভাগবতের শ্রবণ-কীর্তনানুষ্ঠান দ্বারা নিবৃত্ত্যনর্থ ভূমিকায় ভগবানে অচলাভক্তি বা নৈষ্ঠিকী রতির উদয় হয়। তখন চিত্তের মধ্যে কাম ক্রোধাদি তরঙ্গের উদয় না হওয়ায় রজোস্তমো গুণ জাত লয় বিক্ষেপাদি রহিত হয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় ভক্ত সাধকের নির্মল ও শুদ্ধসত্ত্ব অন্তঃকরণে হরি সেবাময়ী বৃত্তি উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হয়। সজাতীয়াশয় বিশিষ্ট ভক্তসঙ্গে সর্বক্ষণ ভগবদ্-অনুশীলনে ভক্ত সাধকের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-প্রধান সম্বিদ্-বৃত্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব

বিজ্ঞান লাভ হয়। অনর্থমুক্তাবস্থায় অবিশ্রান্তভাবে নিষ্ঠা ও আসক্তির সঙ্গে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবদ্ অনুশীলনের ফলে ভগবদ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইটি সাধন ভক্তির পরাকাষ্ঠা ভূমিকা। এই ভূমিকায় উন্নীত হলে চিত্তের মধ্যে ভগবৎ সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয় ও সন্দেহাদির লেশমাত্র থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হয়। প্রেমের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যথার্থ ভগবদ্দর্শন বা ভগবানের মাধুর্য্য অনুভব হয় না এবং আত্মার পরাশান্তি লাভ হয় না। সুপ্রসন্নতা লাভ করতে হলে বা নিত্য বাস্তব শান্তি পেতে হলে কপটতা শূন্য হয়ে শুদ্ধভক্তি বা অকিঞ্চনা ভক্তির সাধন ভগবদ্-সুখানুসন্ধানময়ী বৃত্তি নিয়ে নিত্যকাল একমন দিয়ে করনীয়।

—❖—

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও সঙ্গ প্রভাবে প্রেমপ্রাপ্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রিতজনকে সর্বক্ষণ বিষয় বিগ্রহ শ্রীভগবানের সঙ্গ সুখ প্রদান করার জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে এই প্রপঞ্চে অবতরণ লীলা করেন। গুরুধারা আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে। সৃষ্টির প্রবাহ যেরূপ নিত্যকাল চলছে সেরূপ ভক্ত ভগবানের অবতরণ-লীলাও সর্বকাল চলছে। ভগবানই গুরুরূপে জীবকে অমায়ায় কৃপা করার জন্য এই ভৌম প্রবঞ্চে অবতরণ লীলা করেন। গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ও কৃপার ফলে তটস্থা শক্তির পরিণাম জীব চিদ্বস্তু অর্থাৎ ভগবানের অনুশীলন ছাড়া জীবের নিত্য মঙ্গল বা বাস্তব শান্তিলাভের অন্য উপায় নেই।

প্রপঞ্চে সাধারণতঃ ভুত দর্শন বা পঞ্চভৌতিক বস্তুর অনুশীলন ছাড়া চিদ্বস্তুর অনুশীলন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু চিদ্বস্তুর আশ্রয়েই ঐ পাঞ্চভৌতিক দেহ এবং জড়সত্বা প্রকাশিত হয়েছে। এটি অস্বীকার

করা যায় না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্যষ্টি পাঞ্চ-ভৌতিক শরীরের অন্তর্যামিরূপে যিনি বর্ত্তমান তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি চিন্ময়। তাঁর অংশ হল জীব বা আত্মা। ভূতদ্রষ্টা বা মাংসদৃকজন চিদ্বস্তু পরমাত্মা বা ভগবানের দর্শন বা অনুশীলন করতে সমর্থ হয় না। মাংসদ্রষ্টা জীব অনাদিকাল থেকে আত্মা বা আত্মার অংশী পরমাত্মা এবং ভগবান্‌কে বিস্মরণ-হেতু দেহেতে আত্মবোধ রূপ অনর্থ বা অবিদ্যাগ্রস্ত হয়। বেদদৃক জন শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই সব কৃষ্ণ ভোলা জীবকে আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে অবিদ্যা থেকে মুক্ত করে তাদিগকে নিত্য মঙ্গলের পথে পরিচালিত করেন। শ্রীগুরুদেব জীবের নিত্য প্রিয় এবং প্রীতির আস্পদ, ভগবানের সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করে অর্থাৎ ভগবান্ জগতের নাথ ও জীব তাঁর সেবক এই প্রকার নিত্য পরিচয়ে পরিচিত করে দেন। সম্বন্ধজ্ঞানে স্থিত হয়ে জীব চিদ্‌বস্তুর অনুশীলন করতে সমর্থ হয়। গৌড়ীয় গুরুবর্গের শ্রেষ্ঠ অবদান হল জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান প্রদান করে তাদিগকে কৃষ্ণ-কাষ্ণ সেবায় উদ্বুদ্ধ করা।

কৃষ্ণ-কাষ্ণ্ অর্থাৎ ভক্ত-ভগবান্ হলেন চিদ্বস্তু এবং ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে স্বভাব রয়েছে তার নাম ভক্তি বা প্রেম। প্রেমের আশ্রয় ভক্তগণ, প্রেমের বিষয় ভগবানে নিরন্তর ভক্তি বা প্রীতি করে থাকেন। ভগবানও ঐকান্তিক ভক্তের প্রীতি বা প্রেম সর্বক্ষণ আস্বাদন করে থাকেন। প্রেম হল স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী বৃত্তির পরিণাম। প্রেমই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে অবস্থিত হয়ে উভয়কে ভাবিত ও রসিত করছে। প্রেমহীন জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা তত্ত্বরূপে পরিগণিত হলেও ভগবত্তত্ত্বে প্রেম পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানীগণ এবং পরমাত্মোপাসক যোগীগণ স্বরূপানন্দী তাঁরা স্বরূপশক্তির বিলাস বা বৈচিত্রী আস্বাদন করতে পারেন না। জ্ঞানীগণ ব্রহ্মসাযুজ্য এবং যোগীগণ পরমাত্ম-সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করে মায়িক বস্তুর সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হতে

পারেন। ভক্ত-যোগীগণ ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি বিশিষ্ট হওয়ায় তাঁরা মূল-আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বক্ষণ আনুগত্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্-অনুশীলন করে থাকেন। গুরুদেবের সাক্ষাৎ নিয়মনে পরিচালিত হলে ভগবদ্-সুখানুসন্ধান বৃত্তি হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তার মুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণীর শ্রবণ-কীর্তন পরিচর্য্যার দ্বারা ভগবানে ভক্তি বা প্রীতি লাভ হয়। ভক্তি বা প্রেম—বৈকুণ্ঠ ও গোলকীয় ভূমিকায় নিত্য বিরাজমান। প্রেমই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বা সাধ্যসার। গুরুদেবের কৃপা এবং আশ্রয় ব্যতিরেকে জীব ভগবদ্-ভক্তি বা ভগবদ্-প্রেম লাভ করতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম। ১৯।১৫১

ভগবদ্-বিমুখ জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী ৮৪ লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করছে। এই প্রকার কর্ম্মচক্রে পরিভ্রমণশীল জীব যদি মহাভাগবতোত্তম শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্য বা কৃপাকটাক্ষ লাভ করে তখনই তার কর্মবন্ধনের ছুটি হয় এবং সে জড় বিষয় ভোগে অরুচি বিশিষ্ট হয়। হৃদয় থেকে যার বিষয়-ভোগ পিপাসা দূরীভূত হয়নি, বুঝতে হবে তার যথার্থ গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় হয়নি। গুরুদেবের কৃপার একবিন্দু যাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে, তিনি ভক্তি পথের সর্ব্বপ্রকার অন্তরায় বা বাধা অতিক্রম করে ভগবদ্ সেবা এবং ভক্ত সেবার উত্তরোত্তর রুচি বিশিষ্ট হন। কপটতা বা স্বসুখবাসনা জীবকে ভক্তি পথ থেকে বিচ্যুত করে। অন্যাভিলাষ-শূন্য নিষ্কপট ভক্ত গুরুপাদ-পদ্ম আশ্রয়ের বলে নিরন্তর কৃষ্ণ-কাষ্ণ সেবায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ রাখেন। শ্রদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির অনুশীলনে প্রেমলাভ সুনিশ্চিত। নির্গুণা প্রীতিতে বা প্রেমে ভগবান ভক্তের বশীভূত হন। 'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা'। নির্গুণ প্রীতির অত্যুজ্জ্বল

বৈশিষ্ট্য শ্রীরূপগোস্বামী ও তদনুগ গৌড়ীয় গুরুবর্গ বিশেষভাবে দেখিয়েছেন।

এই প্রকার নির্গুণা ভক্তির সাধন করতে হলে নিরন্তর শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গ করতে হবে। প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ ও কৃপালাভ ছাড়া প্রেমলাভ দূরের কথা, ভগবদ্-সাম্মুখ্যের উদয় হয় না।

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি রহু দূরে সংসার নহে ক্ষয়॥

চৈঃ চ মঃ ২২।৫১

প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় পরিকর ও ভক্তগণসহ এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে শুদ্ধ-ভক্তির কথা আচরণমুখে প্রচার করেছেন। তাঁরা অন্তর্দ্ধান-লীলা করলেও দুইটি বস্তু জগতে রেখে গিয়েছেন। একটি হল ভাগবত গুরু, অন্যটি ভাগবত শাস্ত্র।

গৌড়ীয় গুরুবর্গ ভাগবত শাস্ত্রানুশীলনের বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাগবত-গুরুর নিকট সেবোন্মুখ-চিত্তে শাস্ত্র শ্রবণের ফলে শিষ্যের সংসারাশক্তি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মমত্ববোধ এবং কর্ত্তব্য প্রভৃতি শিথিল হয়ে যায়। ভাগবত শ্রবণে কোন পার্থিব যোগ্যতা, অধিকার, পাণ্ডিত্য বা মেধার প্রয়োজন হয় না। প্রাণিপাত এবং পরিপ্রশ্নমুখে শুশ্রূষু হয়ে মহান গুরুপাদপদ্মের নিকট ভাগবত শ্রবণের ফলে শুশ্রূষু ব্যক্তি অল্পকালের মধ্যে শুদ্ধ-ভক্তি পথে শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা রুচি-আসক্তির ভূমিকায় উন্নীত হন। ভাগবত-মার্গ অবলম্বনে অতি সহজে স্বাভাবিকভাবে প্রেমলাভ হয়। এ ছাড়া অর্চ্চন বা মন্ত্রোপাসনা মার্গ রয়েছে। অর্চ্চন-মার্গ নানা প্রকার অপেক্ষা যুক্ত এবং ফললাভে সময় সাপেক্ষ। অর্চ্চন-মার্গে মন্ত্রাদি দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি উপাসনার বিধি—নারদ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কথিত আছে। তথাকথিত কুলগুরুর নিকট অনেকে

নাম মন্ত্রাদি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নাম কি তত্ত্ব এবং বিগ্রহ কি তত্ত্ব এই উপলব্ধির অভাব হেতু দীর্ঘকাল শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন করেও মন্ত্রোপাসক বা অর্চনকারীর সংসারশক্তি ছিন্ন হয় না। যার ফলে তাঁদের শুদ্ধভক্তি পথে অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা বাসনাদি দ্বারা ভক্তি-পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে। শ্রীমূর্ত্তি বা বিগ্রহের স্বরূপ বা তত্ত্ব উপলব্ধি ব্যতিরেকে অর্চ্চনাদি ভক্ত্যংগ যাজন করেও অনেক সময় 'শালগ্রাম দিয়ে বাদাম-ভাংগার ন্যায়' স্বার্থ-সিদ্ধি কার্যে পর্যবসিত হয়। নাম এবং মন্ত্র যাঁদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছে, এরূপ যথার্থ ভাগবত-গুরুর আশ্রয়ে অন্যাভিলাষ রহিত হয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং পরিচর্য্যাকারীর হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন', এই প্রকার অনুভূতি আসে, কৃত্রিমভাবে অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন হয় না।

প্রেমিক এবং ভাগবত-রসিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যে থেকে কৃষ্ণৈকসুখ তাৎপর্যপর হয়ে, পরিচর্য্যা এবং পরিপ্রশ্ন সহকারে ভাগবত শ্রবণের ফলে ভক্তি-সাধকের হৃদয় সুনির্মল হয় এবং ভগবদ্দাস্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এই ভূমিকায় মুক্তকুলের উপাস্য ভগবন্নাম সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

গৌড়ীয় গুরুবর্গের কি প্রকার অত্যুজ্জ্বল করুণার বৈশিষ্ট্য যে, তাঁরা আমাদিগকে নিরন্তর ভাগবত-শিক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত করে শুদ্ধ ভক্তিপথে পরিচালন পূর্ব্বক লালন পালন করছেন। তাঁদের অমন্দোময় দয়ার কিছু মাত্র লাভ করলেও ভাগ্যবান জীব ভগবদ্ পরিচর্য্যা এবং প্রসংগরূপ্ প্রেমামৃত সমুদ্রে সর্বক্ষণ সন্তরণ নিমজ্জন এবং অবগাহন করতে সমর্থ হন। তাঁদের অফুরন্ত কৃপা-সংগ রূপ অকৃত্রিম স্নেহ বাৎসল্যের কোন তুলনাই হয় না।

—❖—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ও হরিভজন

পরমারাধ্যাতম শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করে "শ্রীশ্রীহরিভজন"—সম্পর্কে কিছু কথা শ্রবণ করছি।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।২৯)

মনুষ্য–জন্ম সুদুর্লভ

আমাদের এই মনুষ্য-জন্মের আগে বহু জন্ম হয়ে গেছে। এই জন্মটাই যে প্রথম উদ্ভব হলো এমন নয়, এর আগে আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তা নয়। এই মনুষ্য-জন্মের পূর্বে অনেকবারই অনেক রকম দেহ ধরে আমাদের উদ্ভব হয়েছে; আবার মৃত্যুও হয়েছে। "বহুসম্ভবান্তে"—অনেক জন্মের পরে আমরা এই সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছি; এটা সত্য কিন্তু সব জন্মেতেই আমরা মানুষ ছিলাম, মৃত্যুর পরে আবার মনুষ্য–জন্মই লাভ করবো—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব কর্ম করেছি, সেইগুলি বর্তমান জন্মকে নির্ধারিত বা determine (ডিটারমিন) করেছে। আবার এ জন্মের কর্ম ভবিষ্যৎ জন্মকে determine (ডিটারমিন) করবে। বর্তমানে কে কি করছেন, না করছেন তার উপর নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ জীবন। কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, কখনও পশু, কখনও পক্ষী, কখনও বা মানুষ—এমনি ক'রে জন্ম–মরণ-মালায় জীব ঘুরপাক খাচ্ছে। এর পূর্বেও হয়ত মনুষ্য-জন্ম হয়েছে, এবারও মানব-জন্ম পেয়েছি। যে কারণেই হোক মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ হলেও বর্তমানে এটা সুলভ হয়েছে।

মনুষ্য-জন্মের অসদ্ব্যবহারের ফলে জীবের অধোগতি সুনিশ্চিত

কিন্তু এ জন্মের অন্তে যখন দেহত্যাগ হবে, তারপরেও যে মানুষ হবো, এ কথা ঠিক করে বলা যায় না। Evolution (ইভলিউশান–ক্রমবিকাশবাদ) বলে একটা কথা আছে। তৃণ-গুল্ম-লতা-কীট-পতঙ্গ–পশু-পক্ষী-বানর-তারপর মানুষ। কিন্তু evolution (ইভলিউশান) যদি সত্য হয়, তবে devolution (ডিভলিউশান—অবগমনবাদও) সত্য হবে। এটা যুক্তিসঙ্গত কথা। যার promotion (প্রমোশন) হয়, তার demotion ও (ডিমোশান) হতে পারে। জন্ম যদি সত্য হয়, মৃত্যুও তেমনি সত্য। উন্নতি যেমন হয়, অবনতিও তেমনি হতে পারে। Promotion (প্রমোশান) যেমন নির্ভর করে merit (মেরিট-মেধা)-এর উপর, demotion ও (ডিমোশান) তেমনি নির্ভর করে demerit (ডিমেরিট)-এর উপর। পুণ্যকর্ম বা সৎকর্মের ফলে ক্রমবিকাশের ধারায় আজ হয়ত মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছি। কিন্তু এটা যদি keep up (কিপ আপ—ধরে রাখা) করতে না পারি, তাহলে নামতে হবেই হবে। Inevitable effect (ইনেভিটেবল এফেক্ট)-কে arrest (এরেষ্ট) করবে কে? মনুষ্য-জন্মের যদি সদ্ব্যবহার না করি, তবে ইতর জন্ম অবশ্যম্ভাবী। উহার অবনতির বিশেষ সম্ভাবনা। একে ঠেকাবে কে! উদাহরণ—দ্বারা বোঝা যাক—judge (জাজ)-এর উপর সুবিচারের ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁর এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না ক'রে যদি তিনি কেবলই অবিচার করতে থাকেন, তাহলে তাঁর নিশ্চয়ই demotion (ডিমোশান) বা degradation (ডিগ্রেডেশান) হবে।

মনুষ্য-জন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনে পরমার্থ লাভ সম্ভব এবং ভগবানই অর্থ, আর সব অনর্থ

বহু জন্মের পর মানুষ হয়েছি, এটা যেভাবেই হোক সুলভ হয়েছে। কিন্তু এর যদি সদ্ব্যবহার না করি, তাহলে অধঃপাতের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। মনুষ্য-জন্ম নিত্য নয়, অনিত্য। মানুষ বরাবরই মানুষ থাকে

না, সব সময়েই পুরুষ-দেহধারী বা স্ত্রী-দেহধারী মানুষ হবে কিংবা এই পৃথিবীতে বা এই ভারত-ভূমিতে জন্মাবে—এসব কোন কিছু ঠিক নেই। মনুষ্য-জন্ম চিরকালই পাবো—এটা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এ দেহ চি-রকালই থাকবে—এও ঠিক নয়। যে কোন মুহূর্তে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই উভয় বিচারেই মনুষ্য-জন্মটা অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু মনুষ্য-জন্মটা অনিত্য হলেও এর একটা privilege (প্রিভিলেজ) বা বিশেষ সুযোগ আছে। এই ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য-জীবন পরমার্থ দান করতে পারে। তাই মানব-জন্ম অর্থদ। মানুষ হয়ে চরম–অর্থ বা পরতম ধন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারে। গাছ হয়ে, পোকা হয়ে, কুকুর হয়ে এই পরতম ধন লাভ করতে পারে না। কেউ বলতে পারেন, পশুর ভিতরে বজ্রাঙ্গজী ও জাম্বুমান, পাখীর মধ্যে গরুড় প্রভৃতি পরতম ধন লাভ করেছেন।—এগুলি exception—(একসেপশান) সাধারণ নিয়মের বাইরে এঁরা। সাধারণ কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী-রাক্ষস-দৈত্য—এরা ভগবৎ আরাধনা, কিংবা ভগবানের conception (কনসেপশান) বা ধারনা করতেই পারে না। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করলে ভগবৎ-উপাসনা করতে পারে। এদের জীবনে পরতম ধন পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ বলতে টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, যৌবন, ইন্দ্রিয়-তর্পণ, প্রতিষ্ঠা এগুলি নয়; এগুলি খুব ছোট ও বাজে জিনিষ, এগুলি অনর্থ; যদিও অনর্থকে আমরা অর্থ বলি। পরমধন না থাকলে এগুলিতে ধনবোধ হয়। এগুলি ভাব নয়; অভাব। যথার্থ সম্পত্তি হলো ভগবান। তাঁকেই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। ভগবান ছাড়া সবই অনর্থ, তিনিই একমাত্র অর্থ।

মানব জন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য শ্রীভগবৎ-সেবা

ভগবৎ-প্রাপ্তি মনুষ্য-জন্মেই সম্ভব। এইজন্য দেবজন্মের চেয়েও মনুষ্য-জন্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিচারে মনুষ্য-জন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। দেবতাগণের মধ্যে অধিকাংশই সুখ ও সম্ভোগে ডুবে থাকেন। দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ ভক্ত আছেন,—একথা সত্য।

কিন্তু অধিকাংশই হরিভজন করেন না; তাঁকে ভুলেই আছেন। মানুষ-জন্মের একটি বিশেষ সুযোগ আছে। তা হলো এই দেহেই হরিভজন, হরিতোষণ বা হরিকে লাভ করবার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বজায় রয়েছে। চোখ, কান, নাক, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এগুলি মনুষ্য পেয়েছে। সংকল্প বিকল্পাত্মক মন, ভাল-মন্দ বিচার করবার বুদ্ধি, ধৃতি বা স্মৃতিশক্তি অন্য জীবের নেই। ধ্যান বা উপাসনা-শক্তি মানুষকে বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। মানুষের মন যে শুধু animality-তে (এনিম্যালিটি—পশুত্বে) ভরা, তা নয়; rationality, (রেশনালিটি-বিচারবোধ) continuity of thought, (কন্টিনিউটি অফ থট – চিন্তাধারা), memory (মেমারী – স্মৃতিশক্তি) প্রভৃতি তার আছে। কিন্তু কুকুরের মধ্যে অর্থাৎ কোন পশু-পাখীর মধ্যে এই বুদ্ধি নেই। তাই মনুষ্যদেহ ভগবৎ সম্পর্কীয় ব্যাপার আনতে পারে। অন্যান্য জীবন তা পারে না। যেগুলির দ্বারা ভগবানের অনুভূতি, conception (কনসেপশান বা ধারণা) আনতে পারে, তার সবগুলিই মানুষের আছে। ভগবানের সেবা, তাঁর রূপ-দর্শন, তাঁর কথা-শ্রবন, তাঁর কথা-কীর্তন, তাঁর অর্চন–বন্দন – সবই মানুষ করতে পারে। মনুষ্য জন্মটা যদিও অনিত্য, তবু একটি সুবিধা এই যে, অল্পকালের মধ্যেও ভগবানকে ধ্যান, ধারণা, উপাসনা বা সেবা ক'রে যেতে পারে। অল্পকাল বাঁচলেও এই জীবনে ভগবানকে পেয়ে যেতে পারে। ইহা utopian (অটোপিয়ন), theoretical (থিয়োরিটিক্যাল) বা বাজে কথা নয়, এটি practical (প্র্যাকটিক্যাল – বাস্তব)। বহু ভাগ্যবান মনুষ্য ভগবানকে পেয়েছেন। বহু মানব সাধনসিদ্ধ হয়েছেন, নিত্যসিদ্ধদের কথা বলছি না। ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য-জীবনে ভগবৎ আরাধনা ক'রে প্রয়োজন লাভ অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়েছে। এর বহু দৃষ্টান্ত পুরাণে, কলিকালে ঘটেছে, এমন কি বর্তমান সময়েও ঘটছে।

মনুষ্য-জন্ম অর্থদ এবং ভব-সমুদ্রের পরপারে যেতে হলে গুরুরূপী কর্ণধারই একমাত্র সম্বল

আর একজন যেটা পেয়েছে, তুমিও সেটা পাবে; যদি তোমার ইচ্ছা

থাকে। মানব-জীবন ধারণ ক'রে ভক্তির দ্বারা অন্যের পক্ষে ভগবানকে লাভ করা যদি সম্ভব হয়ে থাকে; তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না কেন? তাই মনুষ্য-জন্মকে বলা হয়েছে 'অর্থদ'। জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভগবৎ-প্রাপ্তি, ভগবৎ-দাস্য ও ভগবৎ-সেবা। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২০.১০৮)—"জীবের 'স্বরূপ' হয় – কৃষ্ণের নিত্য দাস।"—এই স্বরূপ-প্রাপ্তি মানুষের হতে পারে, যদি সে চায়; যদি সে ইচ্ছা করে আমি যদি অল্পায়ুও হই, তাতেও আমি তাঁকে পেয়ে যেতে পারি; অন্ততঃ পাওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পার! মনুষ্য-জন্মের আরও একটা সুবিধা আছে—ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ বা সাধনসিদ্ধ ভগবৎ-সেবকগণ এই মনুষ্যলোকে অর্থাৎ এই ভৌম-প্রপঞ্চে আমাদেরই মত দেহ ধারণ করে আমাদেরই আশে-পাশে বিচরণ করছেন। এই পৃথিবীতে তাঁর নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ – পশু-কীট-গন্ধর্ব-দেহে নয়, মনুষ্য-দেহ ধারণ ক'রে—এখনও বাস করছেন। তাঁদের সঙ্গলাভের সুযোগ বরণ ক'রে কেউ তার মানব-জীবন সার্থক করতে পারে। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, মনুষ্যের উপর এই partiality (পার্শিয়ালিটি – পক্ষপাতিত্ব) কেন? আমাদের উপর এত favouritism (ফেভারিটিজম – পক্ষপাত) কেন ? বিড়াল, কুকুর কেন পাবে না? এ তর্ক উঠিয়ে কোন লাভ নেই। মানুষ যে পায় বা পাবে, —এইটা জেনে আমার পক্ষে সুবিধার কথাই হয়েছে। তাঁর ভক্তগনের বাণী-শ্রবণ, পরিচর্যা-করণ এবং তাঁদের উপদেশানুসারে চলবার সুবিধা মানুষেরই আছে। মনুষ্য-দেহধারী মহাজন আমাদের সামনেই রয়েছেন। অহৈতুকী কৃপা তিনি ছড়িয়ে চলেছেন। মনুষ্য-দেহধারী ভগবৎ পার্ষদগনের সঙ্গ, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এরূপ মহাজন দুস্তরণীয় ভবসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান জীবন-তরণীর সুযোগ্য কর্ণধার হতে পারেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭)

আমরা ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগনের মধ্যে কাহাকেও কর্ণধাররূপে বরণ করতে পারি। তাঁর সঙ্গ করার সম্ভাবনা রয়েছে আমারই মত চেহারা ধারণ ক'রে আমাদেরই অতি নিকটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার ভাষায় কথা বলছেন। এরূপ মহাজনকে পাওয়াও সুলভ হয়েছে। সেইজন্য মনুষ্য-জন্মটা আরো বেশী অর্থদ হয়েছে। তাঁদের guidance (গাইডেন্স – নির্দেশিকা) ছাড়া ভগবানকে জানা যায় না; পাওয়া যায় না। আমি ইচ্ছে করলে তাঁর guidance (নির্দেশিকা) মেনে নিতে পারি।

ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহারে ভগবৎ-প্রাপ্তি

কিন্তু আমি এরূপ ভবরোগের বৈদ্যকে বরণ না ক'রে দূরাকাঙ্ক্ষার পিছনে পিছনে ছুটে চলেছি। আমি লক্ষপতি হতে চাই, দীর্ঘ-জীবন লাভ করতে চাই, বড় কবি হতে চাই, prime minister (প্রাইম মিনিষ্টার – প্রধানমন্ত্রী) হতে চাই। কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে পরমার্থকেও চাইতে পারি। মানুষের willing power (উইলিং পাওয়ার) বা ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করবার শক্তি আছে। মানুষ ইচ্ছে করলে টাকাকড়ি, পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রধাবিত হতে পারে; কবি, রাজনীতিবিদ কিংবা বৈজ্ঞানিকের পিছনে পিছনে ছুটতে পারে; কিংবা সে ইচ্ছা করলে ভক্তের অনুগমনে ভক্তের পিছনে ছুটতে পারে। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের পিছনে ছুটলে এই জীবনেই পরমার্থ পাওয়া যাবে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তুমি ইচ্ছে করলে রক্ত-মাংস-হাড় খেতে পারো; আবার ইচ্ছে করলে ওগুলি বাদ দিয়ে প্রসাদও পেতে পারো। একটা সিংহ বা ব্যাঘ্র রক্ত-মাংস-হাড়কে ছাড়তেই পারে না, কিন্তু তুমি যেহেতু মানুষ; বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ – তাই তুমি এই কুমেধ্যগুলি খাওয়া ছাড়তে পারো। তুমি জড়পদার্থ নও, you have will (ইউ হ্যাভ উইল); তুমি ইচ্ছা শক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারো। আমি মঠে যেতে পারি, বিগ্রহ দর্শন করতে পারি। আবার আমি ইচ্ছে করলে ক্লাবে কিংবা cinema-hall (সিনেমা হল)-এ যেতে পারি; আমি অস্থানে

কুস্থানে যেতে পারি, আবার আমি ইছে করলে মন্দির ও ভক্ত-দর্শনেও যেতে পারি। এই মনুষ্য-জন্মের সবচেয়ে বেশী সুবিধা হচ্ছে এই যে, যে মহাজন আমাদের ভগবানের সন্ধান দিতে পারেন, ভগবৎ-রাজ্যের কথা শোনাতে পারেন; আমাদের হৃদয়ে তাঁর নিত্য প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারেন – তাঁর দর্শন ও তাঁর সঙ্গ পাওয়া যায়। আমাদের হৃদয় থেকে প্রতিষ্ঠা-লালসা, অর্থপিপাসা প্রভৃতি দুর্বাসনা সরিয়ে দিয়ে সেখানে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন; ভগবৎ - প্রাপ্তির সম্ভাবনা জাগিয়ে দিতে পারেন। এরূপ ব্যক্তি মনুষ্য–দেহধারীরূপে মানুষের কাছেই বিচরণ করছেন।

হরিভজনের পথে কি কি অন্তরায়?

ভগবদ-ভজন যদি আরম্ভ করি, তাহলে বৃদ্ধ পিতামাতা হা-হুতাশ করবেন। যুবতী ভার্যা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে, আর অসহায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পথে পথে ঘুরে বেড়াবে – এগুলি তো আমাদের সত্ত্য দেখা দরকার। আমি এদের পালক, কর্তা, প্রভু ও অভিভাবক। They are my immediate concern (দে আর মাই ইমিডিয়েট কনসারন), আমার দিকে তারা তাকিয়েই আছে। এরা আমার উপর dependent (ডিপেন্ডেন্ট), এদের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে; এগুলি পালন করা আমার ধর্ম। আবার যদি ভাগ্য খোলে, তাহলে বুঝতে পারে; এদের সঙ্গে ক'দিনের কতটুকু সম্বন্ধ? আর কি আনন্দ তুমি তাদিগকে দিতে পারো? কতটুকু মঙ্গল তুমি করতে পারো? পুত্র শোকাতুরা মাতাকে তুমি লক্ষ টাকা দিয়েও কতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারো? পুত্র ফেরৎ দিতে পারো না নিশ্চয়ই। আমি রাজা, আমি প্রজা, আমি স্বামী – এই সব ছোট জিনিষ নিয়ে তুমি উন্মত্ত হয়ে পড়েছ। এটা যে অবোধের বোধ, এটা বালসুলভ-বুদ্ধির পরিচয়; কায়েমী বিচার নয় – মহাজনের সঙ্গে থাকলে এটা বুঝতে পারবে।

হরিতোষণেই পরা শান্তি

পড়ে থাকুক বৈকুণ্ঠ, চলে যাক নিত্যানন্দ; দূরে থাকুন ভগবান।

এখন দেখতে হবে পরিণীতা ভার্যাকে। তুমি অন্ধ, তুমি বধির। 'হরি, কৃষ্ণ' বলে ডাকতে তোমার প্রাণ চায় না। হরিকথা শ্রবন তোমার কানে বিষ ঢালে; অথচ radio (রাডিও)-র গান, টেলিভিশন ও মোবাইলের গান তোমার কানে অমৃত বর্ষণ করে। "মা", "বাবা", "দাদু", "খোকা", "খুকু"—এইসব ডাক শুনতে প্রাণ নেচে ওঠে। "দাদু" ডাক শুনে যেন তোমার প্রাণ গলে যায়, যেন এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এই অনিত্য সম্বন্ধগুলি আমাদের পতিত করছে। এগুলি আমাদের আত্মবিস্মৃতির পথে এগিয়ে দিচ্ছে। মহাজনগণ এই বিভ্রান্তি দূর করে ভগবৎ-রাজ্যে প্রবেশের পথ বলে দিতে পারেন।

বৈকুন্ঠ-বাণী-বৈকুন্ঠ-নাম যে নিত্য আনন্দ দিতে পারে, এটা এঁরা ভাল করে বুঝিয়ে দেন। বৈকুন্ঠ-বার্তা রেডিওর গান নয়,—একথা এঁদের কৃপার প্রভাবেই উপলব্ধ হয়; কেউ যদি ইচ্ছে করে তাঁদের উপদেশ শ্রবণ ক'রে জীবন-গঠনের চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগে যায়। এইজন্য মহাজন বলেছেন,—

কামাদীনাং কতি না কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি –
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙক্ষ্বাত্মদাস্যে॥
(শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু ৩।২।২৫)

এই কামনা-বাসনা ও অসদ বস্তুগুলির ভোগের পিছনে কত ছুটেছি; এখনও ছুটছি। এতেও কি শান্তি বা আনন্দ আছে? হে যদুপতি, তোমার সেবায় এখন আমায় নিয়োগ করো। দুর্বার কামনা-বাসনার, কামিনী-ভামিনীর কত আব্দার, কত আদেশ পালন করেছি। এদের জন্য স্বাস্থ্য, টাকাকড়ি কত নষ্ট করেছি, তবুও আমার প্রতি এদের করুণা হলো না। আর আমারও লজ্জা হলো না। হে প্রাণনাথ! এখন বুঝেছি —তুমি ছাড়া গতি নেই; এগুলি বিসর্জন দিয়ে নিত্যানন্দের

খোঁজে বেরিয়েছি। হে দয়াল ঠাকুর! সংসারের enjoyment (এনজয়মেন্ট – ভোগ) থেকে আমাকে ছুটি দাও। বৈষয়িক অনিত্য কর্তব্য-বোধ থেকে আমায় রেহাই দাও। কর্তব্য কর্ম করারূপ ধর্মের প্রতি আমার আর আস্থা নেই।

"নাস্থা ধর্মে ন বস্তুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদযদ্ভব্যং ভবতু ভগবন পূর্বকর্মানুরূপম।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।"

(মুকুন্দমালা-স্তোত্র—৫)

অনেক ক'রে দেখেছি, এতে পরা শান্তি পাইনি। জন্ম-জন্মান্তরে তোমার চরণ–কমলের সেবা দাও। হরিভজনে আত্মনিয়োগ করতে দাও। তোমার পাদাব্জদাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দাও। এইটাই মনুষ্য-জন্মের প্রাপ্য অর্থ, এইটাই পরা শান্তি। হে ভগবান! আমি যে জন্য সৃষ্টি হয়েছি, তার সিদ্ধি হোক।

বিষয় সবজীবনে সর্বত্রই পাওয়া সম্ভব, তাই মনুষ্য জীবনে নিরন্তর হরিই ভজনীয়, কারণ – জীবন অনিত্য

আমার চারিদিকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ছড়ানো রয়েছে। এইসব জিনিষ সাধন-ভজন বা চেষ্টা ক'রে যোগাড় করতে হয় না। সর্বত্র সর্বজীবনে এগুলি পাওয়া যায়। পশু-পক্ষী, বানর-মানুষ সকলের খাওয়া-দাওয়া, ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুযোগ জুটে যায়। এর জন্য কোন তপস্যা করতে হয় না। নিম্নস্তরের জীব হলেও জোটে; এর জন্য special endeavour (স্পেশাল এনডিভার) বা effort (এফোর্ট—চেষ্টা) করতে হয় না। নিতান্ত ঘৃন্যভাবে জীবনযাপন ক'রে যাও; তবুও সর্বত্রই এগুলি পাবে। সমস্ত জীবনেই বিষয় পাওয়া যায়; কিন্তু হরিভক্তি, হরিভজন ও হরিতোষণ অন্য জীবনে পাওয়া যায় না। যে পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত না

হও; সে পর্যন্ত তুমি হরিভজনে তৎপর হও। কারণ মৃত্যু সর্বদা তোমার পিছনে পিছনে ঘুরছে; কখন যে সে গ্রাস করবে, তার কিছুই ঠিক নেই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঔষধের দোকান; আর ডাক্তারের ছড়াছড়ি। দিন দিন কত drugs (ড্রাগস – ঔষধ) আবিষ্কার হচ্ছে, তবু কি মৃত্যুকে রোধ করতে পেরেছে? তোমরা যত ঔষধ আবিষ্কার করছো; যমরাজাও নিত্য নূতন নূতন ব্যাধি স্বষ্টি ক'রে পাঠাচ্ছেন—এই ভূতলে। তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা আর কতটুকু আবিষ্কার করতে পারো? এক সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যমরাজা হাজার হাজার লোককে বিনাশ ক'রে দিতে পারেন। দেখা যাচ্ছে – কোন ফাঁকে যে মৃত্যু এসে যাবে, তা কেউ বলতে পারেন না। স্থতরাং এখনই হরিভজনে যত্নশীল হও।

আমি বারো বছরের খোকা; এখন পড়াশুনা করার সময়। আমি ত্রিশ বছরের নব-বিবাহিত স্বামী – আমরা যুবক-যুবতী; এখন ভোগ করার সময়। আমরা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া – ছেলেমেয়েদের একটু গুছিয়ে দিই; বুড়ো হই, তখন হরিভজন করা যাবে। হে ঠাকুর! তখন তোমাকে ডাকবো। কিন্তু চিন্তা করা দরকার – বুড়ো বয়সে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যায়; যৌবনের উদ্যম-উৎসাহ যায় নিভে; স্বাস্থ্য যায় ভেঙে। একজন লোক তখন ধরে তুলে না দিলে নড়াচড়া-ই করা যায় না। তখন হরিভজনের ইচ্ছা জাগলেও পারবে না, সামর্থ্যে কুলাবে না!

"জীবন-সমাপ্তিকালে করিব ভজন
এবে করি গৃহস্থখ।
কখন এ-কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ।।"

(কল্যাণকল্পতরু)

বৃদ্ধ-বয়সে হরিভজন অসম্ভব

অনেকে ভাবেন যাট বছর হোক, হরিভজন আরম্ভ করা যাবে।

কিন্তু জীবন যদি তার পূর্বে পড়ে যায়। জীবন চঞ্চল, পদ্মপত্রে বারিবিন্দু-সম, মুহূর্তেই ঢলে পড়তে পারে। ষাট বছরে তো retired life (রিটায়ার্ড লাইফ)। তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গণনায় ব্যস্ত থাকতে হয়। Retired life-এ তোমাকে ডাকবো, এ বুদ্ধিমানের কথা নয়; এটা ভগবানকে ঠকানোর কথা; ফাঁকি দেওয়ার কথা। প্রৌঢ়-কালে হরি-ভজন করতে পারবে না; মন বসবেই না; রুচি আসবে না। পুরাতন কর্মের সংস্কার তোমাকে এমন বাধা দেবে, তা তুমি অতিক্রম করতে পারবে না, পুরাতন কর্মের ধাক্কা তখন সহ্য করতেই পারবে না।

হরিভজন কালাকাল বিচার-হীন

"প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।" (কল্যাণ-কল্পতরু) সুতরাং যে যেখানে আছ, আজ থেকেই হরিভজন আরম্ভ করো। - কিন্তু বিলম্ব করো না; বেলা যে চলে যায় – সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। হরিভজণের কাল নেই। ইহা কোন সময়ের অপেক্ষা করে না। এখনিই হরিভজন শুরু করো; পড়া থাকুক, পড়ানো থাকুক, আর কালবিলম্ব না ক'রে উঠে-পড়ে লেগে যাও, কৌমার-বয়স থেকে হরিভজন করাই শ্রেয়।

"কৌমার আচয়েৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম।।
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৬।১৫ঐ

হরিভজনেই মনুষ্য-জন্মের চরম সার্থকতা

হরিভজনে স্পৃহা জাগলেই মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা। তুমি কেবল "বাবা" কিংবা "মা" হওয়ার জন্য আসোনি। জগৎপিতা পরমেশ্বরকে ডাকবার জন্য, তাঁর আরাধনা করার জন্য তিনি এখানে তোমাকে

পাঠিয়েছেন। তোমাকে স্বষ্টি করবার Purpose (পারপাস) হলো হরিভজনে জীবন-কাটানো। তুমি মানব-জন্ম পেয়েছ, জন্মগ্রহণ করেছ এই পবিত্র ভারতভূমিতে। কখনও কখনও তুমি ভগবৎ-কথা শুনতে পাও। তুমি ভগবানের ভক্ত মহাজনের দেখাও পেয়েছো। এরূপ স্বুযোগ্য কর্ণধার পেয়েও যে সংসার-সমুদ্র পার হতে চায় না, সে আত্মঘাতী। এত সমস্ত স্বুযোগ থাকতেও যে অবহেলা করে; সে মনুষ্য–জন্মের অপব্যবহার করলো। - এ কথাটা বুঝতে হবে। এই অপব্যবহারের ফলে আর মনুষ্য-জন্ম পাবে না। এ জন্মে যে সব কর্ম করবে – তার ফল অনুযায়ী দেহ লাভ করবে। "পুনর্মূষিকো ভব।" ঘুরতে ঘুরতে আবার হয়ত কত নীচে চলে যাবে; তার ঠিক নেই। কত জন্ম কাঁদবে – শোকে দুঃখে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে – রোগে যন্ত্রণায় অভাবের তাড়নায় কত কষ্ট পাবে!

"দুর্লভ–মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু, দুঃখ কহিব কাহারে?।।
'সংসার' 'সংসার' ক' রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল।।"

(কল্যাণকল্পতরু, নির্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি—৪)

মনুষ্য-জন্ম লাভ ক'রে বুদ্ধি যেমন পেয়েছিলে; তেমনি সৎসঙ্গও পেয়েছিলে। এইসব opportunity (অপরচুনিটি – স্বুযোগ) তোমার কাছে এসেছিল; যদি হেলায় এসব হারাও, তাহলে তুমি দুঃখের জ্বালায় জ্বলবে। যদি পরমধামে নিত্য পরা শান্তি পেতে চাও, এখন থেকে হরিভজন আরম্ভ করো; তবেই নিত্য বাস্তব কল্যাণ সাধিত হবে।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।"

—❖—

মহাবদান্য শ্রী গৌর সুন্দর

স্থান ঃ গম্ভীরা (পুরী)

এই গম্ভীরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ লীলাক্ষেত্র। এই স্থান গৌড়ীয় বৈষ্ণবগনের শুধু নয়, সমগ্র জীবজগতের আরাধ্য স্থান। এখানে শ্রী-শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজ করছেন; এটা তাঁর নিত্য লীলাস্থলী। এই সমিতির প্রাণস্বরূপ পরিচালকবর্গ গোস্বামীগণের সাদর আহ্বান লাভ করা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ করুণা বলে আমার মনে হচ্ছে। এত বড় দয়াল তিনি এরূপ একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কৃপা-কটাক্ষপাত করেছেন, যার ফলে তাঁর সুযোগ্য সেবকগণ এরূপভাবে আমায় আশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছেন। এই নিত্য আরাধ্য স্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম, এখানকার ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়া এবং এর ধুলো মাথায় নেওয়া কিংবা এখান-কার সেবায় কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করার ফলে জীবন ধন্য হয়ে যায়।

এই গম্ভীরায় সেবা করবার সুযোগ জীবনে পরম ভাগ্যের কথা মনে করি। গম্ভীরার এই পরিবেশে সকলের কৃপা ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ ক'রে আজ এখানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী করুণার কথা বলবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছি।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, কিন্তু অনাদি–বহির্মুখ

জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি এবং কৃষ্ণের সহিত ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হলেও অনাদি-বহির্মুখ। তটস্থা–শক্তির পরিণাম যে জীব, সেই জীব পরমাত্মার বৈভব এবং মায়াবশ-যোগ্য। কোন সময়ে এই জীবের ভগবদবিমুখতা এসেছে তা বলা যায় না। জীব নিত্য-তত্ত্ব। সৃষ্টির কোন মুহূর্তে ভগবদবিমুখতা-রূপ অজ্ঞানতা তাকে ঘিরে ফেলেছে, এর কোন কাল-নির্ণয় হয়নি – ইহা শাস্ত্র-বাণী। শাস্ত্রকারগণ ও তত্ত্ববেত্তাগণ অন্ধকারে হাতড়ান না; তাঁরা লোকের কথা শুনে বা গ্রন্থাদি পড়ে অনুভূতিহীন পাণ্ডিত্যর দ্বারা

পরিচালিত নন। বস্তু যাঁদের প্রাপ্তি হয়েছে, এরূপ মহাজনগনের announcement (এনাউন্সমেন্ট – প্রচার, বিবৃতি) আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তাঁদের প্রচার অনুভূতিমাখা – সত্য এবং আম্নায়-ধারায় আগত-উহাও সত্য। তাঁদের অনুভবলব্ধ সত্যবাণীর প্রচারানুসারে জীব তটস্থা-শক্তির পরিণাম—পরমাত্মার বৈভব। তাদের বহির্মুখতা অনাদি।

কৃষ্ণভোলা জীব মায়ার দ্বারা আক্রান্ত

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি–বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২০।১১৭)

স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীব নিত্য আরাধ্য ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ হারিয়ে ফেলেছে। তৎফলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া তাকে গ্রাস করেছে। কৃষ্ণভোলা আত্মবিস্মৃত জীব জন্ম-জন্মান্তর এমনিভাবে কৃষ্ণকে হারিয়ে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যাঁরা কৃষ্ণভোলা নন, - যাঁরা স্বরূপপ্রাপ্ত হয়েছেন, - মহামায়ার আধিপত্য বা influence (ইনফ্লুয়েন্স – প্রভাব) তাঁদের উপর নেই। যাঁরা কৃষ্ণ ভুলে মায়ার দ্বারা আক্রান্ত, তাঁদের বিপর্যয় বা অস্মৃতি ঘটেছে। বিপর্যয় অর্থাৎ স্বরূপের বিভ্রান্তি, অস্মৃতি অর্থাৎ স্বরূপের অস্ফূর্তি; স্বরূপ-বিভ্রান্ত বদ্ধজীব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের দ্বারা সর্বত্র আক্রান্ত। এঁদের এই নিদারুণ দুঃখ দেখে দয়াল ঠাকুর দুঃখমোচনের ব্যবস্থা করেন। জীবের বদ্ধ অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত ক'রে উদ্ধার করবার জন্য দীনদয়াল ভগবান তাঁর নিজ-জনকে পাঠিয়ে দেন। মহাজনগণও দুঃখকাতর হয়ে এঁদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য চেষ্টিত হন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জীবের এই দুঃখ দেখে অত্যন্ত কাতর হয়ে দুঃখমোচনের জন্য নিজে চেষ্টা করেছেন। তবুও বদ্ধজীবগণ সাড়া দেয়নি। তিনি তখন ভগবানকে তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়ে পূজা ক'রে হুংকার দিয়ে ডাকলেন। "এদের দুঃখ

দূর করো” বলে ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। ভক্তের কাতর আহ্বানে ভগবান গোলোকে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অবতরণ করলেন এই ভৌম প্রপঞ্চে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বললেন—

“নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুংকারে।”

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আহ্বানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু জীবের প্রতি অত্যন্ত দয়াল। তাই তিনি শ্রীগৌর-আনা ঠাকুর। তাঁরই আকুল আহ্বানে ও গভীর ক্রন্দনে শ্রীগৌরসুন্দর এলেন।

মায়াকে ভোগ করার জন্য জীব সর্বদাই ব্যস্ত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সমাজ, দেহ ও দেশ—এইসব নানাবিধ জিনিষের সম্ভোগে জীব উন্মত্ত। তাদের সঙ্গে জীব কায়েমী সম্বন্ধ পাতিয়ে বসেছে। তাদের অবিরত ভোগ ক’রে চলেছে। কিন্তু জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস ; সে স্বরূপতঃ ভোগী নয়। এই স্বরূপ-ভ্রান্তিরূপ বিপদ থেকে জীবকুলকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরকে ডাকলেন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে সমাজের ও ধর্মজগতের চিত্র কি করুণ, কি রকম দুর্দশাগ্রস্ত, তা অনেকেই জানেন। ভক্তি ও ভগবানের আরাধনা এক রকম নেই – বললেই চলে। মঙ্গলচণ্ডীর গানে ও মনসার পাঁচালীতে দেশের জনমানস পরিপ্লাবিত। তাতেও প্রাণের স্পন্দন নেই—নিম্নস্তরের ভূমিকামাত্র। ধর্মক্ষেত্র ভারতে যখন এই রকম অবস্থা, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আহ্বানে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের অবির্ভাব হলো। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ। যিনি গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন উদার, তখন তিনি গৌর। আবার শ্রীগৌরসুন্দর যখন মধুর ; তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ-গৌর একই তত্ত্ব, উভয়ের মধ্যে শুধু লীলাবৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাতে ঔদার্য অর্থাৎ করুণার মহাপ্রকাশ। আর কৃষ্ণলীলা মাধুর্যময়তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা মুক্তকুলের উপাস্য। ব্রজবাসিগণ বদ্ধ জীব নন; আর শ্রীগৌরসুন্দরের

লীলা পতিতপাবন লীলা। সিদ্ধ, মুক্ত নির্মলতা প্রাপ্তস্বরূপ, প্রেমিক, রসিক, ভাবুকের সঙ্গে তাঁর লীলা ব্রজভুমিতে। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর-লীলা কৃষ্ণের। বৃন্দাবন-মথুরা ও দ্বারকা-লীলা মাধুর্যময়। অবশ্য এদের মধ্যে তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। মাধুর্যপ্রধান কৃষ্ণকে জগদগুরু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জগতের দুঃখ দূর করবার জন্য আনতে চাইলেন। তাই, কৃষ্ণকে ঔদার্যভাবে ও পতিতপাবন ভাব অঙ্গীকার ক'রে এ ধরায় নামতে হলো।

"হা গৌর-নিতাই, তোরা দু'টি ভাই,
পতিত–জনের বন্ধু।"
(কল্যাণকল্পতরু, প্রার্থনা লালসাময়ী—৯)

যাঁরা পতিত, দুর্গত, অনর্থগ্রস্ত, পাপী, তাপী ও অপরাধী—তাঁদের বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হলেন শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় যাঁরা প্রেমিক ও রসিক, তাঁদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের রসাস্বাদন-লীলা; কিন্তু তাঁরা মুষ্টিমেয়। আর অধিকাংশই পতিত, অধম – তারা কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয় তর্পণের দ্বারা আক্রান্ত। পাণ্ডিত্যাভিমানী অনর্থগ্রস্ত সকলেই কৃষ্ণ-বিস্মৃতিতে ভরা। তাঁদের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্যলীলা। তাই শ্রীগৌরসুন্দর পতিতজনকে উদ্ধারের জন্য পাঠালেন—নিতাই ঠাকুর ও হরিদাস ঠাকুরকে। প্রেমের ঠাকুর নিতাই প্রথমেই মাতাল, কুখ্যাত জগাই-মাধাইকে ধরলেন। হরিদাস ঠাকুর বললেন,—"মাতালের পাল্লায় পড়ে আজ প্রাণ হারাতে হলো;"—কিন্তু প্রেমদাতা নিতাই ঠাকুর তার প্রত্যুত্তরে বললেন, - পতিতকে দেখে avoid (অ্যাভয়েড) করলে শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্যলীলার পূর্ণ প্রকাশ হবে না। যদি দীনদয়াল ঠাকুর এসে থাকেন, তাহলে এঁদের জন্যই এসেছেন। তিনি পতিতজনকে দূরে সরিয়ে রাখেননি, - তিনি পতিতপাবন। এই পতিতদের জন্য নিতাই ঠাকুরকে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। তাঁর পবিত্র রক্তধারায় সিক্ত হয়েছে নবদ্বীপ-ভূমি। তবু কি তিনি প্রেম দিতে ছেড়েছেন।

গৌর-নিতাই পতিতজনের বন্ধু

জগতের সমস্ত জীবই বিলাসী ও ভোগপরায়ণ; আমি স্ত্রী বা আমি পুরুষ, আমি অমুক দেশবাসী – এ সব অভিমান পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। প্রেম কতদূরের বস্তু! শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে গম্ভীরায় গাম্ভীর্যময় লীলায় প্রবেশ দুর্গত ভাগ্যহত জীবের পক্ষে সুদূর–পরাহত। সেই প্রেমের ছিটেফোঁটা যদি কারও লাভ হয়, তবে তা সা-ধারণতঃ বলার কথা নয়। আমরা অনর্থগ্রস্ত, আমরা সব পতিত— সেই আপ্রাকৃত গম্ভীর–লীলার আস্বাদন করার আমাদের কোন অধিকার নেই। কয়জন সিদ্ধ আমাদের মধ্যে? কৃষ্ণলীলায় বদান্যতার কথা নেই, দয়া–প্রকাশের লীলা নেই; - এ কথা বলা হচ্ছে না। প্রধানতঃ তাঁর লীলা মাধুর্যপূর্ণ ও সম্ভোগময়। যাঁরা প্রেম-ধনে ধনী, তাঁদের নিয়ে লীলা। আর শ্রীগৌরলীলা – যাঁরা অজ্ঞান, দরিদ্র ও দুঃখী, তাঁদের নিয়ে। গৌর এলেন তো একা এলেন না; তাঁর ভাবনুযায়ী পরিকরগণ-কেও নিয়ে এলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমদাতা, তাই তিনি মহাবদান্য

কৃষ্ণলীলার পরিকর গোপীবৃন্দ, সখী ও মঞ্জরীগণ। ঔদার্যলীলায় সে সব ভাব নেই, সে সব রূপ নেই। স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণ হলেও ঔদার্যলীলা প্রকাশের জন্য তাঁকে অন্য ভাব ও অন্য রূপ নিতে হলো। শ্রীগৌরসুন্দর কিভাবে এই ঔদার্যলীলা প্রকাশ করলেন। তিনি মহাদাতা ও মহাবদান্য বলা হতো না। ইনি মহাবদান্য কেন? কারণ তিনি এমন জিনিষ দান করেছেন, যাতে গ্রহীতার আর কোন অভাববোধ থাকে না। এইরূপে জিনিষ মুক্তি বা মোক্ষ নয়। তিনি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অকাতরে দান করলেন – কৃষ্ণপ্রেম। মোক্ষ-বাসনা বা শান্তিকামনা – সবই কৈতব। শান্তি চাই, দুঃখ চাই না - শান্তিপ্রিয় বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-কামনা কাম। আর "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' – নাম" —এই কৃষ্ণপ্রেম সুদুর্লভ। কারণ এ প্রেম তো শুধু জন্ম–জন্মান্তরের

দুঃখ ঘুচাবে, তা নয়; যাবতীয় আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি ঘটাবে, তা নয়; কৃষ্ণপ্রেম ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটায়। তিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা, এইজন্য তিনি মহাবদান্য। 'স্বরূপপ্রাপ্তি' মানে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি; ভগবৎ-দাস্য জীবের লাভ হয়। দাসের অভিমানই সেবা। এই যে দাস্য-বিতরণ, এর দ্বারা জীবের আনুষঙ্গিকভাবে তাপত্রয় উন্মুলিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভগবানকে এর জন্যই শুধু ডাকেননি। জীবজগৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করুক; জীবের সমস্ত ক্লেশ-নিবৃত্তি হ'য়ে পরমধামে কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করুক। ভৌম প্রপঞ্চে মায়ার তাড়নায় যেন কৃষ্ণবিস্মৃতি ভোগ করতে আর না হয়। এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য—তিনি মহাদাতা।

নাম-সংকীর্তণের দ্বারে তাঁর কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণ

শ্রীগৌরসুন্দর এই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম কি ভাবে দিলেন? তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর – পরমেশ্বর। তিনি ইচ্ছা করলেই তো প্রেম হয়ে যায়। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তা করেন, কিন্তু নবদ্বীপ-এ – নাম সংকীর্তন দ্বারা। জিনিষটা অনর্পিতচর, আর method-টাও (মেথড—উপায়) অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব ও অচিন্ত্যপূর্ব। এত তপস্যা, এত যজ্ঞ, এত পূজা এত ধ্যান করেও যে প্রেম-রত্ন পাওয়া যায় না; সেই প্রেম নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেললেন। আপামর জনসাধারণের মাঝে প্রেমকে বিলিয়ে দেবার যে vehicle (ভেহিকল–বাহন) বা instrument (ইনসট্রুমেন্ট–যন্ত্র) আবিষ্কার করলেন, তা হলো নাম–সংকীর্তন। এই নাম-সংকীর্তন সকলেই করতে পারে। সবচেয়ে বড় জিনিষ দিতে হবে এবং সকলকেই দিতে হবে। তাই তিনি এই কৃষ্ণপ্রেম দেওয়ার জন্য নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করলেন। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, অন্ত্যজ ও চণ্ডাল পর্যন্ত অতি সহজেই যাতে পরতম ধন পেতে পারে, তিনি তার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। যাঁরা ব্রাহ্মণ নন, তাঁদের অর্চনে অধিকার নেই। তিনি যদি শুধু অর্চন শিক্ষা দিতেন, তাহলে তাঁর উদারতা restricted (রেসট্রিকটেড) হতো। তাই শ্রীগৌরসুন্দর দিয়েছেন সংকীর্তন আর সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন – কলিযুগে অন্য কোন গতি নেই। ধ্যান, পূজা, তপস্যা কিংবা নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা

সকলে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ পেতে পারবে না। নামে সমস্ত শক্তি দিলেন; সমগ্র ঔদার্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণনামের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে— "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা— ***।" (শ্রীপদাবলী, ৩১)

নাম-সংকীর্তনের মধ্যে তাঁর সমস্ত উদার-শক্তি নিহিত

জীব যত ছোট হোক, যত অনধিকারী হোক না কেন, তাকে সর্বোচ্চ জিনিষ দিতে হবে। তাই তিনি নাম-সংকীর্তনের মধ্যে তাঁর সমস্ত উদার-শক্তি নিহিত ক'রে দিলেন। আর একটি কথা আছে, সেটি গুহ্য। তিনি স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-বৃত্তির প্রভাব নামভজনে কৃপা ক'রে দিয়েছেন। জীবের পাপ আছে, জীব স্ত্রৈণ, টাকাকড়ির দিকে তার নজর বেশী; কামনা-বাসনাগুলো সব সময় তার মনে কিলবিল করছে। জীব প্রতিষ্ঠা চায়; বিদ্যা চায়; তার আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই। এরূপ ব্যক্তি সকলেই নাম-গ্রহণ এবং নাম উচ্চারণ করতে পারে। অধিকার-অনধিকারের বিচার নেই; যে সামনে পড়ে, তাকেই বুকে তুলে নিলাম। তোমার জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল নিলাম। যেই মুহূর্তে তুমি কীর্তনে যোগদান করবে এবং নৃত্য করবে, অমনি অন্তরে প্রেমের উদয় হবে; কামনা–বাসনা-প্রবৃত্তিগুলো স্তব্ধীভূত হবে। সংকীর্তনের উদার শক্তির প্রভাবে উন্নত উজ্জ্বল রস পর্যন্ত পেয়ে যাবে। কারণ তিনি এতে দিয়েছেন তাঁর সমস্ত ঔদার্যশক্তি; হ্লাদিনীশক্তি এতে অনুস্যূত আছে। ইহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। "নাম অমনি উদিত হয়, ভকত-গীত-সামে।"—এই যে বদান্যতা, এই যে করুণা-প্রকাশ— ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের মহা-দান।

দয়া প্রকাশের তারতম্যে ও বৈশিষ্ট্যে তাঁর দান অপূর্ব

কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ এবং স্বয়ং নামরূপে অবতীর্ন হন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম।" তাঁর মধ্যে চতুঃষষ্টি গুণও আছে। তিনি সর্ব–অবতারী। কিন্তু অন্য সমস্ত অবতারে এরূপ ঔদার্যের প্রকাশ কোথাও দেখা যায়নি। প্রেম-প্রকাশের এমন ঘটনা অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। অন্য অবতারে অসুর-নাশন ও ভক্ত-বিনোদন দ্বিবিধ লীলা দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীগৌর-

সুন্দরের ঔদার্যলীলার মত এত বিপুল ও উচ্ছ্বলভাব ধরাধামকে আর কোনও অবতারে প্লাবিত করেনি। অন্যান্য অবতারে উদারতা আছে, করুণা আছে, নিষ্ঠুর কোন ঠাকুরই নন। কিন্তু দয়াপ্রকাশের তারতম্যে ও বৈশিষ্ট্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দান অপূর্ব। শ্রীগৌরসুন্দর ভিতরে ভিতরে দৈত্যভাবাপন্ন কোটি কোটি মানুষকে কোন রকম আঘাত না দিয়ে অকাতরে নাম বিলিয়ে দিলেন এবং অযাচিতভাবে প্রেম দান করলেন। এরূপ অপার করুণা অন্য কোন অবতারে প্রকাশিত হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম নিলেন কৃষ্ণকে দান করবেন বলে। তিনি কৃষ্ণপ্রেম দিলেন; এই কৃষ্ণ উদার কৃষ্ণ হয়ে প্রকাশিত হলেন। অদ্বৈত ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। যে সবচেয়ে অযোগ্য এবং যে ধর্মের ধার ধারে না, তাকেও কৃষ্ণপ্রেম দিলেন।—"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ-উপদেশ।" – এইজন্য আত্মভোলা, কৃষ্ণদাস্যভোলা, পরম দুর্গত কলিহত জীবের পরম ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর। আমরা অজ্ঞান, দুঃখী – ভগবানকে ভুলে আছি এবং আমাদের ঠাকুরকে হারিয়েছি। তিনি কেবল দরিদ্রের বন্ধু – অভিমানী ধনীর নন। আমরা কলির মানুষ, কলিযুগে তর্ক ও সংশয় ভগবদ–বিমুখতার চরম প্রকাশ; ভগবদ-দ্রোহ চারিদিকে। এইসব জীবকে উদ্ধার করবার ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর। তাই কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে জীবের অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি সংকীর্তনের পিতা, সংকীর্তনের দ্বারে সব কিছু দিয়ে দিলেন।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতির ন্যথা।।"

(শ্রীচৈ চ আ ৭।৭৬ সংখ্যক পয়ার-ধৃত
শ্রীবৃহন্নারদীয় বচন ৩৮।১২৬)

নাম–সংকীর্তনই গৌরবিহিত ভজন-প্রণালী

কলিকালে নাম-সংকীর্তন ব্যতীত ভগবৎ প্রেম সম্ভব নয়; ধ্যান-ধারনা, পূজা ও অর্চন – সবই এ যুগে অচল। তাই নাম – সংকীর্তন ব্যতীত এ যুগে অন্য কোন উপায় নেই।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২২)

"ভক্তিযোগঃ ভগবতি, নবলক্ষণা ভক্তি। ভক্ত্যা মাম অভিজানাতি।" ভক্তির দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তির যে কোন অঙ্গ যাজন করো, তাঁকে পাবে। ভগবানের প্রতি ভক্তিই পরমধর্ম। নববিধা ভক্তি নবভাবেই শক্তি ধরে। তন্মধ্যে পাঁচটি মুখ্য। আবার এই পাঁচটির মধ্যে তিনটি মুখ্য। তন্মধ্যে একটি আবার সর্বমুখ্য। এটি হলো কীর্তন বা নাম-সংকীর্তন। কলিতে কীর্তন–সহযোগে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের দান বা ঔদার্যশক্তি নিহিত রয়েছে কীর্তনের ভিতরে। কীর্তন–সহযোগেই অর্চন হয়। জীব যদি এই কীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ গ্রহণ করে, তবে সে কলিযুগের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে পেয়ে যাবে। ভজন হলো নাম-সংকীর্তন। ইহাই গৌরবিহিত ভজন-প্রণালী।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় দেশ-বিদেশ নাম-সংকীর্তন ছড়িয়ে যাচ্ছে। শ্রীগৌর-নিতাই এই নাম-সংকীর্তন আমাদের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা বিচার করলে চিত্ত চমৎকৃত হবে। তাঁর অমন্দোদয় দয়া যত শ্রবণ করা যায়, যত বরণ করা যায়, ততই তার অপূর্ব চমৎকারিতা উপলব্ধ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর যে কি ঠাকুর! – তখনি তা বোঝা যায়! যিনি জিহ্বা দিয়ে গৌরহরি বলেন এবং হৃদয় থেকে তাঁর নাম গায়; নাম-সংকীর্তনের স্পর্শে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে যায়।

নিতাই ঠাকুর গৌর দেওয়ার ঠাকুর; সকলের কানে কানে নিতাই ঠাকুর বললেন – "গৌর-হরিবোল।" শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগনের মুখে "গৌর-হরিবোল শুনে তাঁদের বারণ করলেন এবং 'কৃষ্ণ'-নাম গাইতে বললেন। কিন্তু নিতাই ঠাকুর সে শাসন মানলেন না এবং ভক্তদের সঙ্গে "গৌর-হরিবোল" বলে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। তাই নিতাই ঠাকুর সকলের চিত্ত জয় করেছেন। 'গৌর'-নামে এ যুগে জীবের ভগবানে

উন্মুখতা আসে এবং গোরাচাঁদের চরণকমলে আমাদের হৃদয় আপনা থেকেই লুটিয়ে পড়তে চায়। তাঁর নামে মনপ্রাণ নেচে ওঠে। 'গৌর-হরি'-নামে এমন মিষ্টত্ব লুকিয়ে আছে, তা বর্ণনা করা যায় না। শ্রীগৌ-রসুন্দরের কৃপায় সেই প্রেমরস চিত্তমাঝে প্লাবিত হয়ে যায়। এই ঔদার্য-লীলার চমৎকারিতা সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছিল – এই গম্ভীরায়।

গৌরনাম অপরাধ বিচার করে না

এই প্রেম লাভ করতে হলে প্রধান সেনাপতি নিতাই ঠাকুরকে দরকার। তাই নিতাই ঠাকুর ছাড়া হরিনাম বা প্রেমলাভ কিছুই সম্ভব নয়।

"নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের-চরণ দু'খানি।।"

'গৌরহরি'-নাম অপরাধের বিচার করে না। কিন্তু 'কৃষ্ণ'-নাম অপরাধের বিচার করে। গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরপরিকর অপরা-ধের ধার ধারে না। কেন-না শ্রীগৌরসুন্দর যেমন ঔদার্যময়, তেমনি গৌরধামও পতিত-জনের ধাম। যত অর্থপিশাচ হোক, পতিত হোক, লোলুপ হোক, যে যত নীচ অনধিকারী, মালিন্যময় হোক না কেন, নিতাই ঠাকুর তাদের হৃদয়ে তত বেশী ঢুকে পড়েন। উদারতার বিচারে গৌরধামের তুলনা নেই; সেখানকার ধূলি, তাঁর পদাংকপূত স্থান— সবই তাঁর পবিত্র লীলা-নিকেতন। যেখান থেকে মাথা ঠেকাও, মঙ্গল হবেই হবে। সেই ধামের ধূলি মাথায় নাও; অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধি পাবে। "জন্মভূমি প্রিয়া মম" – গৌর-লীলাপীঠে গড়াগড়ি দিলে সহজেই ভগবৎপ্রেম পেয়ে যাবে। ঔদার্যের দিক থেকে পতিতজনের আশ্রয়স্থল গৌরধাম। নিতাই ঠাকুর কোল দেওয়ার জন্য সেখানে নিত্য বসে আছেন।

গৌরলীলা নিত্যকাল প্রবহমান

কলিহত জীবের জন্য যে অপূর্ব লীলা-মাধুরী প্রকাশ করে গেছেন তা আজও চলছে – নিত্যকাল চলতেই থাকবে – এর কোন শেষ নেই।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥"

তাঁর ধামকে যত ভালবাসবে, ততই তাঁর অমিয় করুণা হৃদয়ে অনুভূত হবে। তাঁর পদাংকপুত এই গম্ভীরায় তাঁর লীলা এখনও চলছে। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা, ঘরবাড়ী, হাওয়া—সবই তাঁরই অনুপম গুণ-গাথায় নিত্য মুখরিত। তাঁর কথা শ্রবণ করবার ভাগ্য আজ পেয়েছি। তাঁর কথা বলার সুযোগ পাওয়া জীবনের কত বড় ভাগ্য,—তা বলে শেষ করা যায় না।

কৃষ্ণনাম মধুর হতেও সুমধুর

এই শ্লোকে যে "কৃষ্ণ"-নামের মাধুর্য বেশী, তা দেখিয়েছেন। কৃষ্ণনাম সকল মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ মধুর হতেও সুমধুর।

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লী–সৎফলং চিৎস্বরূপম।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।"
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।৪৫১ শ্লোক-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচন)

অমৃত দিয়ে সৃষ্ট এই নাম। ইহা নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্য ফল। শ্রদ্ধায় হোক, হেলায় হোক, মানব যদি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে এই কৃষ্ণনাম পরিত্রাণ ক'রে থাকন।

"রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়।"
(অগ্নিপুরাণ)

এই কৃষ্ণনাম যাঁরা অবহেলাপূর্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁরা কৃতার্থ হন; ইহাতে কোন সংশয় নেই।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১।৯৯ পয়ার-ধৃত)
শ্রীবিদগ্ধমাধব ১।১৫)

'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ কি অমৃত দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে, জানি না। যখন ইহা নটীর ন্যায় জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন বহু জিহ্বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়; যখন কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্বুদ কর্ণের স্পৃহা জন্মায় এবং যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে। এই কৃষ্ণনাম যে কত মিষ্টি, তা বলা যায় না। সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণনামের সেবা করতে হৃদয় উন্মুখ হয়। এই কৃষ্ণনাম নিরন্তর মুক্তকুলের দ্বারা উপাসিত হয়। মুক্তকুলের সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শুদ্ধ–চিৎস্বরূপ "কৃষ্ণ"-নাম স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন।

"নিখিলশ্রুতি-মৌলি-রত্নমালা—
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত !
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিত স্তবাং হরিনাম! সংশ্রয়ামি ॥"

(শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক ১ম শ্লোক)

"কৃষ্ণ"-নাম পরম অমৃতস্বরূপ। ইহা ভক্তের জীবনে ভূষণ-সদৃশ।

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে –
র্বিরমিত–নিজধর্ম–ধ্যানপূজাদি–যত্নম।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৯)

কৃষ্ণনাম সর্বশ্রেষ্ঠ, এতে সর্বশক্তি নিহিত

কৃষ্ণনামের মহিমা অতুলনীয়। রসিক-সমাজে এই কৃষ্ণনাম আস্বাদনীয়। যাঁরা একান্ত কৃষ্ণ ভক্ত, তাঁরা এই কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ কীর্তন

করেন। এই নামে তিনি আবার সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন এবং নাম-স্মরণ-কীর্তনে কোন কালাদির নিয়ম বিধিবদ্ধ করেননি। জীবের প্রতি কৃপা ক'রে তিনি নামকে অত্যন্ত সুলভ করেছেন। কিন্তু এতাদৃশ্য দুর্ভাগ্য যে, এরূপ নামেও আমার অনুরাগ হচ্ছে না।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।"

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক)

কৃষ্ণ-রূপের শ্রেষ্ঠত্ব

নামের দিক দিয়ে যেমন "কৃষ্ণনাম" অন্যান্য ভগবদবতারের নামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনি রূপের দিক দিয়েও তিনি শ্রেষ্ঠ। শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুন্দরতম। তাঁর রূপ হৃদয়কে উল্লসিত ও উদ্বেলিত করে। অন্যান্য অবতারগনের রূপ নিষ্প্রভ হয়ে যায় – তাঁর অসমোর্ধ্ব রূপের কাছে। তাঁর রূপের তুলনা করা যায় না। তাঁর ত্রিভুবন-মোহন রূপের দিকে চাইলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

"প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ
কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিং নু মানং কবীনাং
দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩০।৩)

যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণের রূপ দেখতে পায়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য দেব দেবীর রূপ ভালো লাগে। যখন ভগবানের কৃষ্ণ-রূপ চোখের বা চিত্তের সামনে ফুটে ওঠে, তখন অন্য রূপ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। যিনি কৃষ্ণ-রূপ দর্শন করেছেন, তাঁকে কামরূপও আকর্ষণ করতে পারে না। এমন

কি লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সেবাপরায়ণা সতী সাধ্বী হয়েও কৃষ্ণের রূপ বর্ণন শুনে চিত্ত মোহিত হয়ে গেছে। তাঁর রূপের মহিমা শুনে লক্ষ্মীদেবীর চিত্ত চঞ্চল হয়ে গেছে। তাঁর রূপের আশ্চর্য আকর্ষণী শক্তি। এতে তাঁর সতীত্বের হানি, ব্যভিচার বা অন্যায় কিছু হয়নি। কেননা যিনি নারায়ণ, তিনিই কৃষ্ণ। সতী নারী স্বামীর সেবা পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণসেবায় আকৃষ্ট হচ্ছে, - কৃষ্ণকে ভালবাসতে চাচ্ছে – এতে অন্যায় হবে না। এইখানেই তার সতীত্বের চরম সার্থকতা। সে কৃষ্ণশক্তি, - সুতরাং কৃষ্ণ ছাড়া অন্যকে ভালবাসায় তার সতীত্বের হানি হচ্ছে; সতীত্বের ব্যভিচার হচ্ছে। এই কৃষ্ণরূপের আকর্ষণ–শক্তি অবর্ণনীয়। এমন তাঁর ভঙ্গী, এমন তাঁর কটাক্ষ, এমন তাঁর ভাব, এমন তাঁর পোষাক, এমন তাঁর ঢং, সে রূপের বর্ণনা শুনলে জীবের কাছে অন্য সব রূপ তুচ্ছ হয়ে যায়। তিনি প্রেমময় বলে অত রূপ তাঁর ফুটেছে। অত ভালবাসা আর কার আছে?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধ্যান –

"ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার–কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং গো–গোপসঙ্ঘাবৃতং,
গোবিন্দং কলবেণু–বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।।"
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৩।১১৪)

"বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদ–তিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগন্ডং,
কঞ্জাক্ষং কম্বুকন্ঠং স্মিত–সুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর–বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা,
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতী-শতবৃতং ব্রহ্মগোপাল-বেশম।।"
"কস্তুরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং,
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণম।
সর্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কন্ঠে চ মুক্তাবলী,
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল–চূড়ামণিঃ।।"

"বংশীন্যস্তাস্যচন্দ্রং স্মিতযুতমতুলং পীতবস্ত্রং বরেণ্যং,
কঞ্জাক্ষং সর্বদক্ষং নবঘনবরণং বর্হাচূড়ং শরণ্যম্।
ত্রিভঙ্গৈর্ভঙ্গিমাঙ্গং ব্রজযুবতীযুতং ধ্বংসকেশ্যাদিশূরং,
বন্দে শ্রীনন্দসূনুং মধুররসতনুং ধুর্যমাধুর্যপুরম্॥"
"সজল-জলদনীলং দর্শিতোদারশীলং,
করতলধৃতশৈলং বেণুবাদ্যে বিশালাম্।
ব্রজজনকুলপালং কামিনী কেলি লোলং,
তরুণতুলসীমালং নৌমি গোপালবালম্॥"

এই তাঁর রূপ। রূপের মহিমা যদি একবার শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণে আসে, তবে অন্যদিকে আর মন যায় না। সমস্ত চরাচর তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং বিহ্বল হয়ে যায়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর নিজের রূপ নিজেই দেখে বিস্মিত হয়ে যান। এমনি তাঁর রূপের চমৎকারিতা।

কৃষ্ণের গুণ-মহিমা

এইরূপ কৃষ্ণের গুণমহিমা। তাঁর গুণমহিমারও তুলনা নেই—

"সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥

* * *

অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ কোটি–ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজং হতারি–গতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥"
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৩০-৩২)

শ্রীকৃষ্ণে চারটি গুণ বেশী আছে। শ্রীরামচন্দ্র কিংবা নারায়ণে এ চারটি গুণ নেই। এই চারটি গুণে তিনি সকলকে excel (একসেল-অতি-ক্রম) করেছেন। এইজন্য তিনি অংশী ও অবতারী।

"সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা কল্লোল বারিধিঃ
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিত-প্রিয় মণ্ডলঃ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলী-কলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধ-রূপশ্রী-বিস্মাপিত–চরাচরঃ ॥
লীলা প্রেমণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ।"
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৩৩-৩৬)

এইরূপ কৃষ্ণের অসাধারণ গুণমহিমা। তাঁর সমান কেহ নেই; তাঁর ঊর্দ্ধে ও কেহ নেই। তাঁর অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের চ্ছটায় সকলে বিস্মিত হয়ে যায়। মূল–সঙ্কর্ষণাদিও তাঁর চরণ সেবা ক'রে থাকেন। বলরাম জ্যেষ্ঠ হয়েও তাঁর চরণ সেবা করেন।

রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বজ্রাঙ্গজী ও বিভীষণের প্রীতি, বামনদেবের প্রতি বলি মহারাজের প্রীতি কিংবা নৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের প্রীতি – এই সমস্ত সেবকগনের প্রীতি অতি মন্থর; কিন্তু এই সব প্রীতির চমৎকারিতাকে অতিক্রম ক'রে যায় কৃষ্ণের সেবক–সেবিকাগনের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি। কৃষ্ণের প্রতি শ্রীদাম-সুদাম কিংবা ব্রজের সেবকগনের প্রীতি বজ্রাঙ্গজী প্রভৃতির প্রীতি অপেক্ষা অনন্তগুণ বেশী। কৃষ্ণের প্রিয়মণ্ডল অতুল্যমধুর প্রেমমণ্ডিত। সীতাদেবীর প্রিয়বিরহকে excel (একসেল–অতিক্রম) ক'রে নিয়েছে শ্রীমতী রাধিকার বিরহ। বিরহে সীতাদেবী ক্রন্দন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে অশোক-কাননে সীতাদেবী মুহ্যমানা। বাল্মীকির তপোবনে তাঁকে বনবাসে দেওয়ার পর তিনি "হা রাম" "হা রাম" ব'লে কাতর বিলাপ করেছেন। বাল্মীকি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। রাম একি করছেন, - নিরপারাধা পতিপরায়ণা প্রেমিকাকে

বনবাসে দিলেন। বিরহাতিশয্যে সীতার সোনার রূপ শুকিয়ে গেছে। প্রেম-বিরহে সীতার মলিন বদন গভীর বেদনার উদ্রেক করে। কিন্তু ব্রজের গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। সীতাদেবী বিরহাতিশয্যে পাগল হয়ে যাননি। কৃষ্ণের সেবক–সেবিকাগণ, ব্রজের গোপীগণ, নন্দ-যশোদা প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণের জন্য পাগল ও আত্মহারা। বৃন্দাবনধূলি প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত হয়ে গেছে। রামের প্রতি বজ্রাঙ্গজীর প্রীতিকে অতিক্রম ক'রে গেছে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেম। শুধু শৃঙ্গার–রসের বেলায় নয়; শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণপ্রেমিকাগণের এই প্রেমাতিশয্য দেখা গেছে।

কৃষ্ণলীলায় বাৎসল্য–রসের পরাকাষ্ঠা ও বসুদেবের বাৎসল্য-প্রেম

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দশরথের বাৎসল্য-স্নেহ প্রবল। দশরথ কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে তাঁর সত্য বাক্য পালন ও নীতি রক্ষার জন্য তিনি রামচন্দ্রকে বনে পাঠালেন। তিনি সত্যবাদী ও নীতিবাদী—তিনি কথা দিয়েছেন, তা রক্ষা করেছেন। নীতির কাছে প্রীতিকে বলি দেওয়া হয়েছে। প্রীতিকে বাদ দিয়ে নীতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেন। শ্রীরা-মচন্দ্র ভগবান। ভগবানকে দুঃখ দিতে পারি, বনে পাঠাতে পারি; কিন্তু নীতিকে বাদ দিতে পারি না। দশরথের বাৎসল্য যে কিরূপ, এখানে তা বোঝা গেল। নীতি প্রীতির উপরে উঠল। আর বসুদেবও কংসের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—পুত্র হলেই কংসকে দিতে হবে। "দেবকীকে এখুনি মেরো না; আমি কথা দিচ্ছি—পুত্র হওয়া মাত্র তোমার হাতে দেবো। আমি ধার্মিক, আমি সত্যবাদী, আমায় বিশ্বাস করো।" কিন্তু যখন কংস-কারাগারে কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন; তখন বসুদেব সত্যপা-লনরূপ moral principal (মরাল প্রিন্সিপল—নৈতিক মূল নীতি) বা ethical code-কে (এথিকাল কোড—নীতিশাস্ত্রবিহিত) পদদলিত ক'রে কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দালয়ে রেখে এলেন। ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, জলপ্লাবন ও যমুনার উত্তাল তরঙ্গ কোন কিছু তার যাত্রাপথকে রুদ্ধ

করতে পারেনি। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বসুদেব সত্যপালনাদি সমস্ত নীতি-ধর্মকে পদাঘাত ক'রে, কংসকে প্রবঞ্চিত ক'রে ভগবানের সুখবিধান করেছেন। নন্দালয় থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এসে তিনি বললেন,—"আমার ছেলে হয়নি, আমার মেয়ে হয়েছে।" দেখুন—কি রকম ডাহা মিথ্যে কথা। 'অনন্তকাল কৃষ্ণ বাঁচুক, আমার প্রাণের দুলাল কৃষ্ণ দুষ্ট কংসের হাত থেকে রক্ষা পাউক; আমি অনন্তকাল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গহেতু নরকে বাস করি—তাতে কিছু ক্ষতি নেই। দশরথ পেরেছেন প্রাণের দুলালকে বনে পাঠাতে, আমি পারবো না। 'তাই বসুদেব নীতিকে চুরমার ক'রে দিয়েছেন; প্রীতির জয় জয়া কার হয়েছে। বিচার ক'রে দেখুন, দশরথের রাম-বাৎসল্য আর বসুদেবের কৃষ্ণ-বাৎসল্যে কত পার্থক্য। বসুদেব প্রেমের কাছে নতি স্বীকার করেছেন, নীতির কাছে নয়। এখানে বাৎসল্যের আধিক্য ও চমৎকারিতা কত বেশী ফুটেছে। ভক্তের প্রেমাতিশয্যে নীতি যে কত তুচ্ছ হয়ে যায়, অন্য কোন অবতারে তা এত পরিস্ফুট হয়নি। শ্রীগৌরসুন্দর পুরীতে দরজার উপরে শুয়ে বিশ্রাম করছেন; তাতে গোবিন্দ ঘরে ঢুকতে পারছেন না। গায়ে কাপড় দিয়ে মহাপ্রভুকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে সেবা করলেন; তাতে মর্যাদা লঙ্ঘন হলো। কিন্তু ভাবলেন—"এই সেবা করতে গিয়ে যদি নরকেও ডুবতে হয়, তাতে আমি রাজী আছি।" তাই "গোবিন্দ কহে মনে—আমার 'সেবা' সে নিয়ম।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১০।৯৫)

নন্দমহারাজের বাৎসল্য-প্রেম

কৃষ্ণলীলায় সবই মাধুর্যময় কেন? প্রীতি এখানে প্রচুর আছে। গোপীগনের বস্ত্রহরণ ইত্যাদি সবই প্রীতিময়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন নন, তিনি যশোদানন্দন। বসুদেব নন্দ-মহারাজের মত মহোৎসব করতে পারেননি। বসুদেব ছেলেকে নন্দ ঘরে রেখে এলেন, কিন্তু কোন জন্মোৎসব করতে পারেননি। সেই উৎসব নন্দ-মহারাজ করেছেন। পরের ছেলের মত নন্দ তা করেননি। নন্দের ঘরে ছেলে হয়েছে কি মেয়ে

হয়েছে,—তা তিনি জানেন না। নিজের পুত্র জেনে মহোৎসব করেছেন। বসুদেবের বাৎসল্য অপেক্ষা নন্দ-মহারাজের বাৎসল্য আরও অধিক। বসুদেবের ঘরে গলায় বৈজয়ন্তীমালা পরে, সুন্দর বসন পরিধান ক'রে, চতুর্ভূজ হয়ে, শঙ্খ–চক্র–গদা-পদ্ম ধারণ ক'রে, মকরকুণ্ডল-নূপুর আদির দ্বারা ভূষিত হয়ে প্রকাশিত হলেন—কৃষ্ণচন্দ্র। কার ঘরে এরূপ ছেলে জন্ম হয়? আবার জন্ম হয়েই কথা বলছেন; বসুদেব তাঁর স্তবস্তুতি করলেন। কিন্তু নন্দ-মহারাজ কৃষ্ণের স্তব করেননি। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রীতি বা বাৎসল্য অতুল্য। তিনি সেখানে বনে বনে গরু চরান, রাখাল বালকদের সঙ্গে বেণু বাজান এবং কত রকম খেলা খেলেন। নন্দের কাছে ঐশ্চর্য শিথিল হয়ে গেছে। বাৎসল্যের যে পরতম কথা—তার চরম হলেন নন্দ মহারাজ। নন্দ-যশোদার কৃষ্ণের প্রতি যে বাৎসল্য, তার তুলনা নেই। কৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, যার ঘরে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, সেই নন্দ মহারাজকে বন্দনা করি।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"
(শ্রীচৈ চ ম ১৯।৯৬ পয়ার-ধৃত শ্রীপদ্যাবলী—১২৬)

এইসব প্রেমরসের রসিক নন্দ- মহারাজ। বাৎসল্য – রসের পরা-কাষ্ঠা নন্দ-মহারাজের কাছে। যাঁর লোমকূপে কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা ও শিব আদি যাঁকে ভয় করেন, তিনি আবার একজন গোপনারীর দড়ির বন্ধনে পড়ে কাঁপছেন আর কাঁদছেন। এইরূপে তিনি ঐশ্বর্য ভাবকে স্তব্ধ ক'রে প্রীতিকে প্রকাশ করেছেন। এটা এক আশ্চর্য কথা। জগতে এই অক্ষয়- লীলা প্রকাশ করবার জন্য তাঁর অবতার। কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ এই আবির্ভাব যার হৃদয়কে স্পর্শ করে না, তার হৃদয় পাষাণে গড়া। এই আবির্ভাবের মহিমা, তাঁর অসমোর্ধবত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে জীবন ধন্য হয়ে যায়।

—❖—

শ্রীশ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা ক'রে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব – তিথিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা মহোৎসবে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করছি।

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।।"
(শ্রীচৈ চ আ ১।৭)

শ্রীবলদেবই বলরাম, বলভদ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত। সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষবিষ্ণু – সেই বলভদ্র প্রভুর অংশ ও কলা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ সেই নিত্যানন্দাখ্য-রামের শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিয়ে তাঁর বন্দনা করেছেন। শ্রীবলদেব-তত্ত্বকে প্রণাম জানাতে গিয়ে স্তব করেছেন,—

"হলায়ুধ নমোহস্তু তে নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল॥
বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে নমস্তে ধরনীধর।
প্রলম্বারে নমোহস্তু তে ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্বজ॥"

শ্রীবলদেব কৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ হয়েও কৃষ্ণের সেবাবিগ্রহ

যাঁকে হলায়ুধ বলেছেন—এঁর আয়ুধ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম নয় —ইনি হলধর মুষলধর। ইনি প্রলম্বাসুরের নিধনকারী। ইনি কৃষ্ণ– জগন্নাথ-জগদীশ। যিনি জগন্নাথ, তিনিই বলভদ্র। ইনি শ্রীক্ষেত্রে দুটি মূর্তি ধরে পাশাপাশি বসেছেন। "কেশবধৃত–হলধররূপ জয় জগদীশ হরে।" কৃষ্ণই কেশব। কেশবই বলদেব। ইনি কৃষ্ণের দ্বিতীয় রূপ— দ্বিতীয় বিগ্রহ। ইনি কোন দেবতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব নন; ইনি কৃষ্ণের প্রকাশ-

বিগ্রহ–বিলাস-বিগ্রহ। আর একটি মজার কথা এই–ইনি সেবা-বিগ্রহ এবং নিজে নিজেরই সেবা করছেন। নিজেই সেব্য ও সেবক অর্থাৎ সেব্য-সেবক একই ব্যক্তি। যেমন নিজে নিজেরই মাথা টিপছে। কৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ হয়েও, কৃষ্ণ হয়েও ইনি কৃষ্ণের সেবা-বিগ্রহ রূপ ধরেছেন। কৃষ্ণের এটি অদ্ভুত লীলা। কৃষ্ণ নিজেই অন্যরূপ ধরেছেন। লীলার পুষ্টিসাধনের জন্য তিনি বলদেবকে পৃথকভাবে প্রকট করেছেন। তাই কৃষ্ণাভিন্ন বলদেব। কৃষ্ণ তাঁর ঐ দেহে বিলাস করেন। আর তিনি কৃষ্ণের সেবাবিগ্রহ—তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা-বিধানকারী।

দ্বাপরে কৃষ্ণ-লীলায় যিনি শ্রীবলদেব, ত্রেতাতে শ্রীরামলীলায় তিনি লক্ষ্মণ। শ্রীরামচন্দ্র যখন ত্রেতায় অবতীর্ণ হলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁর অনুজ হয়ে এলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় বিগ্রহ – বলদেব প্রভুর মত তিনিও জীবকোটি নন, তিনি বিষ্ণুকোটি। বলদেব ও লক্ষ্মণ উভয়েই সেবাবিগ্রহ। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের সেবাপরায়ণতার মূর্ত বিগ্রহ। অনুজের জীবন অগ্রজের সেবায় উৎসর্গীকৃত। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বাধা পেলেন। তাই সেবায় তাঁর স্ফূর্তি হলো না। অবশ্য সেবার ফলটা সেব্যই পান। সেব্যের সুখবিধান ও তাঁর ইন্দ্রিয় তর্পণই সেবার উদ্দেশ্য। সেবাটা যদি না হয়, তাহলে সেবকের মনে গভীর ব্যথা জাগে। সেবাবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থ হয় না বলেই সেবকের হৃদয়ে অতৃপ্তি থেকে যায়। তিনি চান কায়মনোবাক্যে প্রভুকে নন্দিত করতে। যদি তা না পারেন, তাহলে ভীষণ অসুবিধা। তিনি অনুজ। ছোট ভাইকে বড় ভাই-এর আদেশ মেনে চলতে হয়। নীতির বিচারে – ছোট ভাই বড় ভাই-এর কথা অমান্য করতে পারে না।

নীতি-পালন, নীতি–সংরক্ষণ, সত্য-রক্ষা ও প্রজানুরঞ্জনই রামলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য

এই রামলীলায় নীতি-পালন, নীতি-সংরক্ষণ অন্যতম উদ্দেশ্য। সত্য-পালন—প্রজানুরঞ্জনও তাঁর নীতি। নীতিকে কোথাও violate (ভাওলেট-লঙ্ঘন) করেন নি। Ethical Principle (ইথিক্যাল

প্রিন্সিপ্যাল—নৈতিক নিয়ম) এবং morality (মরালীটি-নীতি) সুষ্ঠুভাবে পালন করবার জন্য, নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন করা রামলীলার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। অযোধ্যায়, লংকায়, দণ্ডকারণ্যে, তাড়কা-নিধনে – যেখানে যত লীলা করেছেন, কোথাও নীতির লঙ্ঘন প্রকাশিত হয়নি। জগতে নীতি—পালনের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করবার জন্য তিনি অবতীর্ণ। জীব-কল্যাণের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। এই লীলার পুষ্টি-সাধনের জন্য লক্ষ্মণকেও নীতির কাছে নতি-স্বীকার করতে হয়েছে। এইজন্য তাঁর সেবাতে বিঘ্ন বা বাধা উপস্থিত করলেও, সেবায় অতৃপ্তিবোধ করলেও মূলনীতি-পালনের জন্য তাঁকেও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মানতে হয়েছে। তা না হলে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাপুষ্টি হয় না। লক্ষ্মণ যদি অন্যভাবে চলেন, তাহলে সেবা ঠিক হলো না। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালন করতে গিয়ে লক্ষ্মণকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে হয়েছে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ করতে হয়েছে। অগ্রজ রামচন্দ্র অনুজকে যে আদেশ করেন, তা লঙ্ঘন করলে নীতি থাকে না। তাতে হয়ত সেবার সৌষ্ঠব হয়, প্রীতির উৎকর্ষ বাড়ে; কিন্তু নীতি রক্ষিত হয় না। প্রীতিকে বড় করা রামলীলার উদ্দেশ্য নয়। লক্ষ্মণ তাঁর প্রতিময়ী সেবায় প্রীতির স্ফুর্তির ব্যাঘাত দেখলেও নীতির প্রাধান্য দিয়েছেন। সীতাদেবী নিরপরাধা, তাঁর চরিত্র নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক। তথাপি প্রজানুরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বনে বিসর্জন দিয়েছেন। বনে ছেড়ে আসার ভার পড়লো লক্ষ্মণের উপর। প্রেমের দিক দিয়ে বিচার করলে এই বিরহ বা এই বিসর্জন অন্যায়। প্রীতির দিক দিয়ে এর কোন justification (জাস্টিফিকেসান – ন্যায্যতা) নেই। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে বিচার করলে এটা ঠিক। কারণ শ্রীরামচন্দ্র রাজা। তাঁর চরিত্র দেখে প্রজাগণ কটাক্ষ করবে কিংবা দুর্নীতির প্রশ্রয় নেবে —এ হতেই পারে না। প্রীতির দিক দিয়ে অবিচার হলেও রাজ্যে নীতি-সংরক্ষণের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিরপরাধা জেনেও বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। সীতাদেবীও কোন প্রকার revolt (রিভোল্ট – বিদ্রোহ)

করেননি। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলতে পারতেন, —“তুমি ত আমাকে অগ্নিপরীক্ষা করিয়ে আমার পবিত্রতার পরিচয় পেয়েছ, আবার বনবাস কেন?” কিন্তু তিনি তা বলেননি।

এ সব সীতাদেবী জানেন, লক্ষ্মণও জানেন ; সব চেয়ে ভাল জানেন শ্রীরামচন্দ্র। সব জেনেও বনবাস। যে লীলা করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন ; সেদিক থেকে ঠিকই হয়েছে। লক্ষ্মণ তাঁর প্রাণের রক্ত দিয়ে রামচন্দ্রের সেবা করেছেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময়ে কৈকেয়ী চেয়ে বসলেন চৌদ্দ বছর বনবাস। দশরথ ‘না’ বলতে পারেন না। কেননা দশরথের নীতি বা প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত হয়। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীও বনে গেলেন। কিন্তু কৈকেয়ী তো লক্ষ্মণের বনবাস চাননি। লক্ষ্মণ তাঁর আরাধ্যদেবের সেবার জন্য বনবাসে স্বেচ্ছায় গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর এই বনবাস লক্ষ্মণের বুকে শেলের মত বিঁধেছে। সবচেয়ে বেশী ব্যাথা লেগেছে দশরথের বুকে। এই নিদারুণ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে দশরথ দেহত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি নীতি ত্যাগ করলেন না। রামচন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করলেন, কিন্তু পিতৃ-বাক্য ত্যাগ করলেন না।

সেবাধর্মের পক্ষে কখনও নীতি বাধাদায়ক। নীতি অত্যন্ত নিম্নস্তরের জিনিষ। যেখানে প্রেম, সেখানে ethical principle (এথিকাল প্রিন্সিপ্যাল – নৈতিক শিক্ষা বা morality (মরালিটি – নীতি)-র দাম কতটুকু? প্রেম-সেবার কাছে নীতিগুলো কিছু নয়। রামের আদেশে সীতাদেবী বনে কেন যাবেন ? না—নীতি পালনের জন্য। রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন—“আমি যে জন্য অবতীর্ণ হয়েছি, তুমি তো তা জানো। তোমাকেই সীতাদেবীকে বনে দিয়ে আসতে হবে।” অগ্রজের এই সুকঠিন আদেশে তাঁর হৃদয় ভেঙে গেছে, চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এসেছে। তথাপি সীতাদেবীকে বাল্মীকির তপোবনে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি নীতিপরায়ণতার বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। এ ব্যথা লক্ষ্মণ ভুলতে পারেননি।

ত্রেতায় যিনি অনুজ লক্ষ্মণ, দ্বাপরে তিনিই অগ্রজ বলদেব

দ্বাপরে তুমি কৃষ্ণ হয়ে যাচ্ছো, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। হে ঠাকুর! এবার আর আমি অনুজ হয়ে যাচ্ছি না। তোমার অগ্রজ অর্থাৎ পূর্বজ হয়ে যাচ্ছি। অনুজ হয়ে এলে অসুবিধা। ত্রেতায় অনুজ হয়ে এসে তোমার নীতিপরায়ণতার প্রতি বিদ্রোহ করতে পারিনি। আমাকে যে রকম ব্যথা দিয়েছ, এতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সীতাদেবীকেও অন্যায় আদেশ-পালনে বাধ্য করিয়েছ। এবার আমার কথা শুনতে হবে। আমার কথামত তোমাকে চলতে হবে। তাই দ্বাপরে লক্ষ্মণ "দাদা" হয়ে এলেন। ব্রজবাসীদের স্নেহের ডাক দাউজী। তিনি এবার সকলের "দাদা"। তিনি সেবাবিগ্রহ – সেবা সৌষ্ঠবের জন্য এবার তিনি অগ্রজ। অগ্রজের কথা অনুজকে মানতে হয়।

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—তিনজন রথে যাবেন। কিন্তু বলরাম বললেন,—"আমি আগে যাই, তুমি অপেক্ষা করো।" এ কিরূপ সেবা? প্রভুকে পিছনে রেখে দাস আগে যায় কেন ? কেননা পথে যদি কোন কাঁটা থাকে, যদি কোন বিপদ আসে; তাহলে তা আমার উপর দিয়েই যাবে। এইজন্য বলদেবের রথ আগে যায়। এইভাবে বলরাম অগ্রজ হয়ে কৃষ্ণের উপর আদেশ জারি করলেন। তোমার আগে আমি যাবো। আমার কথা শুনবে না, তোমায় শুনতেই হবে। এই যে আদেশ—এটি কৃষ্ণের সুখ-বিধানের জন্য, নিজের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য নয়। যখন কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করবেন, তখন বলদেব অগ্রসর হয়ে এলেন এবং বললেন, —"ওকে নিয়ে তুমি চলে যাও, আমি আছি। "বিপদ এলো—লড়াই শুরু হলো। বিবাহ-যাত্রায় মঙ্গল সানাই বাজবার কথা, কিন্তু বেজে উঠলো রণভেরী। বলদেব একে স্তব্ধ করলেন। কংস ডেকেছেন কৃষ্ণকে মল্লযুদ্ধে যোগদান করতে। বলাইকে গতিরোধ করে কে ? বলদেব বললেন,—"কংস পছন্দ করুক না করুক, আমি যাবোই। "কংসবধ-

যাত্রার পথে কন্টক দূর করলেন বলাই। তিনি সর্বত্রই সেবার ভিতরে আছেন এবং সেবাবিগ্রহ হয়ে কৃষ্ণলীলায় পুষ্টি বিধান করছেন।

কৃষ্ণের প্রেমের বাঁশী সুষ্ঠুভাবে বাজানোর জন্যই বলদেব বাজান শিঙ্গা

কৃষ্ণ বাঁশী বাজায়, কৃষ্ণ ধেনুবৎসগুলিকে নিয়ে বনে যায়। মা যশোদার চিন্তার অন্ত নেই। বনের মাঝে কখন কোন অসুর কি বিপদ ঘটায় কে জানে। বলাই তখন এগিয়ে এসে মা যশোদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, — "মা! তোমায় চিন্তা করতে হবে না, আমি তো সঙ্গে যাচ্ছি—ভয় কি? বলাইর শিঙ্গা বেজে উঠে—এর ভিতরে কোন মধুর ভাব নেই। মা যশোদা বললেন,—"তুমি যাচ্ছো, আমি এবার নিশ্চিন্ত।" ধেনুর পাল নিয়ে কানাই আর বলাই বনে যায়। বলাই-এর শিঙ্গা শুনলে দুষ্ট সবাই ভয়ে ত্রস্ত।

Announce (এনাউন্স – ঘোষণা) করছে—যে যেখানে আছ—সাবধান। দুষ্টামি করলে তোমাদের রক্ষে নেই। অসুরগণ হুঁশিয়ার হও। যদি বিপদ ঘটাও, তবে তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য। ইনি কৃষ্ণের মত নবনীত কোমল নন; ইনি বীর – "বলিনাং শ্রেষ্ঠ"। বলাই কৃষ্ণকে সুখে রাখেন, কৃষ্ণ-লীলায় কোন রকম যেন ব্যাঘাত না হয়; - কৃষ্ণের বাঁশী যেন সুষ্ঠুভাবে বাজতে পারে। এমন কি শৃঙ্গার-রসের লীলায়ও আড়ালে থেকে তিনি ব্যাঘাত দূর করেন। দ্বারোয়ানের মত gate (গেট – প্রবেশদ্বার)-এ শিঙ্গা নিয়ে, হল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কৃষ্ণ ধরেছেন বাঁশী, যেন মধুরভাবে বাজতে পারে। বলাই তাই বাজান রণভেরী, কৃষ্ণের বাঁশী বাজানো কালে যেন কোন রসভঙ্গ বা ব্যাঘাত না ঘটে। এইজন্যই তাঁর বীরত্ব, এইজন্যই তিনি হলধর ও মুষলধর। আমি থাকতে কৃষ্ণের সুখের ব্যাঘাত হবে না। এইজন্যই বলদেব প্রভু সেবাবিগ্রহ। অগ্রজ হয়েও লীলার পুষ্টি সাধন করছেন।

ত্রেতায় যিনি লক্ষ্মণ, দ্বাপরে তিনিই বলদেব ও কলিতে তিনিই নিত্যানন্দ

ত্রেতায় যিনি লক্ষ্মণ, দ্বাপরে তিনি বলদেব এবং কলিতে তিনিই নিতাই। কৃষ্ণ উদার মূর্তি ধারণ করে গৌররূপে ভূলোকে এলেন। পাপী, তাপী ও অপরাধী সকলকে উদ্ধার করবার জন্য কৃষ্ণ ঔদার্যলীলা করলেন শ্রীগৌরসুন্দররূপে। তখন বলাই তো আর চুপ করে থাকতে পারেন না। তুমি যখন যাচ্ছ, আমাকে যেতেই হবে। যিনি বলাই, তিনিই এবার নিতাই। এবারও অনুজ নয়, অগ্রজ হয়েই এলেন।

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসূত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।"

ব্রজেন্দ্রনন্দন শচী-নন্দন হলেন, আর এদিকে রোহিনীনন্দন পদ্মাবতী- নন্দন হলেন। এবার নিতাই ঠাকুর অনেক আগে এলেন। ঠাকুর অনেক কিছু লীলা করবেন। তাঁর এই জীবোদ্ধার-লীলায় পিছনে তিনি থাকলেন না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ না করা পর্যন্ত নিতাই ঠাকুর অনেক আগে এলেও চুপ করে রইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আগে এসেও তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন না। তখনও তিনি পরিব্রাজক-বেশে তীর্থদর্শন করছেন। এটা তাঁর ছদ্মলীলা। কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীবাস-অঙ্গনে যেই খোল বেজে উঠেছে এবং কীর্তন শুরু হয়েছে, তখনই নিতাই ঠাকুর তীর্থভ্রমণ ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ–ধামে ছুটে এসেছেন। নাম-প্রেম-বিতরণলীলা সুষ্ঠুভাবেই করিয়ে দিতে হবে। পাপী, তাপী, বিষয়ী, পতিত ও অধম সকলকে এবার 'নামপ্রেম' দান করে উদ্ধার করতে হবে। প্রভু যদি কখনও এই কাজে পিছিয়ে পড়েন, তখনই অগ্রজ নিতাই এগিয়ে যান, তাঁকে লঙ্ঘন করতে নয়—তাঁর মহিমা প্রকাশ করতে এবং প্রস্ফুটিত করতে। যেখানে যত মাতাল, লম্পট, পাপী ও অসৎ আছে— সেখানে আগেই নিতাই ঠাকুর ছুটে যান। এ গৌরলীলায় উভয়েই দয়ার অবতার। এই লীলায় তাঁরা অস্ত্রধারণ করেননি। কিন্তু যখন নিতাই ঠাকুরের ললাটের রক্তে নবদ্বীপের মাটি ভিজে যায়, তখন আত্মভোলা শ্রীগৌরসুন্দর সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করেন। তিনি হুঙ্কার করে বলে উঠেন,— "এদের শিরচ্ছেদ করো"।

তখন নিতাই ঠাকুর তাঁর গতিরোধ ক'রে বললেন,— "হে ঠাকুর! তুমি কি এবার চক্র ধরবার জন্য এসেছ নাকি ? তুমি কত বীর, কত নিহত করতে পারো, এইটা এবার দেখাতে এসেছ নাকি?" এই বলে তিনি চক্রকে রোধ করলেন। বড় ভাই ছাড়া শ্রীগৌরসুন্দরের চক্র কে রোধ করতে পারে? শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে নীলাচলের দিকে যাত্রা করেছেন। নিতাই ঠাকুর তাঁর দণ্ড তিন টুকরো ক'রে ভেঙে দিলেন। আমার প্রভু দণ্ড বয়ে বেড়াবেন—এ হতেই পারে না। আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে। গৌরসুন্দর যখন দণ্ড চাইলেন, তখন নিতাই ঠাকুর এগিয়ে এসে বললেন,— "আমি তোমার দণ্ড ভেঙে দিয়েছি, কি শাস্তি দেবে দাও।" শ্রীগৌরসুন্দর বললেন,— "আমি সন্ন্যাসী, আমার হাতে দণ্ড না দেখলে লোকে হাসবে, বিদ্রূপ করবে। তুমি কি লোক হাসাতে চাও?" নিতাই ঠাকুর বললেন,— "তোমার ওসব কথা রাম অবতারে অনেক শুনেছি, অনেক পালন করেছি। আর লোকে যদি হাসে, তবে আমাকে লক্ষ্য করেই হাসবে। কেননা আমি তোমার দণ্ড ভেঙে দিয়েছি। তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তুমি পাকা বৈরাগী অর্থাৎ তুমি সন্ন্যাসধর্ম নিখুঁতভাবেই পালন করছো। তোমাকে কেউ ঠাট্টা করবে না। "গৌরসুন্দরের দণ্ড কে ভাঙতে পারে? নিতাই 'দাদা' বলেই ভাঙতে পেরেছেন।

লক্ষ্মণ ও বলদেব উভয়েই সেবাবিগ্রহ, কিন্তু বলদেবে সেবার পরাকাষ্ঠা প্রস্ফুটিত

যিনি লক্ষ্মণ, তিনি বলদেব এবং তিনিই নিতাই। শ্রীরামচন্দ্র অখিল-রসামৃতসিন্ধু নন, তিনি বহুজনবল্লভ নন, তিনি একপত্নীধর – নীতিপরায়ণ। পারকীয় রস-বৈশিষ্ট্য এঁর লীলায় নেই এবং রাসলীলাও নেই। বামন, নৃসিংহ ও বরাহলীলায় এই বৈশিষ্ট্য নেই। কৃষ্ণই শ্রীরামচন্দ্র, বলদেবই লক্ষ্মণ। বলদেব আর লক্ষ্মণ দুজনেই সেবাবিগ্রহ। কিন্তু এই সেবার ঔজ্জল্য লক্ষ্মণে যেরূপ ফুটেছে, বলরামে তার অনন্তকোটি বেশী ফুটেছে। এটা একটা দল-বিশেষের দোলো

কথা নয়। প্রেম-সেবা-রসের দিক দিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দু'এর তুলনাই হয় না। কৃষ্ণ রসময় ও রসিকশেখর। এই দিক দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনাই হয় না। কৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্তি, কৃষ্ণলীলায় লক্ষ্মণ ভাবের পরাকাষ্ঠা বলদেব প্রভু। কলিযুগেও গৌর ও কৃষ্ণ একই। কৃষ্ণই ঔদার্যলীলায় গৌর-মূর্তি। মধুর লীলায় গৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ। মধুর গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ, উদারকৃষ্ণ গৌর। মাধুর্যলীলায় ও ঔদার্য-লীলায় বলরাম ও নিত্যানন্দ উভয়েই সেবাবিগ্রহ। নিতাই ঠাকুর প্রকটিত হয়ে গৌরসুন্দরের ঔদার্যলীলাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করেছেন। গৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-লীলায় তিনি প্রধান প্রচারক সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর মহাদানশীলতায় জগৎ মুগ্ধ।

বলদেব – নিত্যানন্দের ধারা গুরুরূপে চিরপ্রবহমান

ত্রেতায় লক্ষ্মণের লীলা, দ্বাপরে বলদেবপ্রভুর লীলা, কলিতে নিতাই ঠাকুরের লীলা হয়ে গেছে। এটা একটা past history। কলিকালে পাঁচশ বছরেরও বেশী আগে নিতাই ঠাকুরের আবির্ভাব। সবই অতীত ঘটনা – historical fact (হিষ্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট—ঐতিহাসিক সত্য)। আজকে শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব–লীলা কি ভাবে হচ্ছে? লক্ষ্মণ অপ্রকট হননি, বলরামরূপে এসেছেন। বলরাম অপ্রকট হননি, নিতাইরূপে এসেছেন। নিতাই অপ্রকট হননি গুরুরূপে এসেছেন। বলাই–এর লীলাই হচ্ছে, কিন্তু দেখতে এক রকম নয়। ভঙ্গীটা বদলে গিয়েছে। যেমন বলাই আর নিতাই-এর ভঙ্গী এক নয়। তাই বলদেব প্রভুর আবির্ভাব-লীলা শেষ হয়ে যায়নি, আজও চলেছে—অচ্ছেদ্য ও অব্যাহত গতিতে।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।"

নিতাই ঠাকুরের আবির্ভাব-লীলা কি ভাবে হচ্ছে? নিতাই ঠাকুরের গুরুরূপে আবির্ভাব হচ্ছে। গুরুদেবই অভিন্ন নিত্যানন্দ। নিতাই ঠাকুরের শক্তি নিয়ে গুরুদেবের আবির্ভাব নিত্য। এখন বলদেব প্রভুর আবির্ভাব নেই, নিতাই ঠাকুরের প্রাকট্য নেই। তাদের লীলা স্তব্ধ হয়ে

গিয়েছে,—একথা সত্য নয়। গুরুদেবই বলদেব-রূপে, নিত্যানন্দ-রূপে এসে আশ্রিতজনকে গৌরসুন্দরের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। গুরুরূপে তাঁর নিত্য আবির্ভাব-লীলা হচ্ছে। ভাগ্যবান শিষ্যের কাছে ও শরণাগত জীবের চিত্তে এই নিত্যলীলা স্ফুরিত হয়। সকলেই এই নিত্যলীলার রসাস্বাদন করতে পারে না। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা যেমন সবাই দেখতে পায়নি, তেমনি গুরুদেবই যে নিত্যানন্দ—এই লীলা সবাই উপলব্ধি করতে আজও পারবে না। বলদেবাভিন্ন গুরুদেবের প্রাকট্যশক্তির খেলা আজও চলছে, নিত্যকাল চলতেই থাকবে।—এ ধারা কোনদিন রুদ্ধ হবে না – ইহা সিদ্ধান্ত।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

(শ্রীচৈ চ আ ১।৪৫)

"নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাই- চরণ দু'খানি।।"

(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)

সদগুরুরূপে এই ধারা চির-প্রবহমান। গুরুদেব—সেবাবিগ্রহ। ভগবানের সেবা কি ঠান্ডা হয়ে রুদ্ধ হয়ে যাবে? না—সেবা চলতেই থাকবে। সেবা চালাবে কে? ভগবানের সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব এই সেবা প্রকাশ করে থাকেন। জীবহৃদয়ে তিনি এই কৃষ্ণ-সেবাবুদ্ধি জাগ্রত করেন। যদি গুরুজন কেউ না থাকে, সেবক না থাকে, তাহলে সেবাকে কে জানাবে? সেবা নিত্য, সেবক নিত্য। শ্রীগুরুদেব ভগবানের সেবা সর্বক্ষণ করছেন।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম॥"

(শ্রীগুর্ব্বাষ্টক—৭)

গুরুদেব ভগবৎপ্রেষ্ঠ ও নিত্যানন্দ-শক্তি,
গুরুদেব কৃষ্ণের সেবাবিগ্রহ

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম—ভগবৎ-প্রেষ্ঠ। তাঁর ভিতর দিয়েই সেব্য প্রকাশিত হন। তাই গুরুদেবের প্রাকট্যই নিত্যানন্দের প্রাকট্য—ইহাই আবার বলদেব—প্রাকট্য সেই নিত্যানন্দ শক্তি গুরুদেবের ভিতরে প্রকাশিত হয়ে সেই ব্যাপার নিত্য চালিয়ে যাচ্ছেন। যাঁকে গুরুদেব বলছি, তাঁর সঙ্গে যদি বলদেব নিত্যানন্দের সম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ তিনি যদি বলদেব শক্তি না হন, তাতে গুরুত্ব আসবে কোথা থেকে? তুমি তাঁকে গুরু বলছ কি ক'রে? যেখানে গুরুত্ব নেই, সেখানে মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা দান হতে পারে, কিন্তু নিত্যানন্দ-শক্তির আবির্ভাব হবে না। যেখানে বলদেবের শক্তি ফুটে ওঠেনি, সেখানে গুরুত্বের অভাব। আর যেখানে যথার্থ সদগুরু, সেখানে নিত্যানন্দের শক্তি প্রকাশিত হন। এ কথা কবির কল্পনা নয় বা বক্তৃতার কথা নয়; এটা একটা সিদ্ধান্ত। বলদেবের আবির্ভাব নিত্য, গুরুদেবের আবির্ভাবও নিত্য। এই যে তাঁর আবির্ভাব, তা অনুগত শিষ্যের হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয় এবং কৃষ্ণকে প্রকাশিত করেন। নিত্যানন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে গুরুদেবের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। নিতাই ঠাকুর গৌর দেওয়া ঠাকুর। তিনি আছেন বলেই জীব হরিসেবা পেতে পারবে। কৃষ্ণ তাঁর নিজ-জনকে নিত্য প্রকট রাখেন – ভক্তি-যোগ সংরক্ষণের জন্য এবং তাঁর সেবার ঔজ্জ্বল্য বিস্তারের জন্য। গুরুদেব তাঁরই প্রকাশবিগ্রহ বা সেবাবিগ্রহ। এটা কৃষ্ণের স্বার্থ। কেননা গুরুদেব না থাকলে তাঁর সেবা পরিচালনা করবে কে? গুরুদেবের নিত্য আবির্ভাব থাকে বলে জীব সিদ্ধিলাভ করতে পারে এবং দৈবী মায়ার বন্ধন থেকে তার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বলদেবাভিন্ন গুরুদেবই মায়ার গ্রাস থেকে জীবকে উদ্ধার করতে সমর্থ

বলদেবাভিন্ন গুরুদেব শিষ্যের মায়ার দৌরাত্ম্য নাশ করেন। এ কথা শিষ্যেরা অনেক সময় বুঝতে পারে না। কখনও কখনও তিনি কৃপা-পরবশ হয়ে ইহা শিষ্যদের জানিয়ে দেন। তখন কোন কোন ভাগ্যবান শিষ্য ইহা বুঝতে পারে। আবার কেউ কেউ তাঁকে বুঝতে

পারে না। শিশু যেমন মাতা কি উপকার করে, তা বুঝতে না পেরে পদাঘাত করে, কোলে প্রস্রাব ক'রে দেয়। কিন্তু মা স্নেহের আতিশয্যে সবই সহ্য করেন। গুরুদেবও সেইরূপ স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী মাতার ন্যায় কাজ করে থাকেন। মায়ার শক্তি নেই গুরুদেবের সঙ্গে বিরোধ করে।

"ইহারে (মায়ারে) করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু (গুরু)-কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥"
(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)

গুরুপাদপদ্মের কৃপা ও সেবা ছাড়া হরিভজন অসম্ভব

গুরুদেব যাঁকে কৃপা করবেন তাঁকে মায়াবৈভব বাধা দিতে পারবে না। গুরুপাদপদ্ম ইচ্ছা করলেই জীবকে উদ্ধার করতে পারেন। যত পাপ, অপরাধ ও অনর্থ থাকুক না কেন, গুরুদেব তাঁর অহৈতুকী কৃপায় তা নাশ ক'রে দেন। ভক্তিপথ যিনি নিষ্কপটে গ্রহণ করেছেন, তাঁর যত কিছু দোষ-পাপ অপরাধ থাকুক না কেন – সব তিনি ক্ষমা করেন। ক্ষমার সঙ্গে দয়ার সম্পর্ক আছে। যার দোষ বা অপরাধ আছে, তাকে ক্ষমা করা যায়; ক্ষমা করে তাকে দয়া করা যায়। নিতাই ঠাকুর যদি দোষ ক্ষমা না করতেন, তাহলে কেউ উদ্ধার হতে পারতো না। নিতাইর ক্ষমা আছে কার প্রতি? রাবণ, কংস ও শিশুপালের মত বিরোধীর প্রতি নহে। যে জীব দুর্বল, অনুতপ্ত, দুঃখী অথচ ভক্তিসাধন করতে চায়, সেখানে গুরুদেবের ক্ষমা। গুরুদেব দীন-দয়াল, তাই সেখানে ক্ষমা না করলে চলে না। শিষ্য বহু চেষ্টা করছে ভক্তিপথে চলতে, কিন্তু পারছে না। প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহ্য করতে পারে না। এরূপ শিষ্যকে গুরুপাদপদ্ম নিশ্চয়ই ক্ষমা করেন এবং কৃপাও করেন। যেখানে মতলব খারাপ, বিদ্বেষ মনোভাব – সেখানে ক্ষমার প্রকাশ নেই। বল দেবাভিন্ননিত্যানন্দ গুরুদেব ক্ষেত্র বিশেষে নিষ্ঠুর হন, কিন্তু স্বভাবতঃই তাঁর হৃদয় কুসুমের চেয়েও কোমল। রাবণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির মত যারা দ্রোহী, তারা গুরুপাদপদ্মের কৃপা বুঝতে পারে না। কিন্তু গুরুপাদপদ্মের কৃপা না হলে জীবের চলে না। যে গুরুদেবের গুরুত্ব

দর্শন করছে না, সে বঞ্চিত আছে। যে গুরুকে মানে না, সে ঠকছে। তার জীবনটাই বৃথা। যাঁর হৃদয়ে নিত্যানন্দ বিরাজ করছে, তাঁকে না মানা, অবমাননা করা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। গুরুদেবের প্রতি যাদের ভালবাসা নেই, প্রীতি নেই, সেবা নেই, যারা মানে না, স্বীকার করে না এবং অসূয়া পোষণ করে; তাদের কখনও হরিভজন হবে না। যার এরূপ কোন বাধা নেই বা দৌরাত্ম্য নেই, তার কখনও পতন নেই, স্খলন নেই – ভক্তিপথ থেকে বিচ্যুতি নেই।

—❖—

ভগবানের সেবাই জীবের চরম সার্থকতা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা ক'রে মঠের বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ—মহোৎসবে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার কিছু কথা শ্রবণ করছি।

"নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৩।৫৬)

কর্তব্য কর্ম ও পরহিত কর্ম উভয়েই ধর্ম

আমরা সকলেই কিছু না কিছু কর্ম ক'রে থাকি। এই কর্ম আমরা সাধারণতঃ নিজের জন্য ক'রে থাকি অর্থাৎ কর্ম ক'রে তার ফল ভোগ করবার অধিকার আমাদের আছে। কর্ম করলেই তার একটা ফল আসে এবং সেই ফল কর্মকর্তারই প্রাপ্য। অনেকে তার স্ব স্ব যোগ্যতা ও শ্রম ইত্যাদির দ্বারা যে কর্ম করেন, সেই কর্মের ফল নিজেই সমস্ত সম্ভোগ করেন। ইহা স্বার্থপর কর্ম। ইহার প্রশংসা নাই। কিন্তু কর্ম ক'রে তার যদি কিছু ফল অন্য কাউকে ভাগ দেওয়া হয়, তাহলে ভাল হয়। অনেকেই সেটা দিয়েও থাকেন। কিন্তু অনেকে আবার সেই ফলটা ভোগ না

ক'রে নিজের পরিবারবর্গের ভিতর অর্থাৎ মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী-আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিদের কিছু ভাগ দেন অর্থাৎ নিজে কিছু ত্যাগ স্বীকার করেন। নিছক স্বার্থপর কর্ম অপেক্ষা পরিবারের স্বার্থের জন্য কর্মটি একটু ভাল। এরূপ কর্মকে ধর্মও বলা হয়; গার্হস্থ্যধর্ম – কর্তব্য করা রূপ ধর্ম। কিন্তু ইহা তো একপ্রকার স্বার্থপরতা। কেউ কেউ আরও একটু সীমা বাড়িয়ে তার পরিবারের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে প্রতিবেশীর কাছে, দেশবাসীর কাছে বা পৃথিবীর অন্যান্য স্বষ্ট জীবকেও তাঁর নিজের উপার্জিত কর্মফলকে বিতরণ করেন – charity (চ্যারিটি – দাতব্য) করেন। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যত্ন ক'রে নিজেই যে ফল পেতে পারতেন, সেটা তিনি ত্যাগ স্বীকার ক'রে অন্যকে কিছু দিচ্ছেন। এই যে পরার্থপরতা, charity (চ্যারিটি – দাতব্য) বা social service (সোস্যাল সারভিস) এটা ধর্ম। অপরের হিতের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে ধর্ম বলে। কর্ম যদি ধর্মের উদ্দেশ্যে না হয়, যত বড় যোগ্যতা দিয়েই তা হোক না কেন – সে কর্মের প্রশংসা নেই। কর্মের ফল নিজে আত্মসাৎ করছি, এটা স্বার্থপরতা – এটা ধর্ম নয়। ধর্মের জন্য কর্ম করলে কিছুটা প্রশংসার কথা আছে। ধর্ম হবে কোনটা? – যদি পরার্থে কর্মের ফলটা দান করা যায়। নিজে খাই দাই থাকি – এমন নিছক স্বার্থপরতার কোন প্রশংসা থাকতেই পারে না। নিজে সব খাচ্ছে না – পরিবারবর্গ, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী বা পৃথিবীর সকলের মধ্যে উপার্জিত সম্পদ ভাগ ক'রে দিলো। এখন থেকেই ধর্ম আরম্ভ হলো। Social duties, humanitarian Service (সোস্যাল ডিউটিস, হিউম্যানিট্যারিয়ান সারভিস – সামাজিক কর্তব্য, মানবিক সেবা), রূপ ধর্ম।

আসক্তিযুক্ত ধর্মে বন্ধন অনিবার্য

কিন্তু এই কর্তব্য কর্ম বা পরহিত কর্ম যদি বৈরাগ্যের সহিত করা না হয়, তাহলে এরও খুব বেশী প্রশংসা নেই। কর্মকর্তা যদি আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্ম না করেন, জীবসেবা, দেশসেবা ইত্যাদি পরহিতার্থে কর্ম হলেও

যদি আসক্তির সঙ্গে করা হয়, তাহলে এর ফলটা মঙ্গল উদয় করাবে না ; বন্ধন এনে দেবে। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ করছি – এতে যদি অভিমান ও অহমিকা থাকে ; তাহলে এই কর্তব্য কর্ম ও বন্ধন এনে দেবে। ধর্ম যদি অনাসক্ত হয়ে না করি, তাহলে তার ফলটা খুব শুভ হবে না। আমি দান করলাম – এ দান ক'রে যদি অহংকার বা দাম্ভিকতা মনে জাগে, তাহলে এতে বন্ধন অনিবার্য। গীতাতে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার কথা আছে। ধর্ম যদি বৈরাগ্যে পর্যবসিত না হয়, তাহলে "অলং ন শোভতে" অর্থাৎ মঙ্গল বা শান্তি আসবে না। আসক্তি-রহিত কর্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম। আসক্তি-রহিত কর্ম utopian (ইউটোপিয়ান) নয়—এটা জীবের পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত আরও উঁচু কথা বলেছেন। নিষ্কাম কর্মযোগকেও best (বেষ্ট – সর্বশ্রেষ্ঠ) বা highest (হাইয়েষ্ট – সর্বোচ্চ) বলে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দেননি। নিষ্কাম কর্মটা যদি "তীর্থপাদের" সেবাতে পর্যবসিত না হয়, তাকে প্রশংসা যোগ্য বলে বিবেচিত করা হবে না। তীর্থপাদের সঙ্গে আসক্তিযুক্ত হয়ে অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধে অনুরাগযুক্ত হয়ে তাঁর সেবা করলে শোভা পাবে।

"নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম।"

তীর্থপাদ অর্থাৎ বিষ্ণু বা ভগবান। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যদি কর্ম না করা হয়, তাহলে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হবে না। আমরা সকলেই কর্ম করছি পরিবারের জন্য হোক কিংবা দেশের জন্য হোক – এতে আমরা satisfied (স্যাটিসফাইড – সন্তুষ্ট) আছি। জীবনে আর কি সার্থকতা থাকতে পারে? এই ideology-কে (আইডিওলজি – আদর্শ) এই (Conception)-কে (কনসেপশ্যান – ধারণা) শ্রীমদ্ভাগবত আঘাত করছেন। এর উপরের কথা শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিচ্ছেন।

পরহিত কর্ম অনিত্য দেহ ও মন ভূমিকায় পৌঁছায়, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদানে অসমর্থ

জীবের জীবনে যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বস্তু—যেটা highest good, (হাইয়েষ্ট গুড—সর্বশ্রেষ্ঠ ভাল) সেটা সকাম কিংবা নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠানে হয় না। এই রকম কথা শুনতে সাধারণতঃ আমরা অভ্যস্ত নই। এটা একটা বিপ্লবাত্মক কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে আমি আপনাদের কাছে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জীবের সাময়িক উপকার হলেও এটাতে চরমতম মঙ্গল লাভ হয় না কেন ? সেটাই বিচার ক'রে আলোচনা করছি। দেশসেবা, সমাজসেবা, জীবসেবা, জননীর সেবা কিংবা জন্মভূমির সেবা—এই সমস্ত পরোপকার—কর্মে আমরা অভ্যস্ত এবং এগুলিকে ভাল জিনিষ বলে আমরা জানি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন যে, এগুলি সুষ্ঠুরূপে করলেও জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ হবে না। আমি দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের জন্য অন্নছত্র খুললাম, জলের সুবিধার জন্য জলাশয় খনন করলাম এবং হাসপাতাল তৈরী করলাম। এতে অনেক লোকের উপকার হবে কিংবা স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ডিবেটিং ক্লাব, লাইব্রেরী ইত্যাদি করার জন্য অর্থ, সময়, যোগ্যতা সমস্ত ব্যয় করলাম; —এতে ধর্ম হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যে জলাশয় খনন করছি, হাসপাতাল তৈরী করছি, বুভুক্ষ মানুষকে অন্নদান করছি—এই যে উপকারগুলি করছি—এই উপকারগুলি জীব কোন ভূমিকায় গ্রহণ করছে? এই উপকারগুলি জীবের কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে? এই সমস্ত উপকার জীবের শারীরিক উপকার। এই উপকারগুলি জীবের অনিত্য দেহই পাচ্ছে। জলাশয় হলো—আমি ভাল জল খেতে পাবো, আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। হাসপাতাল হলে ব্যারাম ভাল হবে—এতে কিন্তু কষ্ট নিবারণ হবে, ঠিকই। কিন্তু সেটা কোথায় নিয়ে পৌঁছাচ্ছে? বুভুক্ষ মানুষ অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে—তার ক্ষুধা কোথায়? না—দেহে। আমি যে ইউনিভার্সিটি, কলেজ-লাইব্রেরী করছি – এতে অনেক অজ্ঞ বা মূর্খের জ্ঞান হচ্ছে; তারা অনেক বিষয়ে আলোকের সন্ধান পাচ্ছে। কিন্তু এই জ্ঞান কোন ভূমিকায় গ্রহণ করছে? না – মন ভূমিকায়। এতে তার মানসিক intellectual culture (ইনটেলেকচুইয়াল কালচার—

মানসিক কৃষ্টি) হচ্ছে—মনের development (ডেভলাপমেন্ট—উন্নতি) হচ্ছে। তার brain (ব্রেন—মগজ) খুব সতেজ হচ্ছে।

চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিশ্লেষণ

আমাদের এখানে বিচার করতে হবে – মানুষ বলতে কি বোঝায়? তার দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। কিন্তু এর নাম কি মানুষ? সাংখ্য–দর্শনকার কপিল জীব-তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে দেহ–সংক্রান্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম – এই হলো পঞ্চমহাভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ – এই হলো পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক – এই হলো পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ – এইগুলি হলো পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; এর উপর মন, তার উপর বুদ্ধি, তার উপর অহংকার – আর একটি হলো মহত্তত্ত্ব। এই মোট চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। জীবতত্ত্ব–সম্বন্ধে কপিলের এই বিশ্লেষণ খুবই বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ক'রে বিচার করলে বা তার সমষ্টি করলেও একটি সমগ্র জীব হয় না। এই যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম – আধুনিক ভাষায় এই যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি elements (এলিমেন্টস – মৌলিক পদার্থ)এই যে সমস্ত অণু–পরমাণু - এই যে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করলে জীবের একটা অংশ দর্শন হলো পুরো অংশ দর্শন হবে না। কিন্তু এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব একত্রিত করলেই কি একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে যাবে? হয় না – হতেও পারে না। এটা বোঝাতে খুব বেশি যুক্তি বা দার্শনিক কতকগুলি তত্ত্বের অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। বিংশতি তত্ত্ব কতকগুলি স্থূল। আর মন, বুদ্ধি, অহংকার – এগুলি সূক্ষ্ম কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও এগুলি জড়। যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি হাত পা দিয়ে ধরা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়–দ্বারা ধরা যাচ্ছে। কিন্তু মনকে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু তাহলেও এগুলি সব

জড়। এগুলির উপর laboratory-তে (ল্যাবরেটারি – পরীক্ষাগার) experiment (এক্সপেরিমেন্ট – পরীক্ষা) চলে। কিন্তু এই সব জড় জিনিষগুলি একত্রিত করলে একটা মানুষ বা জীব হয় না। এর পিছনে আর একটা জিনিষ আছে—যে জিনিষটা থাকার জন্য এই সমস্ত স্থূল জড় বা সূক্ষ্ম জড় অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি, অহংকার সক্রিয় হচ্ছে। যে জিনিষটা থাকার জন্য এই হাতটা নড়ছে, জিহ্বাটা কথা বলছে, মনটা সংকল্প করতে পারছে এবং বুদ্ধি সৎ-অসৎ বিচার করতে পারছে, অহং এই বোধটা আসছে। যে জিনিষটা থাকার দরুন সব কিছু function (ফাংসান—কার্য) করেছে, সেই জিনিষটাকে বাদ দিয়ে যদি আমরা জ্ঞান-ভাণ্ডার সাজাই; তাহলে সেটা অত্যন্ত partial (পারশ্যাল—পক্ষপাত) হলো। অতএব মূল জিনিষের উপর হাত পড়া চাই। আমি শরীরের উপকার করি—আমি যদি চোখের lungs-এর (লাংস—শ্বাসযন্ত্র বুদ্ধির উপকার করি—এই উপকারগুলি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নিতান্ত অল্পক্ষণের জন্য হলেও আমার সঙ্গে এগুলির একটা সম্বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এই জিনিষগুলির যে উপকার, এই জিনিষগুলির সম্বন্ধে যে জ্ঞান বা এই জিনিষগুলির শক্তির যে প্রসারণ, সেগুলি একেবারে নিরর্থক হয় না বটে, কিন্তু ইহাতে জীবের সমগ্রতার কথা নাই। কিন্তু বাস্তবিক এই শরীরটার এমনই ধর্ম যে, এটা ধ্বংসশীল। এই শরীরের প্রতি যতই যত্ন লওয়া হোক, তথাপি একে ১০০/২৫ বছরের বেশী বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। মন বা সংকল্প-বিকল্প করছে, বুদ্ধি বা বিচার করতে পারছে, আমি যে মনে করছি—আমি বাঙালী, আমি পুরুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি মানুষ—এই যে আমার অহংবোধ—এটা নিত্য নয়। আমি এখন মনে করছি যে—আমি বাঙালী, কিন্তু আমার এই দেহান্তরের পর হয়ত আর এক জায়গায় গিয়ে আমি জন্মাবো তখন আমি মনে করব—আমি আমেরিকান বা রাশিয়ান। আমি স্ত্রী বা পুরুষ, দেবতা বা গন্ধর্ব। সুতরাং এই যে আমার অহংবোধ, এটা নিত্য নয়। এইরূপ দেহ, মন, বুদ্ধি বা অহং-এর যত উপকার করি না কেন, এগুলি ধ্বংসশীল। এগুলির সাথে আমার সাময়িকভাবে সম্বন্ধ

হয়েছে। কাজেই এর উপকারের সম্বন্ধে যত কিছু culture (কালচার—অনুশীলন) করি না কেন, যতই আবিষ্কার করি না কেন, এগুলি—সবই product of nature (প্রোডাক্ট অফ নেচার – গুণজাত)। সুতরাং এর function (ফাংসান—কার্য) গুলি নিত্য নয়। কাজেই আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, শ্রম ইত্যাদি যদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে নিবদ্ধ রাখি, তাহলে এই জ্ঞানটা নিত্যকাল পর্যন্ত রাখা যাবে না। দেহের সঙ্গে মন আছে, এমন একটা অবস্থা আছে, যখন সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহেরও পাত হয়। আমি যত বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কবি হই না কেন, আমার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ যখন পাত হবে, তখন ঐ বুদ্ধিরও নাশ হবে। সুতরাং শরীর ও মনের যত উপকারই করি না কেন, তার ফল বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু এর উপরে আর একটি কথা আছে – আত্মা। জীবাত্মা অনিত্য শরীর বা মন নহে – ইহা সচ্চিদানন্দ ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ইহা নিত্য, ইহার জন্মমৃত্যু হয় না। এই জীবাত্মার উপকার বা হিত–সাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম – এই ধর্ম – পালনেই ভগবান প্রসন্ন হন।

আত্মা স্বতঃসিদ্ধ ও বাস্তব বস্তু

মন-বুদ্ধি চলে গেলেও যে জিনিষটা যায় না, সেটা হচ্ছে চিন্ময়। চিন্ময় জিনিষটা অজড় অর্থাৎ matter (মেটার – জড় পদার্থ)নয়। এটা nature-কে (নেচার – প্রকৃতি) অতিক্রম ক'রে আছে। এ জিনিষটাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ স্পর্শ করতে পারে না। এই জিনিষটা আছে বলে আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার function (ফাংসান – কার্য) করছে অর্থাৎ সক্রিয় হচ্ছে। এই যে চেতন বস্তু—এটা কাল্পনিক নয়, এটা অত্যন্ত real, positive (রিয়্যাল, পজিটিভ—নিত্য, বাস্তব)। যে পরহিত কাজগুলি করছি, সেগুলি আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের ভূমিকাতে পৌঁচাচ্ছে। কিন্তু আত্মা বা চেতন-বস্তুটা যে রয়েছে যাকে দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না, স্পর্শ করতে পারছি না, যাকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা দেখা যাচ্ছে না, তার অস্তিত্ব স্বীকার করব কেন? সুতরাং যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে ১০ হাজার মেইল দূরের জিনিষ

দেখতে পাওয়া যায়, সেই যন্ত্র দিয়ে যখন আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি না, যে radio (রাডিও) দিয়ে বহু দূরের কথা শোনা যায় ও সেই যন্ত্র দিয়ে যখন আত্মার কথা শোনা যায় না, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন আত্মাকে ধরতে পারব না, তখন 'আত্মা' নেই বললেই তো লেটা চুকে যায়। কিন্তু আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, একে নেই বলবার জো নেই। sceptic, agnostic, atheist (স্কেপটিক, অ্যাগ ন ষ্টিক, এ্যাথিষ্ট—সংশয়বাদী, অজ্ঞবাদী, নাস্তিক) বা যত রকম কিছু বলুক না কেন, "আত্মা" বস্তুটি সত্যই আছে। - একে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই জীবাত্মা ও ভগবানের গভীর পার্থক্য রয়েছে। ভগবান জীব নন, তিনি মায়াধীশ – জীবের স্রষ্টা। কিন্তু জীব মায়াবশ।

"মায়াধীশ 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।"

(শ্রীচৈ চ ম ৬।১৬২)

জীব ও ভগবানে পার্থক্য এবং ভগবান অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ – জড়েন্দ্রিয়- গ্রাহ্য নয়

জীব যত বড়ই হোক না কেন, সে যত বড় কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজা কিংবা State (ষ্টেট —দেশ)-এর President-ই (প্রেসিডেন্ট—রাষ্ট্রপতি) হোক না কেন—সে জীবই, সে ভগবান নয়। ব্যাঙের সঙ্গে আকাশের তুলনা করা যায় না। ব্যাঙ নিজেকে ফোলাতে ফোলাতে শেষে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, অথচ আকাশের মত হতেই পারে না; তেমনি জীব সব দিক দিয়ে যত বড়ই হোক না কেন, সে কখনও ভগবান হবে না। জীব অণুচেতন, ভগবান বিভু-চেতন। তিনি সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ চেতনময় বা entity (এনটিটি—সত্ত্বা)। যেহেতু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, তিনি নেই —তাঁকে নিয়ে কি দরকার; তাঁকে বাদ দাও। তুমি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না বলে তাঁকে অস্বীকার করতে হবে? এটা বুদ্ধিমানের কথা নয়। তিনি আছেন, কিন্তু জড়েন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে দেখতে না পাওয়া গেলেও তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করবার

উপায় নেই। তিনি অধোক্ষজ —অক্ষজ জ্ঞানের বা প্রাকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অগম্য। যেগুলি প্রকৃতির product (প্রোডাক্ট—জাত) material (মেটিরিয়াল—প্রকৃতিজাত) জিনিষগুলিকে material (মেটিরিয়াল—প্রাকৃতিক) চোখ দিয়ে দেখা যায়। কিন্তু যে জিনিষটা non-material (নন মেটিরিয়াল – অপ্রাকৃত) অর্থাৎ যে জিনিষটা অপ্রাকৃত বা transcendental (ট্রান্সেন্ডেন্টাল – অপ্রাকৃত), তাকে যদি তুমি তোমার ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্থাৎ প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে ধরতে চাও, তাহলে তোমার বিচারকে প্রশংসা করা যাবে না। ভগবানের অস্তিত্ব নিত্য ও বাস্তব, illusory (ইলিউসরী – অলীক) নয়। এই reality (রিয়ালিটি – বাস্তব) তোমার অনুভূতিতে আসছে না বলে তিনি নেই বা তাঁকে উড়িয়ে দেবে – এ হতেই পারে না। একজন কৃষক যদি Newton (নিউটন—একজন বৈজ্ঞানিকের নাম)-এর gravitation theory (গ্রেভিটেশান থিওরী—মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব) বুঝতে না পারে কিংবা তার উপলব্ধিতে যদি না আসে, তাহলে এই theory (থিওরী—তত্ত্ব) মিথ্যা। একে উড়িয়ে দাও—এ যেমন হতেই পারে না, তেমনি ভগবান তোমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দিচ্ছেন না বলে তিনি নেই – একথা বিচার-সম্মত নয়। ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের মত এই ইন্দ্রিয়ের ভেতর পড়ছে না বলে সত্যদ্রষ্টা, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন। তাঁর অনুভূতি দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশ করেছেন।

সবার উপরে মানুষ সত্য নয়, ভগবানই সত্য

জীব যেমন একটি তত্ত্ব, ভগবানও একটি আলাদা তত্ত্ব। তিনিও একটি ব্যক্তি, একটি personality (পারসনালিটি—ব্যক্তিত্ব)। সেই বিভু চেতন সচ্চিদানন্দ পুরুষটির জন্য যদি কিছু না করা হয়, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম যাজন করা হলো না, আর এতে জীবের চরম মঙ্গলও উৎপাদন করবে না। এই hard reality (হার্ড—রিয়েলিটি—বাস্তব স্ত্য)-এর

সামনে সকলকে সম্মুখীন হতে হবে। আমি বুঝি atoms molecules (এ্যাৎমস মলিকিউলস – পরমাণু অণু) সত্য, আমি বুঝি মানুষ সত্য। মানুষ যেমন সত্য, মাটিটা যেমন সত্য, পক্ষীটা যেমন সত্য—ভগবানও তেমনি সত্য। আমি মানুষ, অতএব আমি সবার উপরে—একথা সত্য নয়। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই।"—এটা সিদ্ধান্ত নয়। বাংলাদেশ সকল দেশের সেরা—এটা sentiment (সেন্টিমেন্ট—ভাবপ্রবণতা)-এর কথা—একথা সত্য নয়; তেমনি মানুষও সবার উপরে এটা সত্য নয়, সবার উপরে হলো ভগবান। আমি মানুষের সেবা করছি, বৃক্ষসেবা, গো-সেবা, কুকুর-সেবা—সব সেবা করছি; কিন্তু এতেই যদি confined (কনফাইন্ড—সীমাবদ্ধ) থাকি, তাহলে বুঝতে হবে জীবনের চরম সার্থকতা আসেনি।

ভগবৎ সেবায় জীবের চরম মঙ্গল লাভ সম্ভব

জীব-সেবাই সব কিছু নয়। এগুলি ধর্ম হতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে higher (হায়ার – উচ্চ) কথা হলো ভগবানের সেবা। শ্রীমদ্ভাগবত এই ভগবানের সেবার কথা বলছেন। ভগবান বলে একটি ব্যক্তি আছেন এবং তাঁর সেবাও করা চলে। এটা একটা utopian—(ইউটোপিয়ান—কাল্পনিক) ভুয়ো বা বাজে কথা নয়। ভগবৎ সেবাতে যদি ধর্ম, কর্ম, যোগ্যতার নিয়োগ না হয়; তাহলে জীবের highest (হাইয়েষ্ট – সর্বোচ্চ) সার্থকতা হয়ে গেল, - একথা বলা যাবে না। গাছের সেবা, পাখীর সেবা, কুকুরের সেবা, মানুষের সেবা—সব কিছুই করলো; কিন্তু বিষ্ণুর সেবা করলো না, তাহলে বুঝতে হবে—সে জীবন ধারণ ক'রে মৃত অবস্থাতেই আছে। মানবজীবন ধারণ ক'রে সে সর্বশ্রেষ্ঠ যে ভগবান, তাঁর সেবা করতে পারতো। কিন্তু যদি সে তা না করে, তাহলে তার জীবন সার্থকতা লাভ করেছে—একথা বলা যাবে না। অনেকে self-centred—(সেলফ—সেন্টার্ড—স্বার্থপর) নিজে খায়-দায়, সিনেমা দেখে এবং সমস্ত উপার্জিত অর্থই নিজের ভোগে লাগাচ্ছে। কেউ বা পরিবারবর্গের মধ্যে উপার্জিত দ্রব্য ভাগ করে দিচ্ছে। কেউ

বা গ্রামবাসী, দেশবাসী কিংবা বিশ্ববাসীর সেবায় লাগাচ্ছে। যিনি যে রকম কর্ম করছেন, তিনি সেই রকমই ফল পাচ্ছেন। এই সব কর্মের concrete result (কংক্রিট রেজাল্ট—বাস্তব ফল) কি? সেটাকে analyse (এ্যানালাইজ – বিশ্লেষণ) করলে দেখতে পাওয়া যায় – টাকা, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠারূপে ফল এসে জুটেছে। এইগুলি লাভ ক'রে কি আমার জীবনে করার ফলে জীবনের highest purpose fulfilled (হাইয়েষ্ট পারপাস ফুলফিল্ড – সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য সফল) হয় না। কারণ এত সব খুব ভালভাবে করেও আমি অনেক অসুবিধার মধ্যে আছি। Highest good (হাইয়েষ্ট গুড – সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ) যদি ভাল হতো, তাহলে আমার অসুবিধাগুলি দূর হয়ে সিদ্ধি লাভ নিশ্চয়ই হতো। কিন্তু সমস্ত যোগ্যতা অর্পণ করা সত্ত্বেও জীবসেবার দ্বারা highest (হাইয়েষ্ট – সর্বশ্রেষ্ঠ) সিদ্ধিলাভ হয় না। তোমার পুত্রশোক হয়, স্বাস্থ্যহানি হয় এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই ফল দ্বারা বোঝা গেল ধর্মার্থে কর্ম করলেও জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

ভগবৎ সেবা ছাড়া জীবের সমস্যা সমাধান অসম্ভব

কেউ হয়ত সাধ্যাতীতভাবেই জীবসেবা করেছে, এত সব করা সত্ত্বেও জীবনের highest reward (হাইয়েষ্ট রিওয়ার্ড—সর্বশ্রেষ্ঠ পুরষ্কার) শান্তি বা আনন্দ পাচ্ছে না কেন? ঋষিগণ বলেন,—তীর্থপাদ ভগবানের সেবা হচ্ছে না বলেই জীবের চরম ফল শান্তি বা আনন্দ আসছে না। বিভু সচ্চিদানন্দ ভগবান জীবন থেকে বাদ পড়েছে। তাঁর জন্য কিছু করনি বলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, আনন্দলাভ বা সিদ্ধিলাভ হচ্ছে না।

ভগবানের সেবায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তাঁরা কি পাচ্ছেন ? এটাও ফল—দ্বারা বোঝা যাবে। কেবল মেনে নিলে চলবে না। ভগবৎসেবক বলতে পারেন,—"আমি স্বাস্থ্য, পরমায়ু, ধন প্রতিষ্ঠা পাইনি ও ভাল খাওয়া-দাওয়ারূপ সম্ভোগ পাইনি। কিন্তু আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, - আমি একটা জিনিষ পেয়েছি; ত হলো

শান্তি বা আনন্দ। আমি দেশনেতা, বৈজ্ঞানিক কিংবা বড় কবি হয়ে যাইনি। আমি কুঁড়ে ঘরে থাকি, বৃষ্টিতে মেঝে ভেসে যায়, কিন্তু আমি বেশ আছি! আমি ভাগবৎ সেবায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে শান্তি বা আনন্দ পেয়েছি।" মহাজনগণ অনেক সময় দৈন্য ক'রে বলতে পারেন যে, তাঁর মত নির্ঘৃণ জীব আর নেই। কিন্তু একথা সত্য নয়। তিনি বেশ শান্তিতেই আছেন, তাঁর কোন সমস্যা নেই।

ভগবান নিত্য ও বাস্তব সত্য

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুন্য-ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥"

(শ্রীচৈ চ আ ৫।২০৫-২০৭)

এগুলি মহাজনের দৈন্যোক্তি। এঁদের জীবনে কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু যারা ভগবৎ-সেবায় জীবন কাটায়নি, তাদের সমস্যার অন্ত নেই। যার প্রচুর টাকা আছে, তার শান্তি নেই—আছে শুধু জ্বালা। কেউ হয়ত দশ লক্ষ টাকা দান করেছে, তাতেও তার শান্তি নেই। কারণ অন্য এক ব্যক্তি ২৫ লক্ষ টাকা দান করেছে—এর পরে তার নামটা বসেছে। এখানেও জ্বালা। সকলেই বলে,—'health is wealth' (হেলথ ইজ ওয়েলথ—স্বাস্থ্যই পরম সম্পদ) কিন্তু স্বাস্থ্যেরও একটা বালাই আছে। খুব স্বাস্থ্যবান হলেও মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হয়। অর্থের, স্বাস্থ্যের, প্রতিষ্ঠারও হাঙ্গামা আছে। প্রচুর প্রতিষ্ঠা যাঁর আছে, তাঁরও রেহাই নেই। কিন্তু যিনি তীর্থপাদের নিষ্কপট সেবারূপ সন্তোষ লাভ করেছেন, ভগবানকে সত্য শিব সুন্দর—পূর্ণ সনাতন সচ্চিদানন্দ বলে জেনে তাঁর সেবায় প্রতিষ্ঠিত আছেন; তিনি বেশ শান্তিতে থাকেন। যিনি উদার মধুর

সুন্দর ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর টাকা, সোনা, রূপা, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠার কি দরকার আছে? তাঁর একটি palatial building (প্যালেসিয়াল বিল্ডিং—আকাশচুম্বী বাড়ী)-এর কি দরকার আছে? লোকের ভোট পাওয়ার কি দরকার আছে? তীর্থপাদের সেবা না হলে কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের কি মূল্য আছে? এগুলিতে কিছুতেই শান্তিলাভ হবে না। এইখানে প্রকৃত positivist-রা (পসিটিভিষ্ট—বাস্তববাদী) বলবেন,—ভগবান কথাটিই মস্ত unreal (আনরিয়াল—অবাস্তব) কথা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে—এই চেহারা, এই যোগ্যতা, এই অর্থ, নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা কিছুই নিত্য কাল থাকবে না। এগুলি অত্যন্ত ক্ষণিক। এগুলি অনিত্য। এই চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ-তারা সবই প্রলয়কালে নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু ভগবান থাকবেন। তাঁর মৃত্যু হবে না —এটা একটা সুগভীর সত্য। জীবের উপলব্ধিতে না এলেও এটা সত্য। আমি যেমন সত্য, আমার যেমন অস্তিত্ব আছে, ভগবানও ঠিক তেমনি সত্য; তার চেয়েও বেশী সত্য। অন্ততঃ জীবনের শেষ মুহূর্তে মনে হবে 'ভগবান' বলে একটা কিছু ছিল। জীবনের সংকট মুহূর্তে শোক ও ব্যাধির উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে "ভগবান তুমি কোথায়?" এমনি একটা চিন্তার উদয় হয়। যদি তিনি নেই, ভিতর থেকে এরূপ ভাবনা আসে কেন? শূন্য থেকে কোন সাড়া আসতে পারে না। শূন্য তো শূন্যই। কিন্তু জীব হৃদয়ে অন্তর্যামি রূপে তিনি নিত্য বিরাজমান। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত সমস্যার সমাধান নেই। এই truth (ট্রুথ—সত্য) যদি জীবনে realized (রিয়ালাইসড—অনুভূতি) বা practiced (প্রাকটিসড—অনুশীলন) না হয়, জীবনে শান্তি-লাভ হবে না।

অচ্যুতভাবহীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশ্বের জঞ্জাল

আজকালকার দিনে আস্তিক্যবোধ-রহিত, ভগবদ্বিশ্বাস–শূন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা জগতে বিপুল জঞ্জালের সৃষ্টি করেছে। Science, (সাইন্স—বিজ্ঞান) Literature (লিটারেচার—সাহিত্য) প্রভৃতি উন্নতিলাভ করলেও অচ্যুতভাব—বর্জিত এই জ্ঞান বা বিজ্ঞান পৃথিবীকে

অশান্তি ও নাশের দিকেই নিয়ে যাবে। Atom bomb (এ্যাটম বম্ব—পরমাণু বোমা), nuclear bomb এক মুহূর্তে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করতে পারে, পৃথিবীতে ক্রন্দনের রোল স্বষ্টি করতে পারে, শ্মশানের জঘন্য বীভৎতা আনতে পারে, কিন্তু এরা কি পৃথিবীতে শান্তি, আনন্দ বা প্রেম দিতে পারে? Wireless, radio, television (ওয়্যারলেস, রেডিও—বেতার, টেলিভিশান, দূরদর্শন), Aeroplane (এরোপ্লেন—বায়ুযান) কিছুটা physical comfort (ফিজিক্যাল কমর্ফট—দৈহিক আনন্দ) মানব সমাজে এনে দিয়েছে; কিন্তু প্রেম, ভালবাসা, পরস্পরে বিশ্বাস, দয়া, সহানুভূতি বা আনন্দ এনে দিতে পারেনি। পরন্তু পৃথিবীতে হিংসা ও বিদ্বেষের হলাহল স্বষ্টি করেছে। আর রাশিয়া আমেরিকাকে ভালবাসতে পারছে না, কিংবা আমেরিকা রাশিয়াকে বিশ্বাস করতে পারছে না, পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব ও ঠাণ্ডা লড়াই লেগেই আছে। যত peace-conference (পীস-কনফারেন্স—শান্তি বৈঠক) হচ্ছে, ততই অবিশ্বাস, malice (ম্যালিস) বা ঘৃণা বেড়ে চলেছে। কেননা ভগবানে অর্থাৎ বিশ্ব-পিতাতে বিশ্বাস নাই।

ভগবৎ-সেবায় শান্তি, আনন্দ, প্রেম ও মাধুর্য, ভগবানে ভক্তিই জীবনের পরম কৃত্য

আমি জড় কাব্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়েই থাকবো। অচ্যুৎকে আমার দরকার নেই। তাহলে শান্তি ও আনন্দ পাবে না—এ কথা ধ্রুবসত্য। ভগবানের সেবা করলেই আনন্দ পাওয়া যায়—একথা সুনিশ্চিত। এটা একটা hypothesis (হাইপোথেসিস—প্রকল্প) নয়। Experiment (এক্সপেরিমেন্ট–পরীক্ষা) ও practice (প্রাকটিস—অনুশীলন) ক'রে দেখো, আনন্দ পাও কিনা। ভগবানের যদি কেউ সাক্ষাৎ পায়, আনন্দ পাবেই পাবে। ভগবানের সেবায় জীবন না কাটালে, জীবনটা বৃথাই কেটে যাবে এবং জীবনে অশান্তি বাড়বে। ভগবান বাস্তব বস্তু—আপনি ধরতে না পারলেও তিনি ত্রিকাল সত্য। তাঁর শ্রীচরণ-কমল অশোক-অভয়-অমৃত-আধার। ভগবানের অনুশীলন জীবনে

করতেই হবে। ভগবানের প্রতি ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃত্য। আর সব কিছু নিকৃষ্ট। যুক্তিতর্ক ক'রে কোন লাভ নাই। ফলের দ্বারাই এ-সত্যটার উপলব্ধি হয়। বিষ্ণুতে ভক্তিযোগই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল উদয় করায়।

"এতাবানের লোকেহস্মিন পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২১)

ভগবৎ-সেবা ও জীব-সেবার পার্থক্য বিচার

ভক্তি মানে আদরের সঙ্গে ভগবৎ-সেবা, প্রীতির সঙ্গে সেবা। জ্ঞান, যোগ ইত্যাদির দ্বারা পরবস্তুর সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া যায়; কিন্তু ভক্তির দ্বারা যুক্ত হওয়া সহজ। ভক্তি কি? ভগবৎ-সেবা। জীবের সেবা নয়, ভগবানের সেবা। জীবের সেবা করলে পরানন্দ পাওয়া যায় না; স্বর্গ ইত্যাদি নশ্বর পদার্থই পাবে। ভক্তির দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও; প্রিয়তার সঙ্গে তাঁর জন্য কিছু করো—শান্তি ও আনন্দ পাবেই পাবে। জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভগবৎ-তোষণের দ্বারা। কিন্তু দেশ-তোষণ, জননী-তোষণ, মানুষ-তোষণের দ্বারা তা হবে না। মানুষের সেবায় পরাশান্তি আসবে না। অচ্যুতভাব বর্জিত হয়ে এগুলি ক'রে দেখ, জন্মজন্মান্তরেও শান্তি পাবে না। সবার উপরে মানুষই সত্য—এটা সিদ্ধান্ত নয়, সবার উপরে ভগবানই সত্য। জীব কিন্তু শিব নয়, জীব ভগবানও নয়। গরুর সেবা করো—দুধ খেতে পাবে। কুকুরের সেবা করো—তোমার বাড়ী চৌকি দেবে। দেশের সেবা প্রতিষ্ঠা ও পূজা এনে দেবে। কিন্তু ভগবানের সেবায় শান্তি, আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেম পাওয়া যাবে।

নাম, শ্রীবিগ্রহ ও ভক্তরূপে ভগবানের নিত্য প্রকাশ

কিন্তু কোথায় তিনি ? কি ক'রে তাঁকে খেতে দেবো? পদমর্দন করবো, কই তিনি? তিনি আছেন, তাঁর সেবা করবার কায়দা আছে

বৈজ্ঞানিক কায়দা। সে পদ্ধতি ও নিয়ম শিক্ষা ক'রে তাঁকে সেবা করা যায়। তোমার মা, তোমার পুত্র যেমন real, তেমনি ভগবানও real। পুত্রকে যেমন কোলে জড়িয়ে ধরো, ভগবানকে তেমনি কোলে নেওয়া যায়। সেই reality-কে (রিয়ালিটি—সত্য) অনুভব করবার কায়দা আছে। তিনি নামরূপে আছেন এবং বিগ্রহরূপে আছেন; আবার তিনি ভক্তরূপেও আছেন। ভক্তের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। নামের সেবা করো, নামের ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখতে পাবে। নামই তিনি। প্রীতির সঙ্গে নামের উচ্চারণ করলে তাঁর স্পর্শ পাবেই পাবে। শ্রীবিগ্রহের সেবা করো—তুমি আনন্দ পাবে। শ্রীবিগ্রহ পুতুল নয়,— "প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" শ্রীবিগ্রহরূপে তিনি জীবের কাছে ধরা দিয়েছেন। ভগবানের প্রতি ভক্তি বা সেবা না ক'রে যত বড়ই পণ্ডিত, ধনী, সাহিত্যিক হোক না কেন—সে দুঃখী, তার কোন সমস্যাই মেটেনি। ভগবৎ-সেবায় প্রবেশ না করলে তার সমস্যাই মিটবে না। ভগবৎ-সেবা ছাড়া অন্য যত কিছু culture (কালচার—অনুশীলন) করই না কেন—জীবনের সমস্যার সমাধান হবে না। অচ্যুতভাববর্জিত civilization, culture, education (সিভিলিজেসন, কালচার, এডুকেশান,—সভ্যতা, কৃষ্টি, শিক্ষা)-এর মূল্য কতটুকু। এতে কেবল rivalry, (র‍্যাইভ্যালরী—প্রতিদ্বন্দ্বিতা) অবিশ্বাস, ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব। কিন্তু ভগবানের সেবা অল্প পরিমাণে করলেও শান্তি, আনন্দ ও প্রেম পাওয়া যায়। এমন যে ভগবান তাঁকে পাপী, তাপী, নাস্তিক, ভোগী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, জড়, realist (রিয়ালিষ্ট—বাস্তববাদী) সকলেই তাঁর সেবায় initiated (ইনিসিয়েটেড—দীক্ষিত) হতে পারে। তাঁরা তাঁর সেবায় প্রবেশ লাভ ক'রে ধন্য হতে পারে এবং জীবনে সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

মহাজনগণ সর্বস্তরের জীবকে ভগবৎ-সেবায় লাগাতে পারেন

যাঁরা ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা যে কোন ব্যক্তিকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করতে পারেন। তাঁরা তোমার মত নাস্তিক,

বিষয়াসক্ত, পতিতাধম ব্যক্তিকেও ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দিতে পারেন। বিষয়ী, অনর্থগ্রস্ত, সম্ভোক্তা—এরূপ নচ্ছার দুষ্ট ব্যক্তিকেও ভগবৎ-সেবার দিকে উন্মুখ করতে পারেন। এ রকম transformation (ট্রান্সফরমেশান–পরিবর্তন) কেবলমাত্র মহাজনগণই করতে পারেন। সুতরাং ভগবৎ-সেবা না ক'রে যদি মৃত্যু এসে যায়, তাহলে বুঝতে হবে জীবন ব্যর্থ হয়েছে। পরজন্মে এই ব্যর্থতার ফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করতে হবে। নানাপ্রকার ক্লেশে দগ্ধ হতেই হবে। ভগবৎ-সেবা না ক'রে মৃত্যু বরণ করা বড় লজ্জার কথা, বড় দুঃখের কথা। শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে নিয়ে ভবসাগর পাড়ি দিতে হবে। এখুনি সময় থাকতে থাকতে তীর্থপাদের সেবায় সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, মূর্খ ও বিজ্ঞ সকলেরই এই ভগবৎ-সেবাব্রত গ্রহণ করা উচিত। এইটি যদি না ক'রে তোমার জীবন চলে যায়, তোমার জন্য অন্য লোক কাঁদবে; আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কাঁদবে। ভগবানের সেবা করো, শান্তি ও আনন্দ পাবে। ভক্তগণ কৌশলী। তাঁরা ভগবান ও জীবের মধ্যে সেতুস্বরূপ হয়ে ভগবানের সঙ্গে সেবাযুক্ত করিয়ে দেন। প্রত্যেকের এই সঙ্কল্প নেওয়া উচিত। ভগবানের সেবা আমায় করতেই হবে। জীবনে কিছু তাঁর সেবা practice (প্র্যাকটিস—অনুশীলন) ক'রে যেতেই হবে। না করলে জীবনটা মাটিই হয়ে যাবে। এটা একটা কড়া সিদ্ধান্ত, কিন্তু সত্য সিদ্ধান্ত।

—❖—

জীবোদ্ধারের জন্য ভগবদবতার

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা ক'রে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-উপলক্ষে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা মহামহোৎসবে শ্রীগোবর্দ্ধনধামস্থ শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার কিছু কথা শ্রবণ করছি।

"জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং, ন জানতোহনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে॥"

(শ্রীভা ১০।৭০।৩৯)

জীবাত্মাকে আবৃত করেছে শরীর, মন, বুদ্ধি ও অহংকার

স্বরূপ-বিস্মৃত জীবকে অনর্থবহ শরীর, অনর্থবহ মন, অনর্থবহ বুদ্ধি ও অনর্থবহ অহংকার গ্রাস করেছে। অনর্থের আকর বদ্ধজীবের শরীর জীবাত্মাকে এমনভাবে আবৃত করেছে যে, সে এর কঠিন আবরণ কি ক'রে ছাড়বে; তাহা বুঝতে পারছে না। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন প্রকার ভাব এসে তাঁকে উৎপীড়িত করে। কৃষ্ণ-ভোলা মন বহুবিধ অনর্থের দ্বারা আক্রান্ত। মন চায় যুক্তি, তর্ক, মেধার কসরৎ, physical, mental, ethical, psychological culture (ফিজিক্যাল, মেন্টাল, এথিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল, কালচার—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, অনুশীলন) করতে মন ঝুঁকে পড়ে। ভগবৎ-সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধারের জন্য এই কলিযুগের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাবকান্তি নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেরিত তব নিজ জন শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে বদ্ধ জীবকে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দেন।

—❖—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁর প্রবর্তিত ধারার বৈশিষ্ঠ্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন; এঁর কীর্তি চিরকাল বিরাজমান

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রণতি –

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।।"

এই প্রণাম-মন্ত্রে তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে। তিনি সচ্চিদানন্দ,

তিনি ভক্তিবিনোদ। তাঁর হৃদয়ে শ্রীভক্তিদেবীর বিশ্রাম। তিনি ভক্তিকে বিনোদিত করেছেন। এই শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় একশত ষাট বছর পূর্বে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এই ভৌম প্রপঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-পূরণ-কল্পে তাঁর সুখময় সেবা-বিধানের জন্য তিনি ভূতলে আবির্ভূত হয়ে লীলা করেছেন। গৌর-নিজজনের আবির্ভাবে জগতের মঙ্গল হয়। কোন রাজা ভূমিষ্ঠ হলে সাহিত্যিকেরা ও কবিরা তাঁর প্রশস্তি গেয়ে থাকেন। কিন্তু জগতের নিত্য মঙ্গলকারী এরূপ মহাজনের খোঁজ কেউ রাখে না। ইহা খুব দুর্ভাগ্যের কথা, ভাগ্যের বিপর্যয় হলে এরূপ মহাজনের অনুসন্ধানে জগতের লোক উদাসীন থাকে। কিন্তু এখনও জগতে এরূপ দুঃসময় আসেনি, তাই এঁর যশ, কীর্তি আজও ঘোষিত হচ্ছে, আজও লোপ পায়নি। অধিকাংশ লোক না জানলেও এরূপ লোক অনেক আছেন, যাঁরা এঁর খবর রাখেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা কোন জাগতিক সংবাদ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত না হলেও শ্রীগৌরজনগনের মধ্যে এঁর অপূর্ব কীর্তি বৈষ্ণবদের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে। শ্রীগৌরপার্ষদ—শ্রীগৌর–নিজজনদের —কীর্তি নিত্যকাল আছে এবং থাকবেও। ভক্ত সমাজে সর্বত্র ও নিত্যকাল এঁদের যশ ও কীর্তি প্রচারিত থাকবে।

ভক্তিপথ কোটি কন্টকাকীর্ণ। যখন এই ভক্তিমার্গ কন্টকাকীর্ণ হয়ে যায়, ভক্তিস্রোতের প্রবাহ যখন ক্ষীণ হয়ে যায়; তখন সেই ধারাকে পুষ্ট করবার দরকার হয়। শ্রীহরিনামের ধ্বনি যখন আর শোনা যাচ্ছে না, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে; তখনই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর নিজ-জনকে নির্বাচন ক'রে বলেন,—"তোমাকে কিছুদিনের জন্য প্রপঞ্চে যেতে হবে, ঐ দেখ কীর্তনের রোল ক্ষীণ হয়ে আসছে, তুমি ভুলোকে গিয়ে এই ক্ষীণ ভক্তিধারাকে প্রবলভাবে প্রবাহিত করো। আমার যে ভক্তি নিত্যকাল চালু রয়েছেন, তাকে তুমি আবার লোকসমাজে উজ্জ্বলরূপে প্রচারিত করো। পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম

আছে, সর্বত্র এই অমল হরিনাম প্রচার করো।" তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বছর পূর্বে নদীয়া জেলায় শ্রী গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্রের অনতিদূরে প্রকটিত হয়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট পূরণ করেছেন।

কলিযুগে একমাত্র ধর্ম নাম-সংকীর্তন

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্তনের পিতা। পিতা যেমন সন্তানকে পালন করেন, তেমনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্তনকে পালন করেন এবং তাঁর পুষ্টি সংরক্ষণ করেন। জগতে যুগধর্ম সংকীর্তন—প্রচার, নাম ও প্রেম —বিতরণ এবং তার সংরক্ষণ—এই তিনভাবে তিনি জগতে করুণা প্রকাশ করেছেন। কলি যুগের ধর্ম নাম সংকীর্তন—এই ধর্ম পালন করলে জীবের উদ্ধার হবে। এই ধর্ম যুগোপযোগী, দেশোপযোগী ও পাত্রোপযোগী 'কলি' মানে – তর্ক, যুক্তি, সন্দেহ, নাস্তিক্যবাদ। এ যুগে যজ্ঞ, ধ্যান, তপস্যাদি চলে না। এ যুগ প্রাকৃত জড়শক্তিকে বিশ্বাস করে, চিৎ-শক্তিকে বিশ্বাস করতে চায় না। জড়শক্তি nuclear weapon (নিউক্লিয়ার উইপন – আণবিক অস্ত্র) দ্বারা এক মুহূর্তে জগতকে বিপন্ন করতে পারে এবং মৃত্যুমুখে কবলিত করতে পারে—একথা ঠিক। কিন্তু একটি দেশ স্বৃষ্টি করবার বা শান্তি ও মঙ্গল বিধান করবার ক্ষমতা জড়শক্তির নেই। যদি চিচ্ছক্তি কোন মহাপুরুষকে আশ্রয় করে, ত্বে তা এক মুহূর্তে জগৎকে উদ্ধার করতে পারে। তোমার এত কালের ব্যারাম বা সমস্যা কিছুতেই ভাল হয় না বা সমাধান হয় না; কিন্তু একজন চিচ্ছক্তি—আশ্রয়কারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মুহূর্ত মধ্যে যে ব্যারাম ভালো ক'রে দিতে পারেন এবং তোমার সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে পারেন। চিচ্ছক্তির ফল যে মহান ও গরীয়ান, এ কথা এ যুগে লোক বিশ্বাস করে না। তাই কলিযুগ। এই জড়বাদী যুগে একমাত্র ধর্ম—নামসংকীর্তন। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা রাজযোগের দ্বারা কলিহত জীবের সর্বসিদ্ধি হবে না। তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর করুণা ক'রে আবির্ভুত হয়ে নাম-প্রেম প্রচার করলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌরশক্তি-স্বরূপ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গৌরশক্তি—স্বরূপ। তাঁর এই পরিচয় কি ক'রে বোঝা গেল ? "ফলেন পরিচয়তে।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট লীলায় তাঁর আচার-প্রচার দ্বারা কি ফল ফলেছে? তিনি যুগধর্ম কৃষ্ণ সংকীর্তন করেছেন। কিন্তু এই যুগধর্মের প্রবর্তন কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

"কলিকালের ধর্ম – কৃষ্ণনাম – সংকীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন ॥"

এই যুগধর্ম প্রবর্তন করতে যে কোন ব্যক্তি পারবে না। কাজেই যেখানে শুদ্ধ নাম-সংকীর্তন-রূপ দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে কৃষ্ণ-শক্তির প্রকাশ একথা উপলব্ধি করতে হবে। কার্যের দ্বারা কারণ নির্ণয় হয়। cause (কজ—কারণ) থেকে effect (এফেক্ট—কার্য) হয়। তেমন effect (এফেক্ট—কার্য) থেকেও cause (কজ—কারণ) বোঝা যায়। "পর্বতে বহ্নিমান ধূমাৎ।" —আগুন দেখা যাচ্ছে না; ধূম দেখা যাচ্ছে। ধূম থেকেই বহ্নি অনুমান করা যায়। ফলের থেকে কারণটা অনুমান করা যায়।

কৃষ্ণশক্তি বিনা শুদ্ধ হরি–কীর্তন অসম্ভব

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকট লীলায় হরিকীর্তনে জগৎকে প্লাবিত করেছেন। কি রকম হরি – সংকীর্তন ? হরি—সংকীর্তন মানে শারীরিক কসরৎ বা musical art (মিউজিক্যাল আর্ট—সঙ্গীত শিক্ষা) সমন্বিত কীর্তনের নাম "নাম-সংকীর্তন" নয়। খুব লম্ফঝম্ফ, খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় লোকের মনোরঞ্জন করলাম কিংবা সুললিত সাহিত্যিকতা বা অলংকারিতাপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা দিয়ে লোকজনের ইন্দ্রিয় তর্পণ করলাম। একে হরি–সংকীর্তন বলা হয় না – এটা বুঝতে হবে। কেবল নাচলে, গাইলে, পাঠ-কীর্তন করলে, সংস্কৃত জানলে, টীকা-টিপ্পনী ব্যাখ্যা করলেই হরি–সংকীর্তনের ফল হবে না; সব ঢাঙ্গাতি হয়ে যাবে। এর

দ্বারা জগতে বাহাদুরি অর্জন করতে পারে, newspaper (নিউজপেপার – খবরের কাগজ)-এ খুব নাম ছড়িয়ে যেতে পারে; কিন্তু এর দ্বারা নিত্য বাস্তব মঙ্গল-লাভ হবে না। এর দ্বারা ভোগী জীব আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবেন না। ১২৪ বছর পূর্বে খোল ছিল, ভাগবৎ-গ্রন্থ ছিল, আখড়া, মঠ-মন্দির সবই ছিল – বড় বড় বক্তা বা পণ্ডিত ছিল —অনেক কিছু ছিল; কিন্তু গৌরশক্তির দ্বারা প্রবর্তিত বিশুদ্ধ ভুবন–মঙ্গলময় সংকীর্তন—ধর্ম ছিল না। কোনটা ছুঁচোর কীর্তন, আর কোনটা তাঁর শক্তির কীর্তন—এটা ফলের দ্বারা বোঝা যায়।

হরিকে যদি কীর্তন করা যায়, তাহলে হরি উদিত হবেন এবং হরি প্রকাশিত হবেন।

"এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"
"শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট – রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ॥"

যথার্থ হরিকীর্তনের ফল কৃষ্ণপ্রাপ্তি

এই ছয় গোস্বামী হরিকীর্তনে অপ্রকট রাধাকৃষ্ণ প্রকট হলেন। গোলকের নিত্যলীলা ভূলোকে প্রকটিত হলো। তাঁরা লেখনীর দ্বারে যখন হরিকথা কীর্তন করলেন, তখন লীলাময় কৃষ্ণ আবির্ভুত হলেন। "হরি – সংকীর্তনে কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভুত হবেন।" ইহাই হরি—সংকীর্তনের ফল। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা—সবই প্রকাশিত হবেন। তিনি যে প্রেমময়, করুণাময় – কৃষ্ণকীর্তনকারীর বা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে এই উপলব্ধি হবে। কৃষ্ণের কথা হচ্ছে, কিন্তু তাঁর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হচ্ছে না কিংবা শ্রোতার কৃষ্ণসেবা করবার ইচ্ছা উদিত হচ্ছে না; তাহলে বুঝতে হবে – এ যথার্থ সংকীর্তন নয়। শ্রীনামপ্রভু যে সচ্চিদানন্দ, যথার্থ শুদ্ধ হরিসংকীর্তনে তা হৃদয়ে অনুভব করা যায়। - "নাম অমনি উদিত হয়, ভকত–গীত-সামে।" তাঁর কথা জানবার ইচ্ছা হচ্ছে এবং তাঁর সেবা করবার প্রবৃত্তি জাগছে; তাহলে বুঝতে হবে – যথার্থ হরিসংকীর্তন –

শ্রবন হচ্ছে। গাইয়ে ও বাজিয়ে যখন প্রাণহীন কসরৎ করে, তখন এ ফল পাওয়া যায় না। যার ভিতরে কৃষ্ণশক্তির আবির্ভাব না হয়েছে, তার দ্বারা হবে ছুঁচোর কীর্তন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুদ্ধ হরিকীর্তনের শাশ্বত ফল

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণগান গেয়েছেন, কৃষ্ণকথা গ্রন্থাগারে লিখে প্রচার করেছেন এবং বহু লোকের হৃদয়-মন্দিরে হরিকে স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ যাঁরা পড়েছেন এবং তাঁর বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের জীবনের গতি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তিনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত করেছেন। যিনি কৃষ্ণশক্তি সঞ্চারিত করেছেন, তিনিই শুদ্ধ হরিকীর্তন করেছেন – এটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। একজন একাকী নদী পার হয়ে গেলেন। আর একজন জাহাজে ক' রে বহু লোককে নিয়ে পার হয়ে গেলেন – এ দুটো এক কথা নয়। নাম সংকীর্তন – প্রবর্তনকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেমন নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে, নীলাচলে – সমগ্র ভারতে সকলকে নিয়ে সংকীর্তন করেছেন ; তেমনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁরই শক্তি প্রেরণায় বহু লোককে নিত্যানন্দ ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংকীর্তন করেছেন।

কীর্তন, সংকীর্তন ও নাম-সংকীর্তনের বৈশিষ্ট্য

আমি একস্থানে বসে নির্জনে ভজন করছি – ইহা ভজন। কিন্তু নামকীর্তন ও নাম-সংকীর্তন এক কথা নায়। এঁদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। নিজে নিজে কিংবা পাঁচজন মিলে কীর্তন হয়। এই ধরণের কীর্তন কেউ কেউ ক' রে থাকেন। কিন্তু সংকীর্তন বহুলোক মিলে হয়। "বহুভি – মিলিত্বা যৎ কীর্তনং, তদেব সংকীর্তনম।" – কীর্তন গাইছে, অথচ কলকেতে টান হচ্ছে না। তাল, লয়, সুর আছে, বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে পাঠ করছে, যেন যাত্রাগান শোনার মত। এইরূপ হরিবিমুখ, শ্রদ্ধাহীন, ভোগী লোকদিগকে নিয়ে সংকীর্তন হয় না। যাঁরা ভক্তিরসিক, নির্মল শুদ্ধচিত্ত, রতিমান বা রুচিমান, অন্ততঃপক্ষে যাঁরা নিষ্ঠাবান বা

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান, তাঁর চেয়েও কমপক্ষে যাঁরা ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানে বিশ্বাসবান—এমন লোককে নিয়ে সংকীর্তন হতে পারে। অন্ততঃপক্ষে যাঁদের অন্তরে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস জেগেছে, তাঁদের নিয়ে সংকীর্তন হতে পারে। শ্রদ্ধাবান, নিষ্ঠবান, রুচিমান—এ রকম বহুলোক নিয়ে সংকীর্তন হতে পারে। শুদ্ধভক্তের কীর্তনে শ্রদ্ধাবানজন উপস্থিত হয়। তিনি কীর্তনের দ্বারে কৃষ্ণশক্তিকে বিচ্ছুরিত করেন। এরূপ সংকীর্তনকারী ফোঁটা, তিলক, মালা, ছাপমারা বেশধারী নাও হতে পারেন। চেহারা বা পোষাক মাত্রের দ্বারা এরূপ সংকীর্তন হতে পারে না। তিনি যে পোষাকে থাকুক না কেন, তাঁর ভিতরে কৃষ্ণশক্তি প্রকাশ পায়। এরূপ কীর্তনকারীকে ঘিরে বহু লোক থাকে। তিনি একাকী নির্জনে ভজন করেন না। কতকগুলি নেশাখোর লোক নিয়ে তিনি কীর্তন করেন না। শুদ্ধ সদাচার বিশিষ্ট নির্মল এরূপ বহু লোককে নিয়ে যিনি কীর্তন করেন, তিনিই যথার্থ সংকীর্তনকারী, তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণশক্তি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু জনের হৃদয়ে কৃষ্ণকীর্তনের ফল উদিত করিয়েছেন—কি ফল ?

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি–নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব–চন্দ্রিকা–বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।"
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥"

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

"সংকীর্তন হৈতে পাপ–সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি – সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত–আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"

(শ্রীচৈ চ অ ২০।১৩-১৪)

শুদ্ধ হরিকীর্তনে চিত্তদর্পণ–পরিমার্জন, ভবমহাদাবাগ্নি – নির্বাপণ ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি

চিত্ত–দর্পণ পরিমার্জিত হচ্ছে কি? ভব—মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হচ্ছে কি? শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণ হচ্ছে কি? প্রতি পদে পদে আনন্দ –আস্বাদন করছো কি? সর্বাত্মা শীতল হয়েছে কি? এ সব যদি অনুভূতিতে আসে, তাহলে যথার্থ কৃষ্ণকীর্তন হচ্ছে—চিত্ত নির্মল হচ্ছে, প্রেমের আস্বাদন পাচ্ছে, বিষয় – বাসনা দূর হচ্ছে এবং দেহ-গেহ ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি টান শিথিল হচ্ছে। কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে; গৌরসুন্দরের দিকে তার প্রাণ ধাবিত হচ্ছে। চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়ে কৃষ্ণের সুন্দর মূর্তি প্রতিফলিত হচ্ছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংকীর্তনে বহুজনের চিত্ত মার্জিত হয়েছে। অসংস্কৃত চিত্ত সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত হয়েছে। পাপ-প্রবৃত্তি ও অন্যাভিলাষ চলে গেছে। তাঁর প্রাণস্পর্শী হরিকথা শুনে কৃষ্ণের প্রতি অনেকের চিত্ত উন্মুখ হয়েছে এবং অনেকের হৃদয় উল্লসিত হয়েছে। অনেকের কৃষ্ণের প্রতি রতি বা টান এসে গেছে। সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রেমপ্রাপ্তি হয়েছে। কৃষ্ণ-কীর্তনের এই ফল। তাঁর হরিকীর্তনের ফলে অনেকের জীবন হরি ভজনে ও হরি কথায় অতিবাহিত হয়েছে। তাদের হৃদয় দেবতার সাক্ষাৎকারের ফলে চিত্ত নন্দিত হয়েছে। ইনি ভক্তিকে বিনোদিত করেছেন, এঁর হরিকথা-কীর্তনে ভক্তিদেবী উল্লসিত হয়েছেন এবং ভক্তি প্রকশিত হয়েছেন। হয়েছেন। তাঁর দ্বারা শ্যামসুন্দর-গৌরসুন্দর বিনোদিত হয়েছেন। এই জন্যই তিনি ভক্তিবিনোদ। তাঁর ধারা লুপ্ত হয়ে যায়নি। পরবর্তীকালেও তাঁর কৃপাধারা বয়ে চলেছে। তাঁর কীর্তন আকাশে হাউই বাজির মত ফোঁস ক'রে একটা শব্দ ক'রে আলো ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে মিলিয়ে শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর সংকীর্তন যে একটা flash দিয়ে নির্বাপিত হয়ে গেছে, তা নয়। তিনি নিজে ভজন করেছেন এবং আলো বিকিরণ করেছেন। তিনি চলে গেলেন, তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল – তা নয়। তিনি প্রকটকালে যেমন জগৎকে আলোকিত করেছেন; তেমনি অপ্রকটকালেও যাতে জগৎ আলোকিত থাকে, তার ব্যবস্থা করেছেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত শুধ ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়ে অদ্যাপি চলেছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ গোস্বামী প্রভুপাদ এই ধারাকে চালু রেখেছেন। তাঁর প্রেরণায় ও তাঁর ইচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রবাহকে দ্রুততর, প্রবলতর করেছেন। কারণ ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এইরূপ ধারা সংরক্ষণকারী ভক্তিগোষ্ঠীর continuity (কনটিনিউটি —স্রোত) চিরকালই থাকে। এটা সিদ্ধান্তের কথা— ফলের কথা। এই ভক্তিধারায় বহু লোক আকৃষ্ট হচ্ছে। কতজন এই পথে আত্মসমর্পন করছে।

মহাজন অনেক আছেন, থাকবেনও। কিন্তু মহাসংকীর্তন-ধারা– প্রবর্তনকারী বিরল। যেখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা সম্বন্ধ নেই। সেখানে যত ঢাক-ঢোল বাজুক না কেন হরিসংকীর্তন হবে না। বহু পত্রিকা বেরুচ্ছে, বহু পাঠ – কীর্তন হচ্ছে; কিন্তু তাতে কৃষ্ণপ্রেম ফলের উদয় করাচ্ছে না। যেখানে কৃষ্ণশক্তি এসেছে, সেখানে তার ফলের দ্বারা জানা যাবে। যারা এসব দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না – তাদের ভাগ্য মন্দ। বস্তুর appreciation (এ্যাপ্রিসিয়েশান—উপলব্ধি) নেই। সূর্যের উদয় তুমি উপভোগ করছো না, এটা অন্ধতার পরিচায়ক। এটা অসূয়া, ঈর্ষা বা হিংসার কথা—ভক্তি নয়।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

তিনি আড়াল থেকে করাচ্ছেন। সেই গৌরশক্তি-ধারার প্রবর্তক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য

এই ধারার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পাঠিয়েছেন ভক্তির বিরোধ, ভক্তির কন্টক, বাধা-বিঘ্ন ও অপসিদ্ধান্ত প্রবৃতি দূর করার জন্য। কেবল ভক্তি-

পথের কন্টক-অপসারণ নয়, চিত্তদর্পণ মার্জন ও শুদ্ধভক্তির উদয় করিয়েছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ধারার ভিতরে ভক্তিবিনোদ-ধারা। এই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার মত শ্রেষ্ঠ ধারা আর নেই।

কীর্তন, সংকীর্তন আর মহাসংকীর্তন – এক কথা নয়। এর তারতম্য উপলব্ধিতে আসে না, যাদের চেতনবৃত্তি খোলেনি। সব জায়গায় একরূপ কীর্তন দেখা যায় না। উৎসব ও মহা–উৎসব আর মহা–মহাউৎসব এক কথা নয়। কোথাও কীর্তন হচ্ছে, কোথাও বা সংকীর্তন হচ্ছে; আবার কোথাও বা মহাসংকীর্তন হচ্ছে। কিন্তু মহা – মহা-সংকীর্তন, খুবই বিরল। "কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" যার চিত্ত মলিন বা এ বিষয়ে অন্ধ, সে পরতত্ত্ব দেখতে পাবে কি ক'রে? হরি – সংকীর্তনের মহা – মহা-উৎসব থেকে লোকসকল বঞ্চিত। যাদের openness of mind (ওপেননেস অফ মাইন্ড – মনের উন্মুক্ততা) আছে, cleanness of heart (ক্লিননেস অফ হার্ট – পবিত্র হৃদয়) আছে, কিন্তু দ্রোহ বা বিরোধিতা নেই; তাদের চোখে এসব পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠে। তাদের কানে এই মহাসংকীর্তনের ধ্বনি বাজে। ভক্ত, কি সুন্দর কীর্তন, কিরূপ আমোদিত করছেন, তা উপলব্ধি করতে পারে।

এই ধারায় আবির্ভূত গুরুবর্গ মহাশক্তিধারী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ধারায় এইরূপ মহা – সংকীর্তন, মহা-পরিক্রমণ ও মহা–অর্চন প্রবাহিত হয়ে আজও চলছে। সকলকে নিয়ে পূজা করছেন। তাঁরা এই মহাপূজাতে বহু লোকের মঙ্গল বিধান ক'রে দিচ্ছেন —এঁরা মহাগুরু। এঁরা বহু জীবের মহামঙ্গল ক'রে থাকেন— ইহাই এই ধারার বৈশিষ্ট্য। এই ধারায় আবির্ভূত যিনি, তিনিও মহা— সংকীর্তনকারী – মহা - অর্চনকারী – মহাপরিক্রমণকারী। গৌর-লীলাভূমি তুমি একা একা পরিক্রমা করতে পারো। তোমার অধিকার অনুসারে এ পরিক্রমা শুদ্ধ হতে পারে কিন্তু হাজার হাজার লোক নিয়ে শ্রীগৌরধাম, শ্রীব্রজধাম ও শ্রীক্ষেত্রেধাম – পরিক্রমায় বহু লোকের

হৃদয়ে শ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। এমনি ক'রে তাঁরা মহামঙ্গল বিতরণ করছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় এইরূপ মহাসংকীর্তন—স্রোত চালু আছে। কেন —না তাঁর কাছ থেকে শক্তি আসছে, যেমন power-house (পাওয়ার হাউস – বিজলী ঘর) থেকে current (কারেন্ট—বিজলী) আসছে বলে আলো জ্বলে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা অনবরুদ্ধ

তাঁর আশীর্বাদ, কৃপা ও প্রেরনা আসছে। শ্রীগৌরসুন্দর বা তাঁর নিজ জনের কাছ থেকে কৃপার প্রবাহ নেমে আসছে বলে এইসব সম্ভব হচ্ছে। তুমি হয়ত উপযুক্ত নও, তবু এই ধারাতে অবস্থিত বলে সব কিছুই তোমার হয়ে যায়। যেমন যার পিতা রাজা, তার ছেলেই যুবরাজ বা "রাজা" হয়। মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রজা, অর্থ—সবই যুবরাজের হয়ে যায়। আগের রাজার মত হয়ত শক্তি নেই। কিন্তু রাজার ছেলে বলেই তোমার ভিতর দিয়ে রাজশক্তি প্রবাহিত হয়ে যায়। রাজ্য-শাসনাদি সুশৃঙ্খল ভাবে চলে। এরূপ মহাজনগনের ধারাতে অবস্থিত ব'লে তাঁদের কৃপাতে, গুরু-পরম্পরায় শক্তি নেমে আসে। তাঁদের ভিতরেও সমস্ত শক্তি দেখতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে যায়। রাজা যদি নির্বংশ না হয়, রাজশক্তি রুদ্ধ হয় না। এই ভক্তিবিনোদধারা কোন দিন রুদ্ধ হবে না। - এটি বেদের কথা, স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজ জনের কথা। কেন এ ধারা রুদ্ধ হবে না? কেন-না ভক্তিবিনোদ-ধারা যাঁর ইচ্ছাতে প্রকটিত হয়েছেন, সেই channel-এর (চ্যানেল—ধারা) ভিতর দিয়ে তাঁর ইচ্ছাই পূরণ হচ্ছে। এ ধারা কোনদিন শুষ্ক হবে না। এ ধারা আজও প্রবাহিত হচ্ছে। এই ধারার যেখানে প্রকাশ, সেখানে মহাকীর্তন – মহাসেবা – মহা-উৎসব। তার ফলে মহা মঙ্গলের প্রকাশ। বহু লোক কৃতার্থ হচ্ছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ ইচ্ছায় আজও এটা চালু রয়েছে। এই ধারায় যিনি স্নাত, অভিষিক্ত ও প্রণত—তিনি বড় ভাগ্যবান। মহাস্রোতে মহাপ্রবাহের স্পর্শের benefit (বেনিফিট –

উপকার) পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অপ্রকট হলেও এই ধারা প্রকট রয়েছে। তাই তাঁর অচ্ছেদ্য লীলা অপ্রতিহত গতিতে চলেছে।

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম থেকে এ ধারার উদ্ভব

এই জন্যই ভক্তিবিনোদ-ধারার গুরু-পরম্পরায় যিনি প্রকটিত, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকারী। তাঁর উপরে এ গুরুভার পড়ে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ভাবে, যে প্রণালীতে বা যে নিয়মে প্রচার করেছেন; এঁরাও ঠিক সেইভাবে সেই ধারা সংরক্ষণ ক'রে যাচ্ছেন। ইহা অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় সংরক্ষিত রয়েছে। একজনের যখন তিরোভাব, তখন আর একজনের আবির্ভাব। গঙ্গাধারার ন্যায় ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের কাছ থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে এ ধারার উৎপত্তি। তাঁর 'চরণ সীধু' হতে আসছে বলে এ ধারা রুদ্ধ হয়নি, কখনও রুদ্ধ হবেও না। অনেক ঝঞ্ঝাটের ভিতরে ভীষণ ঝড়ের ভিতর দিয়ে ইহা সংরক্ষিত হচ্ছে। ঐ ধারাকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। এই ধারাকে ঘর–বাড়ী, টাকা-পয়সা, জাগতিক লোকজন, বিষয়-সম্পত্তি কেহ রক্ষা করছে না; শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং একে রক্ষা করেছেন। যিনি শ্রীভক্তিবিনোদের ঘরে, তাঁর বংশে অর্থাৎ তাঁর ধারায় জন্মেছেন; তিনি পালন করেছেন সংকীর্তন ধর্ম। তিনি যখন এই ধারায় এসেছেন, তখন তিনিও এই সংকীর্তন ধর্ম সংরক্ষণ করেছেন।

নিষ্কপট হৃদয়ে এ ধারাক অনুসরণ করলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি

সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দিয়ে শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। ধন-জন, পিতা-মাতা, বিষয়াদি যে হৃদয়ে বসেছে, তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানকে বসানোর নামই হরিভজন। তাই যদি আমরা হরিভজন কায়মনোবাক্যে চাই, তাহলে হৃদয়ের কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে এই সংকীর্তনকে সেখানে বসাতে

হবে। যে হরিভজনে আত্মনিয়োগ করতে চায়, তাকে এখানে স্থান দেওয়া হয়। যারা হরিভজন করবে না, তাদের এখানে স্থান নেই। যারা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাকে নিষ্কপটে অনুসরণ করবে, তাদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। যাঁরা সর্বতোভাবে মর্মে মর্মে এই ধারাকে আশ্রয় করেছেন, তাঁরাই আশ্রিত ব্যক্তি।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥"

(শ্রীল নরোত্তম-গীতি)

—❖—

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামীপাদের উপদেশামৃতের শিক্ষা

শ্রীহরিকথা – কীর্তনই গৌড়ীয় গুরুবর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা

যাঁরা ভক্তিকে অবলম্বন করেছেন তাঁরা নববিধা ভক্তি শ্রবণ, কীর্তনাদি অথবা শ্রীজীবগোস্বামীর মতে শরণাগতি ও শ্রীগুরুসেবা সহ একাদশবিধা ভক্ত্যাঙ্গের যাজন করে থাকেন। কেহ কেহ আবার হাতের জল শুদ্ধ করার জন্য অথবা নরকগতি হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য একটা গুরুবরণ করে রাখে। এদের কথা বাদ দিলে যাঁরা প্রকৃত ভক্তিলাভের জন্য গুরুবরণ করেছেন, যাঁরা বাস্তবিকই শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম আশ্রয় করেছেন, তাঁরা অবশ্য কোন না কোন ভক্ত্যাঙ্গের যাজন করে থাকেন, কম হো'ক আর বেশী হো'ক নিয়মিতভাবে তাঁদের ভজন হ'চ্ছে। আবার যিনি উৎসাহী সৎসাধক তিনি সাধ্যাতীত ভাবেও ভক্তির যাজন করেন। অন্যান্য কাজ কর্মের মত ভক্তি করাও একটি কাজ এরূপ তিনি মনে করেন না। ভক্তিকে সর্বোপরি স্থান তিনি দিয়ে থাকেন এবং শ্রবণ কীর্তনাদির কোন না কোন একটিকে অথবা কয়েকটিকে

দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অর্চনের উপরই সাধারণতঃ বেশী জোর দেওয়া হয়। এর মধ্যে আবার যাঁরা বেশী চতুর তাঁরা কীর্তনের উপরই জোর বেশী দেন। কীর্ত্তন অর্থ কেবলমাত্র সুর ভাঁজা নয়। হরিকথা যা শ্রীগুরুদেবের নিকট থেকে কিংবা বৈষ্ণবগণ সকাশে শ্রবণ করছেন উহারই অনুকীর্ত্তন। এটিই হ'চ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ গুরসেবা। গৌড়ীয় গুরুবর্গ হরিকথা কীর্ত্তনের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। হরিকীর্তন করাই শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ সেবা। ঘরে ঘরে সকলের নিকট হরিকথাকীর্ত্তন করাই শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট সেবা। ভগবান সবিশেষ ; নাম–রূপ–গুণ লীলা ও পরিকর – বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভগবানের সেবা লাভ করা শ্রবণ, কীর্ত্তন দ্বারাই সম্ভব।

ভক্ত্যংগ যাজন করা সত্ত্বেও অনগ্রগতির কারণ

সবিশেষ ভগবানের সেবা তাঁর কৃপার দ্বারাই সম্ভব। এ কৃপা যাঁরা পেতে চান, যাঁরা তাঁকে একান্তভাবে পেতে চান, তাঁরা শ্রবণ, কীর্তন ও অর্চনাদির মধ্যে দিয়েই তাঁকে পাবেন, তাই সৎসাধক শ্রীগুরুদেবের নির্দেশে এ তিনটি নিয়েই থাকেন। যখন কোন অধিকারী বৈষ্ণব পাবে তাঁর নিকট শ্রবণ করবে, না পেলে কীর্তন করবে বা অর্চন করবে। এর অনুষ্ঠান সৎসাধকমাত্র করে থাকেন বা শ্রীগুরুদেব এর মধ্যে তাঁকে ব্যাপৃত রাখেন। নিয়মিতভাবে এগুলির অনুষ্ঠাণ করেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভক্তির উন্নতি হচ্ছে না। আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ কি? কেহ কেহ ফল পাচ্ছেন – আবার কেহ কেহ পাচ্ছে না। সাধন পদ্ধতি একরূপ হওয়া সত্ত্বেও কারও হচ্ছে – কারও ফল হচ্ছে না কেন? হয়ত অগ্রগতির জায়গায় তিনি পিছিয়েই যাচ্ছেন। এর কারন কি? মহতের আশ্রিত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠে মন্দিরে থেকেও তাদের এমত কেন হয়? গুরুবর্গের এত কৃপা, এত শাসন ও এত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের অগ্রগতি কেন হচ্ছে না। যেমন প্রচুর উপার্জনশীল ব্যক্তি যদি অসৎ ভাবে সকল ব্যয় করে ফেলে তবে যেমন তার অভাব কখনও দূর হয় না, তেমনি এখানেও ভক্তি সাধকের সাধনের

ফল অন্য ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। শ্রবন, কীর্তন, অর্চনাদির মহৎ ফল অনর্থ বা অপরাধরূপ ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যদি পেটে ক্রিমি-কীট থাকে তবে রোগীকে ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও যেমন তার শরীর পুষ্ট হয় না, তেমনি এ ছিদ্রগুলিদ্বারা ভক্তিসাধনের ফল বেরিয়ে যায় সাধকের অগ্রগতি হয় না। এ ছিদ্রগুলি বন্ধ করতে হবে।

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।
(শ্রীউপদেশামৃত ১ম শ্লোক)

যে জিহ্বা হরিনাম কীর্তন করছে, সেই জিহ্বাই যদি আবার ইতর কথা উচ্চারণ করে, তবে তার কীর্ত্তনের ফল নষ্ট হয়ে যায়। জিহ্বা প্রজল্প ও গ্রাম্য কথা বলার জন্য নয়। উহাকে কেবল হরিনাম কীর্ত্তনের জন্য রাখতে হবে। যদি না রাখতে পার তবে হরিনাম তাঁর প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। হরিনামে তোমার যতটা আদর, তার চাইতে বেশী আদর যদি অন্য কথায় হয় তবে শ্রীনাম প্রভু সেখানে কৃপাবিস্তার করবেন না। আন কথায় অতিরিক্ত আসক্তি থাকায় ভক্তির পথে সে অগ্রসর হ'তে পারে না।

অসৎসঙ্গ ও প্রজল্পপরায়ণতার ফলে অগ্রগতি ব্যাহত

এজন্য যে অসৎসঙ্গী, প্রজল্পপরায়ণ অথবা অন্য গ্রাম্য কথা নিয়ে থাকে তার হরিনাম করা সত্ত্বেও অগ্রগতি হয় না। আবার যিনি এ সকল হ'তে সাবধান তার একই প্রকার সাধনে ক্রমোন্নতি লাভ হয়। কারণ তাঁর ছিদ্রপথগুলি বন্ধ আছে। তুমি যা কিছু ভক্তির অনুকূল ফল লাভ ক'রছ অসৎবার্তা-রূপিনী বেশ্যা তার সকল হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার আগ্রগতি কিরূপে হবে? বহুগুণের অধিকারী ব্যক্তিও যদি বেশ্যাসক্ত হয় তার সকল গুনগুলি যেমন লোপ হয়ে যায়, তেমনি প্রজল্পকারীর সকল সাধন চেষ্টা প্রজল্পের মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। যে বাক্য দ্বারা লোকের মনে পরমানন্দের উদ্রেক হয় সেই বাক্যই আবার লোককে মর্মাহত করতে পারে। বাক্যবেগ সর্বাপেক্ষা হানিকর। এজন্য

শ্রীল রূপ-গোস্বামীপাদ এটিকে প্রথম উল্লেখ ক'রেছেন। রূঢ়ভাষী ও বিষয় কথায় ব্যস্ত ব্যক্তি যতই শ্রবণ, কীর্তন বা অর্চন করুক না কেন, তার সকল নষ্ট হয়ে যায়। ভক্তি পেতে হলে তাকে বাক্যবেগ দমন করতে হ'বে।

ভগবদলাভে জাগতিক যোগ্যতা মূল্যহীন

ভক্তি-সৎসাধককে ভক্তিপথে ক্রমোন্নতিলাভ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রবল যত্ন করতে হ'বে। এ জীবনেই তাঁকে ভক্তি লাভ করতে হ'বে। এরূপ প্রবল আকাঙ্খা যিনি পোষণ করেন, তিনি স্ত্রী হ'ন, পুরুষ হ'ন, ধনী হ'ন, দরিদ্র হ'ন, তিনিও সরলভাবে সাধন করলে তাঁকে পেতে পারেন। যার যা আছে তা দিয়েই ভক্তিলাভ হতে পারে। ভক্তি লাভ করার জন্য জাগতিক যোগ্যতার খুব বেশী দাম নেই। জাগতিক যো-গ্যতাগুলি অনুকূল্যভাবে কাজে লাগাতে পারলে কিছুটা সাহায্য করে মাত্র। শ্রদ্ধা, সরলতা ও নিষ্কপটতাই মুখ্য প্রয়োজন। এ প্রকার উন্নতি-কামী ভক্তি সাধক ব্যক্তিকে যাতে ভক্তি নাশ হয় এমন বিষয়ের প্রতি তীব্র দৃষ্টি, রাখতে হবে। যেমন ধনী ব্যক্তি তার ধন রক্ষার জন্য নানাপ্র-কার যত্ন করেন, তেমনি ভক্তিসাধকও তাঁর ভক্তিধন সুরক্ষার জন্য বি-শেষভাবে যত্নশীল হবেন। অনেকেই এদিকে নজর দেন না বলে তাদের সামান্য পুঁজি অতি অল্পদিনেই উবে গিয়ে তাঁকে নিঃস্ব বানিয়ে দেয়। ভক্তির অঙ্গগুলি যেমন শ্রবন, কীর্তনাদি যদি সুষ্ঠুভাবে করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি ভক্তির প্রতিকূল কর্মও করতে থাকে তবে সে অগ্র-সর হতে পারবে না। ভক্তির অঙ্গ—যাজনকারীকে ভক্তি পাইয়ে দিবেই। কিন্তু সাধন করা সত্ত্বেও ভক্তি স্ফূর্তি কেন হয় না? কারণ সে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, প্রজল্পও সঙ্গে সঙ্গে করছে। তার হচ্ছে না, কারণ পরনিন্দাদির মধ্য দিয়ে তার ভক্তিফল বেরিয়ে যাচ্ছে।

আত্ম-সমালোচনাই ভক্তিপথে উন্নতির উপায়

অনেকে হয়ত বাজে বিষয়কথা বলেন না, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করেন, তাতেও, তাতেও তার ক্ষতি হচ্ছে। সাধন অর্থই হচ্ছে নিজের

অসৎবৃত্তির সহিত লড়াই। সর্বদা অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখবেন। অন্যের সমালোচনা না করে নিজের সমালোচনা করবেন।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড় ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

(শ্রীউপদেশামৃত ২য় শ্লোক)

নিয়মের প্রতি আগ্রহ ও অনাগ্রহ উভয়ই ভক্তি বিরোধী

গুরুবর্গ শাসন করেন, মঠ ছেড়ে যেতে দেন না। কারণ মঠের মধ্যে থাকিলে নিরন্তর ভগবৎ সেবার প্রেরণা হয়। নিম্ন নিয়মের প্রতি আগ্রহ, কি নিয়মের অনাগ্রহ উভয়ই ভক্তি বিরোধী। নিয়মের অতি আগ্রহও সময় সময় ভক্তি নাশ করে। যেমন শ্রীগুরুদেব এসে গেছেন, কি কোন বৈষ্ণব এসে গেছেন, তখন সাধনের নিয়মের আগ্রহ অর্থাৎ নিয়মে পালন করতে গিয়ে শ্রীগুরুদেবের সেবায় শৈথিল্য করতে হবে না। রাজা ইদ্রদ্যুম্ন অর্চনে ছিলেন। তখন তাঁর গুরুদেব এসে গেলেন, রাজা অর্চন ছেড়ে শ্রীগুরুদেবের অভ্যর্থনা না করায় গজদেহ লাভ করেছিলেন। লৌল্য অর্থ চঞ্চলতা। ভক্তিসাধনের যে নিয়ম করেছেন তব ত্যাগ করে অন্য বিষয়ের প্রতি লোভ, জড়বস্তুর প্রতি যে টান, ঘর, বাড়ী, টাকা, পয়সা ও অসৎ বস্তুতে আসক্তি ভক্তিসাধককে বিচলিত করে। অর্থের প্রতি, স্বাস্থ্যের প্রতি অভিনিবেশ আছে কিনা বুঝা যাবে সেবারূপ পরীক্ষা দ্বারা।

সেবারূপ কষ্টি পাথরে সাধকের উন্নতির নিরূপণ

যিনি সৎসাধক তাঁর কাছে সেবা এসে গেলে, তাঁর সকল দিকের টান ভেসে যাবে। সেবক স্বাস্থ্যকে রক্ষা না করে ভক্তিকে রক্ষা করবেন; পক্ষান্তরে বিষয়ী সকল কার্যের মধ্যে তার দেহকে রক্ষা করে চলে। সৎসাধকের বিচার সেবা করতে গিয়ে শরীর ভাল হয়, ভাল না হয়

শুকিয়ে যায় যাক। তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপ করেন না। তিনি সেবা করে যান। এরূপ সাধকের ভার শ্রীহরি নিয়ে নেন। ভগবান তখন তাঁর দায় গ্রহণ করেন। সেবকের কাজ সেবা করা ভগবানের কাজ তাঁকে রক্ষা করা। মঠ বাসীদের মধ্যে অনেকের প্রজল্প ও দেহাভিনিবেশ অত্যন্ত অধিক। এ বিষয়ে তাঁরা বিশেষ সাবধান হবেন। অন্যের দোষ দেখার ভার তোমার নয়। সে ভার শ্রীগুরুদেব নিয়ে নিয়েছেন। তুমি তোমার সেবা কার্য করে যাও।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'।

এক বৎসর নিয়মপূর্বক অভ্যাস করে দেখো, দেখবে কত বল হৃদয়ে এসে গেছে।

হরিকথা ব্যতীত অন্য সব কথাই প্রজল্প

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড় ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥
(শ্রীউপদেশামৃত ২য় শ্লোক)

অত্যাহার অর্থে কেবল মাত্র অধিক ভোজনই বুঝায় না। অত্যাহার সকল বস্তুরই অধিক আহরণের চেষ্টা রসনা ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারে অত্যধিক বিষয় গ্রহণকেও অত্যাহার বলা হয়েছে। প্রয়াস— বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানের চেষ্টা বৃথা কথা যাতে হরিভক্তির কোন প্রসঙ্গ নেই তাকেই প্রজল্প বলে। হরিতোষণ ব্যতীত অন্য সকল কথাই প্রজল্প।

স্ত্রীসঙ্গী সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য

জনসংঘ, অসৎজনের সঙ্গ, অভক্তজনের সঙ্ঘ এবং নীতি লঙ্ঘনস কারীর সঙ্ঘ তো অসৎসংগ বটেই।

"অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী' – এক অসাধু, কৃষ্ণা ভক্ত আর॥"
(শ্রীচৈ, চ, ম ২২।৮৭)

স্ত্রীসংগী—স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত অথবা স্ত্রীর পক্ষে পুরুষের প্রতি অত্যাসক্তি। ভগবৎসেবায় ব্যাঘাত না করে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে যে বৈধ স্ত্রীসঙ্গ তা অসৎ নয়। এতে বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিপুষ্টি হয়। অনি-য়মিতভাবে বা অত্যন্ত আসক্তি নিয়ে কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য যে স্ত্রীসঙ্গ উহা অসৎ; বিবাহিত জীবনেও অসংযম নিষেধ। গৃহস্থভক্ত-গণ এবিষয়ে সাবধান হবেন। এ প্রকার স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করলেও তাতে ভক্তি বাধা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী, কর্মী, তপস্বী, পয়ঃপাসী, জিতেন্দ্রিয় হয়েও যদি শ্রীভগবান এবং ভগবদ্ভক্তকে না মানে তবে সে অসাধু। এ-প্রকার অসাধুর সংগ কখনও করবে না। যোষা বলতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধকেও বুঝায়। এসকল বিষয়ের প্রতি ভোগবুদ্ধিসহ আসক্তিওযোষিৎ সঙ্গের নামান্তর মাত্র।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনাঃ ॥"

এরূপভাবে ভগবানের জন্য, কর্ম বা লীলাকে যারা মায়িক বলে – তাঁর নাম, তার রূপ, তাঁর – গুণ, তাঁর – লীলা, তাঁর – পরিকরকে যারা মায়িক বলে, তাঁরা ঘোর মায়াবাদী। তাদের ত্যাগের বা ফল্গু বৈ-রাগ্যের আদর্শে ভক্তগণ ভুলে কখনও তাদের সংগ করতে যাবেন না।

"হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা।"

শ্রীহরির অভক্তে কোনো গুণই শোভা পায়না। এই উভয় প্রকার সংগ্রহকেই বলা হয় জনসংগ।

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"
—(শ্রীভাঃ ৩।৩১।৩৫)

অন্য প্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ মোহবন্ধ হয় না, যেরূপ স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গীসঙ্গে হ'য়ে থাকে।

ত্যাগীদের সতর্কতা অবলম্বন

যারা ত্যাগীভক্ত তারা বিষয়ীর সঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ থেকে সাবধান থাকবেন। ত্যাগী ভক্তগণ হরিসেবায় অনুকূল কার্য্য ব্যতীত গৃহস্থদের গৃহে যাতায়াত করবেন না। গৃহস্থের সহিত তিনি ভক্তিযাজী হলেও ত্যাগীভক্তগণ তাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবেন না। হয়ত কেহ কেহ বলবেন গৃহীদের মঙ্গলের জন্য আমরা তাদের গৃহে যাচ্ছি, এরূপ মঙ্গল করার অধিকার যিনি লাভ করেছেন তাদের কথা বলা হচ্ছে না। সাধক – ত্যাগীভক্তগণকে সাবধান হতে হ' বে। মঠবাসীদের আত্মীয় – ঠাকুর, গুরু ও বৈষ্ণব। তাঁরা এঁদের নিয়ে থাকবেন। গৃহীভক্ত হলেও, তার বাড়ীতে নানাপ্রকার ভোগের দ্রব্য থাকে, নানাপ্রকার স্ত্রীলোক থাকে; সাধক তদ্বারা প্রলুব্ধ হতে পারে। তাই গৃহস্থভক্ত হলেও বিনা কারণে ত্যাগীভক্তগণ তাদের গৃহে বেশী যাতায়াত করবে না। ত্যাগী-ভক্তগণ ত্যাগীভক্তদের সঙ্গে আদান প্রদান করবেন। গৃহীদের সঙ্গে তত বেশী রূপে নয়।

লৌল্য অর্থ চাঞ্চল্য-অস্থির সিদ্ধান্ত। সেবার নিয়ম – পালনে শিথিলতা অথবা সাধ্য বিষয়ের প্রতি চঞ্চলতা। সাধ্যসাধনা বিষয়ে চঞ্চলতাই লৌল্য।

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ কর্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥"
—(উপদেশামৃত ৩য় শ্লোক)

পূর্বোল্লিখিত অত্যাহারাদি ছয়টা দোষ যেমন ভক্তিকে পিছিয়ে দেয় আবার এই উৎসাহাদি ছয়টি গুণ ভক্তিকে এগিয়ে দেয়।

উৎসাহের সহিত ভক্ত্যাঙ্গ যাজনে ভক্তিফল উদয়

উৎসাহ—শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন এতে উৎসাহ থাকা চাই। গৃহীরাও ভক্তিপথে এসে অনেক ত্যাগ করেছেন। ত্যাগীরা তো সর্বস্বই শ্রীগুরু-পাদপদ্মে দিয়ে দিয়েছেন। এত ত্যাগ বা পরিশ্রম করে ভক্ত্যঙ্গ যাজন

করেও যদি উপযুক্ত ফল না আসে তবে তো নিরুৎসাহের কথা। কিন্তু তা নয়, উক্ত ভক্ত্যঙ্গগুলি আরও উৎসাহের সহিত করতে থাক। ঠিক ঠিক ভাবে যত্ন কর। উৎসাহ অর্থ ঔৎসুক্য, নিজের মনে একটা আদব থাকা চাই, মনমরা ভাবে করা নয়, আদরের সঙ্গে কর। প্রাণের রস মাখিয়ে কর। মনে করুন সকলেই ঠাকুরের মঙ্গল আরতি দর্শন করছেন। যদি কেহ আদরের সহিত নিয়মপূর্বক এক বৎসর মঙ্গল আরতী দর্শন করেন, দেখুন কি অমৃত ফল তাতে ফলে। আদরের সহিত করা ও অনাদরের সহিত করা এর মধ্যে ফলের অনেক তফাৎ। আদরের সহিত উৎসাহের সহিত ভক্ত্যঙ্গ সকল যাজন করতে থাকলে হৃদয়ে অমিত বল আসবে। মনে আসবে প্রচুর আনন্দ, তখন আর তোমাকে সেবা করতে বলতে হবে না। তুমি ছুটে গিয়ে সেবা কেড়ে নিয়ে করবে। তখন সেবাই হবে তোমার প্রাণ। তুমি সেবা না করে থাকতে পারবে না। এ বার্ষিক উৎস-বের কার্য-সূচী যাঁরা উৎসাহের সহিত নিয়ম পূর্বক পালন করে যাবেন, দেখবেন হৃদয়ে কত বল এসে গেছে। এটী বাজে কথা নয়। একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ভগবান এবং তাঁর প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব এ উৎসাহটি দেখছেন।

ভাবাগ্রাহী জনার্দন, তিনি ভক্তের প্রীতি ময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হন

ভগবান অন্তর্য্যামী, মাত্র ভাবটি গ্রহণ করেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। কমল নয়ন শ্রীজগন্নাথদেব বড় বড় চোখ দিয়ে দেখেন। তাঁকে ফাঁকি কি করে দেবে? তিনি চান তোমার প্রীতি। তুমি কতখানি করলে তা তিনি দেখবেন না। তিনি দেখবেন তুমি প্রীতির সঙ্গে করছ কি না। এ প্রীতি দেখেই তিনি নিজসেবা দান করে থাকেন। ভক্ত্যঙ্গ যাজনে উৎসাহ ও প্রীতিই ভগবান দেখেন আর দেখেন শ্রীগুরুদেব। প্রীতি দর্শনে তিনি পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীগুরুদেবকে যদি আনন্দ দিতে চাও তবে উৎসাহের সহিত প্রীতির সহিত হরিসেবা কর।

প্রত্যেকটি ভক্ত্যঙ্গের যাজন উৎসাহের সহিত করতে হবে। ঔদাসীন্যের সহিত করা এবং উৎসাহের সহিত করা – এর মধ্যে অনেক তফাৎ। “কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়”। এই নিশ্চয়াতিক বিশ্বাসের সহিত হরিসেবা করতে হবে। অধিকারের তারতম্যানুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী নির্ণীত হয়। ইহা কেবল সাধকাবস্থায় বিচার। সিদ্ধের বেলায় বলা হয় উত্তম ভাগবত।

বিশ্বাসের তারতম্যে অধিকারী অনধিকারী নির্ণয়

যাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে, তিনি উত্তম অধিকারী। কেবল মাত্র সময়ের পরিমাপ দ্বারা অর্থাৎ কেবল বেশী সময় ভজনে কাটালেই উত্তম অধিকারী হবেন না। দেখতে হবে কি বিশ্বাসের সাথে তিনি ভজন করছেন। এ বিশ্বাসের দৃঢ়তাই নির্ণয় করবে তাঁর অধিকার। ভক্ত্যঙ্গের যাজন দ্বারা যে কৃষ্ণসুখ হয় – এ সুদৃঢ় বিশ্বাস যাঁর যতটা হয়েছে তদ্দারাই হবে তাঁর অধিকার নির্ণয়। কেবল মাত্র সময়ের কমবেশি দ্বারা অধিকারের তারতম্য হবে না। বিশ্বাস সমান হলে তার মধ্যে যিনি ভজনে বেশী সময় দেন তিনি উন্নত অধিকারী হবেন। এটা একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত। এর দ্বারাই অধিকারী ও অনধিকারীকে অতি সহজে চিনতে পারবে। শ্রদ্ধা যার দৃঢ় নয়, পরীক্ষার সময় আসলেই তার চঞ্চলতা এসে যাবে।

“শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
‘উত্তম অধিকারী’ সেই তারয়ে সংসার॥”

—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৫)

দৃঢ়তা অর্থ শ্রবণ – কীর্তন করলেই আমার নিশ্চয় ভক্তি হবে। এর দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সুখী হচ্ছেন এই নিশ্চয়াত্মিক বিশ্বাস।

“শ্রদ্ধা শব্দে–বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥”

—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)

"ধৈর্য্যৎ—খুব উৎসাহের সহিত, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সাধন করে যাচ্ছি তথাপি সিদ্ধি আমার করতলগত হচ্ছে না। এ মনে ক'রে যদি তার চঞ্চলতা এসে যায়, তার সাধন ফল নষ্ট হয়।

সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকেই ধৈর্য্যের উদ্ভব

এ জন্মে হোক, পরজন্মে হোক, বা শতজন্ম পরে হোক আমি ভগবানকে পাবই পাব – এরূপ নিশ্চয়াত্মিক বিশ্বাস হতেই ধৈর্য্য আসে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমুকুন্দের উদাহরণ থেকে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। শ্রীমুকুন্দ ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর গায়ন। শ্রীমুকুন্দের কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি উল্লাস। একদিন শ্রীমহাপ্রভু অন্যান্য পার্ষদগণকে আদেশ দিলেন – 'আজ থেকে মুকুন্দের দ্বার মানা। "খড়জাঠিয়া বেটা" যখন সম্প্রদায়ে যায় তাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে দৃঢ় শ্রদ্ধা নয়। আমি আর ওর মুখদর্শন করব না।' মুকুন্দ যখন শুনলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু আর তাঁকে দর্শন দিবেন না, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুতে তাঁর চিত্ত স্থির। তিনি শ্রীবাস ঠাকুরকে দিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করলেন যে কোনও জন্মে তাঁর দর্শন পাবেন কিনা? শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়ে দিলেন—কোটী জন্ম পরে দর্শন মিলবে।' শ্রীমুকুন্দ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। 'পাব পাব শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাব।' শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস। কোটী জন্ম হলেও তাঁকে পাবেনই – এই নিশ্চয়াত্মিক বিশ্বাস কোটী জন্মের ব্যবধান দূর করে দিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দকে ডেকে নিলেন।

নিশ্চয়াত্মিক বিশ্বাস হতেই ধৈর্য জন্মলাভ করে। দৃঢ়বিশ্বাস ও ধৈর্য আলাদা বা বিরুদ্ধ ধর্ম নয়।

"তত্তৎকর্মপ্রবর্ত্তনাৎ"—কর্ম অর্থ এখানে ভোগময় কর্ম নয়। ভক্ত্যঙ্গের আচরণ। শ্রবণ, কীর্তন, বন্দন, অর্চন ইত্যাদি। সাধককে একদিকে যেমন ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন করতে হবে, অন্যদিকে নিষেধগুলিকেও অবশ্য বর্জন করতে হবে। নিষেধগুলি সম্বন্ধে সাবধান

না হলে প্রাথমিক সাধক অতি সহজেই প্রতিকূল বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে বিপথগামী হবে। যেমন চারাগাছ পুতে তাকে জল ও সার দিলেই হবে না, তাকে উপযুক্ত বেষ্টনী দিয়ে রাখতে হবে, নচেৎ গরু ছাগল তাকে নষ্ট করে দিবে।

শ্রীহরিসেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণই জীবনের সার্থকতা

নিষিদ্ধ আচারে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদ আছে। যে বস্তুটা শ্রীভগবানের সেবায় লাগে যেমন ফুল, কর্পূর, চন্দন, ভাল ভোজ্য দ্রব্যাদি, ইহা ভগবানের ভোগে লাগাবে, নিজে ভোগ করবে না। এ জন্য বৈষ্ণবগণ পুষ্প, গন্ধ, কর্পূর প্রভৃতি নিজেরা গ্রহণ করেন না। স্বর্ণ ও উৎকৃষ্ট ধাতুদ্রব্য ইহা ভগবৎ-ভোগে লাগে। ভাল ভাল ভোজ্য দ্রব্য ঠাকুর সেবার জন্য কর। ঠাকুরের সেবায় লাগাও তবে তা সার্থক হবে। তোমার যথেষ্ট টাকা আছে – হরিমন্দির কর, হরিকীর্তন মন্দির কর, যেখানে ভক্তগণ সমবেত হয়ে ভগবানের গুণগানে মুখরিত করে তুলবেন। তবেই ত তোমার টাকায় সার্থকতা। তোমার বাগান আছে, তোমার প্রচুর জমি আছে উহার দ্বারা হরিসেবা কর। সকলটুকুই নিজের ভোগে লাগিও না। একখানা ভাল গয়না দেখলেই শ্রীরাধারাণীর কথা মনে পড়বে। এ সুন্দর অলংকার তো শ্রীরাধারাণীকেই মানায়। তাঁকেই দাও।

আবার ভগবৎ প্রীতির জন্য কতকগুলি ভোগ ত্যাগ করতে হয়। একাদশী তিথিতে অন্নগ্রহণ না করলে শ্রীহরি–ঠাকুর সুখী হন। তাই ভক্তগণ হরির বাসরে অন্নগ্রহণ করেন না। সেদিন ভগবৎ প্রসাদান্নও গ্রহণ করবে না। তাঁর প্রীতির জন্য ত্যাগ করে হলে জীবন সার্থকতায় ভরে যায়।

উৎসাহ থাকা চাই; নিশ্চয়তা থাকা চাই; ধৈর্য থাকা চাই। নিষিদ্ধ বস্তুর অগ্রহণ অর্থাৎ ভক্তিসাধক ভগবানের ভোগ্যবস্তু নিজে গ্রহণে বিরত থাকবেন।

"সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তে"—জ্ঞানীরা যেমন লোকালয় হতে দূরে,

পর্ব্বত গহ্বরে কিংবা বনে জঙ্গলে নির্জন স্থানে থেকে সাধন করে, ভক্তগণ এ প্রকার সংগত্যাগ করেন না। তাঁরা অভক্তের সংগ ত্যাগ করেন।

মায়াবাদীর সংগত্যাগ সর্বদাই বাঞ্ছনীয়

শ্রীগৌরসুন্দর অথবা শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতি যাদের আদর নেই, তাদের সংগ গৌরভক্ত ও কৃষ্ণভক্তগণ করেন না। যারা মায়াবাদী— ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে যারা মায়িক বলে, ভগবানের নিত্যলীলাকে যারা মানে না, ভগবানের প্রাপঞ্চিক লীলাকেও যারা বলে মায়িক—এ প্রকার ব্যক্তিগনের সংগ ভক্তগণ সর্বদা পরিত্যাগ করে থাকেন।

"মায়াবাদী সংগ যেন না হয় কোন কালে।"

—❖—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সংগ নিরন্তর কাম্য

পক্ষান্তরে যাঁরা হরিভজন করেন, হরিভজন শিক্ষা দেন অর্থাৎ শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু এবং তাঁর সজাতীয়াশয় বৈষ্ণবগনের সংগ করা নিষেধ নয় বরং এরূপ সংগ নিরন্তর কাম্য। যে বৈষ্ণব আমাকে হরিকথা পরিবেশন করছেন, যে বৈষ্ণব আমাকে বিপথ হতে ফিরিয়ে আনছেন তাঁদের সংগ ত্যাগ করা মূর্খতা, শাস্ত্র তা করতে বলেন না। বৈষ্ণবগণ সৎসংগ ত্যাগ ত করেন না, বরং অনেকে মিলেই সংকীর্তন করেন।

"একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনাম সংকীর্তনে।" অনেকে মিলে করলেই তা সংকীর্তন হয়। তাই সংগত্যাগ বলতে এখানে অসৎসংগ ত্যাগ বলেছেন। সৎসংগ—ত্যাগ করতে কথা বলেন নি। ভক্তি সাধকের পক্ষে নির্জনতার অর্থ অসৎজনহীনতা। সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ বৈষ্ণবের সংগ করবে। এঁদের সংগ ভক্তিকে দৃঢ় করে। এঁদের সঙ্গে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। একজন হয়ত ঘরে বসে শ্রীগৌরসুন্দরের কি

শ্রীশ্যামসুন্দরের অর্চন করছেন। আর একজন হয়ত ভক্তসঙ্গে হরিভজন করছেন। যিনি ভক্তসঙ্গে আছেন তিনি ভক্তিতে তাড়তাড়ি এগিয়ে যাবেন। সংগ করার সময় অবশ্য বিচার করতে হবে যাঁর সংগ করতে যাচ্ছি তাঁর সাধন কিরূপ? তাঁর ধারার সহিত আমার গুরুধারার মিল আছে কিনা? যদি মিল না থাকে তবে তিনি অন্যজাতীয়। যাঁর সাধ্য সাধনের সহিত আমার মিল নেই তিনি বৈষ্ণব হলেও তাঁর অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সংগ কাম্য নয়। তাঁর সংগ তোমার সদ্যজাগ্রত কোমলভজন-প্রবৃত্তিতে অসুবিধা এনে দিতে পারে।

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বিষয়ীর সংগত্যাগ ভক্তগনের একান্ত কর্তব্য

গৃহীভক্ত ঘরে ঘরে একা একা অর্চন করেন—হরিনাম করেন। কিন্তু এতে তেমন ভজনের বল পান না। কারণ সঙ্গের অভাব। তাই তাঁরা যদি ভক্তসংঘারামে এসে ত্যাগী বৈষ্ণবগনের সঙ্গে কিছুকাল কাটাতে পারেন – দেখবেন তাঁর বল কত অধিক। আবার যদি কোন ত্যাগী ভক্ত একা একা নির্জনে বসে ভজন করেন তাতেও তেমন বল পাবেন না। স্নিগ্ধ অর্থ স্নেহযুক্ত। পরস্পর স্নেহযুক্ত এবং আরাধ্য বস্তুর প্রতি স্নেহযুক্ত। এ প্রকার ভক্তগণ পরস্পর মিলিত হয়ে যে ভজন করেন তাতে অধিক উল্লাস হয়। বিজাতীয় অর্থে কর্মী, যোগী ও জ্ঞানীদের বুঝায়। ভক্তের কাছে এরা অবাঞ্ছনীয়। আর বিষয়ীর সংগ ত্যাগ করবে।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসুসজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"

অতএব দুঃসংগ পরিত্যাগ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৎসংগ করবেন। সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা তাঁর সমস্ত ভক্তি – প্রতিকূল বাসনা ছেদ করে থাকেন।

হরিভজনে সাহায্যকারী ব্যক্তিই পরমাত্মীয়

যে তোমার হরি ভজনে বাধা দেয় সে জাগতিক বিচারে তোমার আত্মীয় নামধারী হলেও তোমার প্রকৃত আত্মীয় নয়। তার সংগ ত্যাগ তোমার প্রকৃত মঙ্গলের। তাই গৃহীভক্তগণ একটু সুযোগ পেলেই ভক্তসংঘারামে গিয়ে ভক্ত সঙ্গে হরি ভজন করবেন। পক্ষান্তরে, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সকলেই যদি নিষ্কপটে হরি ভজন করেন তবে তাঁদের সংগ অনিষ্টকর নহে। তাঁরা তখন তোমার প্রকৃত বান্ধব। মনের যে ব্যাসংগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি তা হরিকথা বলে যিনি দূর করে দেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। তাঁর সংগই সর্বদা কাম্য।

"সতোবৃত্তেঃ"—ভক্তিসাধক অর্থাৎ যিনি ভক্তি চান তিনি, যাঁরা ভক্ত হয়েছেন বা যাঁরা ভক্ত হওয়ার জন্য যত্ন করছেন তাঁদের বৃত্তি গ্রহণ করবেন জীবন ধারনের জন্য। আহার, শৌচাদি কাপড়-চোপড় প্রভৃতি জীবন ধারণের জন্য যা আবশ্যক তা সংগ্রহ করার নাম জীবিকা। এই জীবিকার্জনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীর লোক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি ভক্তিসাধক, তাঁর সাধারণের ন্যায় অশুক্ল ব্যবসা বানিজ্যাদি বৃত্তি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভক্তগণ যেভাবে শাস্ত্র বিহিত উপায়ে জীবন ধারণ করেন তোমাকেও সেভাবে জীবন যাপন করতে হবে।

সিদ্ধভক্তের দেহ চিদানন্দময়ঃ তাই তাঁর জীবিকা নিষ্প্রয়োজন

যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর জীবিকার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় না। তিনি জীবিকার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন না। কারণ আহারাদি প্রকৃত দেহের চাহিদার বালাই তাঁদের নেই। তাঁদের দেহ অপ্রাকৃত হওয়ার জন্য আহারাদি প্রাকৃত দৈহিক ক্রিয়াগুলির প্রতি অভিনিবেশ তাঁদের থাকে না। যিনি বৈকুন্ঠ পুরুষ, তাঁর দেহযাত্রার কোন চেষ্টা নেই। তাঁর দেহ আছে বটে কিন্তু উহা চিদাকার, চিদানন্দময়।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"

(শ্রীচৈ. চ. আ ৭।১১৫)

সিদ্ধ বৈষ্ণব সম্বন্ধেও একই কথা

শরণাগতি ভেদে জীবিকার অভিনিবেশ কম হতে থাকে বটে কিন্তু কিছুটা থাকে। যতদিন পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ না হয় ততদিন এ চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে থেকে যায়। জীবিকা যখন অর্জন করতে হবে, তখন উহা কি ভাবে করতে হবে? ভক্তির সৎসাধক যেভাবে জীবিকা নির্বাহ করেছেন এবং করছেন তোমাকেও সেভাবে জীবিকার্জন করতে হবে। অন্য বিষয়ী লোকের আদর্শ অনুসরণ করতে যেও না।

ত্যাগীভক্তের একমাত্র জীবিকা মাধুকরী ভিক্ষা

কি ত্যাগী, কি গৃহী সকল ভক্তিসাধকেরই জীবন-ধারণপযোগী কিছু সংগ্রহ করতে হয়। আমি ত্যাগী-গুরু গৃহে আছি, আমার আর চিন্তা কি? আমার সকল ব্যবস্থা ত শ্রীগুরুদেবই করবেন। আমার সকল দায় তো শ্রীগুরুদেবেরই। সাধক অবস্থায় অর্থাৎ সিদ্ধিলাভের পূর্বে খাওয়া, পরা, অসুখ হলে চিকিৎসা প্রভৃতি ত্যাগীদেরও দরকার। এজন্য চেষ্টা করতে হয়। তাই ব'লে কর্মীরা ও বিষয়ীগণ যেভাবে জীবিকার্জন করে, গৃহত্যাগী ভক্তগণ সেভাবে জীবিকার্জন করেন না; এমন গৃহীভক্তগণ যেভাবে জীবিকার্জন করেন ত্যাগী ভক্তসাধকের বৃত্তিই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। ত্যাগীভক্তের একমাত্র জীবিকা মাধুকরী ভিক্ষা। যে ত্যাগী ভক্ত শ্রীগুরুসেবার জন্য মাধুকরী না করেন তাঁর শ্রীগুরুর বিত্ত অপহরণের অপরাধ হবে। মাধুকরী না করলে তিনি শ্রীহরিভোগী বা শ্রীগুরুভোগী হবেন। ত্যাগী ভক্তের জন্য মধুকরী ব্যতীত অন্য বৃত্তি নিষিদ্ধ। তাঁর জন্য কৃষিকার্য, বানিজ্য বা রাজসেবা নিষিদ্ধ। অনেকে সমাজসেবা ও মানবসেবার ছলে বহু অর্থ সংগ্রহ করে তদ্দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নয়। যোগীরা যোগবলে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে হয়ত প্রেরণা জাগিয়ে ধন সংগ্রহ করে তদ্দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করেন। ত্যাগী ভক্তগণ যদি

শ্রীগুরুদেব কর্তৃক বিশেষভাবে আদিষ্ট হয়ে অন্য সেবা কার্যে নিযুক্ত না থাকেন তবে অবশ্য মাধুকরী করবেন। মাধুকরী করতে যাঁরা বিমুখ তাঁরা শ্রীহরিভোগী কি শ্রীগুরুভোগী না হয়ে গৃহে থেকে গৃহীভক্তের জীবিকা অবলম্বন করে ভজন করবেন। এতে তাঁর মঙ্গল হবে। শ্রীগুরুসেবা না করে শ্রীগুরুদেবের উপর খাওয়া কি শ্রীহরিদেবের উপর খাওয়া তাঁর অপরাধ। গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষা করতে গেলে যদি গাল দেয়, তা তাকে সহ্য করতে হবে। তাতে তাঁর দৈন্য শিক্ষা হবে। হয়ত পূর্বাশ্রমে তিনি অতি ধনবান ছিলেন কিন্তু বর্তমানে তাঁর একমাত্র অভিমান শ্রীগুরুদাস। যিনি গৃহত্যাগী শ্রীগুরুদাস – শাস্ত্র তাঁর অন্য কোন প্রকার বৃত্তির ব্যবস্থা দেন নি। ত্যাগীমাত্রকেই মাধুকরী ভিক্ষা করতে হবে। হয়ত তিনি বেশী ভিক্ষা না পেতে পারেন কিন্তু শাঠ্যত্যাগ করে তিনি যদি মাধুকরী করতে বাহির হন তাতেই শ্রীগুরুদেব সুখী। তুমি প্রণাম ও প্রতিষ্ঠা নেওয়ার সময় ত্যাগীর পোশাকটি দেখাতে পার। কিন্তু ভিক্ষার সময় তোমার রোদ সহ্য হয় না – এটি চলবে না।

গৃহীভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ একান্তভাবে অনুচিত

এখন গৃহীভক্তগণ কি ভাবে জীবিকার্জন করবে? গৃহস্থরা ভক্তিযাজন করতে অধিকারী নয় – ইহা সত্য নহে। তাই তাঁদের বৃত্তি কি হবে? গৃহস্থ সৎসাধক শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে যেভাবে জীবিকা অর্জন করেন সেভাবে তাঁকে জীবিকার্জন করতে হবে। গৃহস্থভক্তের ভিক্ষায় অধিকার নেই। ভিক্ষা করলে তিনি পতিত হবেন। না খেয়ে মরতে হয় সেও ভাল, তবু ভিক্ষাবৃত্তি তিনি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। তিনি হয় কৃষি, না হয় বানিজ্য, না হয় চাকুরী, না হয় মজুর খাটা – এই সকল দ্বারা জীবিকা অর্জন করবেন। গৃহস্থ ভক্তের পক্ষে চাকুরী করা নিষিদ্ধ নয় তবে এটি হীন বৃত্তি। মদের দোকানে, কোন বেশ্যার বা পাপদ্বারা যিনি ধনোপার্জন করছেন সে প্রকার লোকের চাকুরী স্বীকার করবে না। যেমন দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, অতিরিক্ত মুনাফা করা—এসকল হতে বিরত থাকবেন। কৃষিকার্য অনেকটা নির্মল। এই সকল নির্মল উপায়ে

গৃহীভক্ত শুক্লবিত্ত উপার্জন করে শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত থাকবেন। অন্যের গলগ্রহ্ হয়ে থাকাও ভক্তিসাধকের জন্য নিষিদ্ধ।

অনন্যোপায় মহিলাভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের নির্দেশে জীবিকা নির্বাহ্ করবেন

যে সকল মহিলাভক্ত হরিভজন করেন তাঁদের বৃত্তি কি হবে? তাঁরা হয় পিতা না হয় স্বামীর উপর নির্ভর করে শ্রীহরিভজন করবেন। ইহাই শাস্ত্রের বিধি। কিন্তু বর্তমান কালে আবহাওয়া এত বদলে গেছে যার ফলে অনেক সময় মহিলাভক্তদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। অনেক মহিলা এখন স্বাবলম্বী হয়ে চাকুরী আদি দ্বারা জীবিকার্জন করছেন। অনেক সময় হতে পারে যে তাঁর পিতৃগৃহের কি স্বামীগৃহের পরিবেশ ভক্তিসাধনের প্রতিকূল। এমন অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের আদেশ নিয়ে তাঁর পরামর্শানুসারে জীবিকা নির্বাহ্ করবেন।

— ❖ —

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামীপাদের

শিক্ষামৃত

শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা ভিক্ষা করে শ্রীহরিস্মরণ উপলক্ষে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামীপাদের শিক্ষা কিছু শ্রবণ করছি।

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্॥
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা ভোগাদি–ত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্বেষু যাবদর্থানুবর্তিতা।
হরিবাসরসম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবম্॥
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ)

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ জগদগুরুঃ তাঁর শিক্ষামৃত যথাযথভাবে গ্রহণ করলে মঙ্গল অনিবার্য

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ জগদগুরু। ভক্তিসাধক প্রাত্যহিক জীবনে কি অনুষ্ঠান করবেন ইহা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে সকলকে নিমন্ত্রিত করেছেন। এই সকল মহাজনের বানী যদি না থাকত তবে ব্যভিচারিগণ তাদের নিজ নিজ মতকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বলে চালিয়ে দিতে পারতো। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ জগদ গুরু; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যাতে বিকৃত ভাবে প্রচারিত না হয় তজ্জন্য তাঁর সাবধান বাণী।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেমমঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ)

সাধনভক্তির ক্রমোন্নতি

ইহার অর্থ – প্রথমে শ্রদ্ধা, তার থেকে সাধুসংগ, তার থেকে ভজন ক্রিয়া, তার থেকে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তারপর রুচি ও আসক্তি'—এই পর্যন্ত সাধন–ভক্তি, এরপর ক্রমশঃ 'ভাব' অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানবে।

শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন, এই বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তার নামই গুরুপাদাশ্রয়

জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি মাত্রই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করে থাকেন এবং তাঁর উপদেশানুসারে ভজনক্রিয়া আরম্ভ করেন।

"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।"

এই দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীগুরুর প্রতি যে শিষ্যের নেই তিনি মন্ত্র গ্রহণ করলেও প্রকৃত গুরুবরণ করেন নি। আমি পতিত, অনর্থগ্রস্ত, অনেক প্রকার কামনা বাসনার জালে জড়িত। এ সকল দূর করে আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে উদ্ধার করতে সমর্থ। এই দৃঢ় বিশ্বাস যাঁকে আমি করতে পারি না, তাঁকে আমার গুরুত্বে বরণ করা উচিত নয়। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ; শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন; তাঁর সকল শক্তি আছে – এই দৃঢ় বিশ্বাস যাঁর প্রতি হয়েছে, তাঁকেই তুমি গুরুরূপে বরণ করতে পার। ভক্তি কি বস্তু, কি করে ভক্তি করতে হয় আমি সে বিষয়ে শিশুমাত্র। কিন্তু তিনি সকল জানেন। এঁকে আশ্রয় না করলে আমার পারমার্থিক লোকসান হচ্ছে, এই বিচার যাঁর হয়েছে তিনিই আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য। আশ্রয় গ্রহণ অর্থ হচ্ছে আমার বলতে যা কিছু, সকলই তোমার পাদপদ্মে নিবেদন করলেম। আজ হতে আমার বলতে আর কিছুই রইল না।

"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,'
হইনু পরম সুখী!
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥"

আত্মনিবেদিত সাধক শ্রীগুরুদেবের নিকট হতে প্রথমে মন্ত্রদীক্ষা এবং শিক্ষা গ্রহণ করবে। ইহাই শ্রীগুরুচরণাশ্রয়। আশ্রয় অর্থ নিজেকে তাঁর শ্রীচরণে বিকিয়ে দেওয়া। তিনি যে মন্ত্র দিয়েছেন ইহার সেবাদ্বারাই আমি উদ্ধার হয়ে যাব। আমার সকল অনর্থ দূর করে ইহাই আমাকে বৈকুণ্ঠ রাজ্যে পৌঁছে দেবে – এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মন্ত্র জপ করতে হবে। কেবল মন্ত্র নিলেই সব কিছু হয়ে গেল না। মন্ত্র নেওয়ার অর্থ আশ্রয়ের আরম্ভ মাত্র। আজ থেকে শ্রীগুরুদেব আমার দায় গ্রহণ করলেন। তিনি জগতের সকল লোকের দায় এভাবে গ্রহণ করেন না; যেমনটি শিষ্যের দায় গ্রহণ করেন। যেমন একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে ভালবাসলেই তার সমস্ত দায় গ্রহণ করেন না। বিবাহ সম্বন্ধ

স্থাপন হলেই পরস্পর পরস্পরের জন্য দায়িত্ববোধ জাগে, সেইরূপ মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে শ্রীগুরুদেব আমার উদ্ধারের দায় গ্রহণ করলেন।

দীক্ষার পর শ্রীগুরুদেবের শিক্ষা ও শাসন গ্রহণ করলে প্রকৃত ভজন আরম্ভ

তাই দীক্ষার পর হতে প্রকৃত ভজন, প্রকৃত শিক্ষা, আরম্ভ হয়। শিষ্য শ্রীগুরুর নিকট হতে একটা দাবী করতে পারেন। আবার শ্রীগুরুদেবও শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীক্ষিত হয়েছে? শিক্ষিত হয়েছ কি? শিক্ষা অর্থ শ্রীগুরুদেবের শাসন গ্রহণ করা। তাঁর আদেশ অনুসারে চলা। তাঁর কাছে যাই না। তাঁর কথা শুনি না। তদনুসারে চলি না। হয়ত ১০ বৎসর পূর্ব্বে একটা নাম বা মন্ত্র নিয়েছি, উহা জপ করছি। আমার ভক্তি হবে না? না তোমার ভক্তিতে উন্নিত হবে না। কারণ শ্রীগুরুদেব্র নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করনি। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তদনুসারে আচার পালন করতে হবে, তবেই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। অথবা হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হয়ে গেলেন; অথবা এত দূরদেশে আছেন যাতে তাঁর নিকট তোমার যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠছে না। এমতাবস্থায় তোমার শিক্ষাগুরুর নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাগুরুও সজাতীয়াশয় হওয়া চাই। যদি শিক্ষাগুরু প্রকট থাকেন, তবে তাঁর নিকট হতেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

"তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যম ॥"
(শ্রীচৈ, চ, ম ১৯/৫০ পয়ার-ধৃত শ্রী হ, ভ, বি, ১০/৯১)

দীক্ষাগুরুর অপ্রকটে শিক্ষাগুরু অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ কান্ডারীহীন তরণীর ন্যায় ভবসমুদ্রে ডুবে যাওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙক্তে ভোজয়তে চৈব ষড় বিধং প্রীতিলক্ষণম ॥"
—(শ্রী উপদেশামৃত ৪র্থ শ্লোক)

শ্রীগুরুদেব তোমার আপন জন। তাঁর নিকট তোমার দোষত্রুটি নিবেদন করলে তিনি তোমাকে ঘৃণা করবেন না। তিনি তোমাকে শোধন করার চেষ্টা করবেন। তুমি তাঁর বুকের জিনিষ, তিনি ফেলে দিতে পারবেন না। আমার যা কিছু সকলই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হয়েছে। কিন্তু আমি শ্রীগুরুদেবের সেবায় কিছু দিতে চাই না। শ্রীগুরুদেবের তো অনেক শীষ্য রয়েছেন আমি একা না দিলে আর কি হবে? এরূপ বুদ্ধি তোমার অমঙ্গলের। তোমাকে তিনি দিচ্ছেন বৈকুণ্ঠ-বস্তু, তুমি তাঁকে কি দিচ্ছ? তুমি ত নিঃস্ব। তোমার আছে কি? তবুও গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার ন্যায় সামান্য অর্থাদি যে তিনি গ্রহণ করেন উহা কেবল তোমাকে কৃপা করার জন্য। শ্রীগুরুসেবায় শাঠ্য করতে নেই।

গুরুদেব কৃষ্ণের সংসারে সংসারী

বৈকুণ্ঠে ভগবানের সংসার। সেখানে তাঁর সম্ভোগের কিছু অভাব হচ্ছে না। তাঁর সম্ভোগের উপকরণ পুরোপুরিই রয়েছে সেখানে। আপনি যেমন এ মায়ার উৎপাত থেকে উদ্ধার পেতে চান, ভগবানও তেমনি আপনাকে উদ্ধার করে তাঁর সম্ভোগে লাগাতে চান—আরও ভোগ বৃদ্ধি করতে চান। তাঁর ভোগ পিপাসা অনন্ত। তাই তিনি চান সকলকে নিয়েই ভোগ করতে। তিনি ভয়ানক ভোক্তা। আপনি কতটুকু ভোগ করতে পারেন—কতটুকু ভোগের শক্তি আছে আপনার। তিনি অনন্তভাবে ইন্দ্রিয় চালাতে পারেন। তাই সকলে তাঁর সম্ভুক্ত হয়ে যাক—ইহাই তিনি চান। কিন্তু নোংরা, অশুদ্ধ সব কিছু অর্থাৎ ঐ ফাঁকের পূরণ। ফাঁক পূরণ করতেই হবে। ফাঁক পূরণ না হলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যাবে না। তাঁর সেবায় লাগতে পারা যাবে না। কৃষ্ণ তাঁর সংসার নিয়ে বৈকুণ্ঠে আছেন; আর আপনি আছেন সকুণ্ঠ জগতে। আপনার জন্য তিনি একটা অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করেছেন, তা হচ্ছে গুরুদেব। তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে ভৌম প্রপঞ্চে পাঠিয়েছেন গুরুদেবকে। তিনি এ মর্ত্যধামে মহাজনদের দ্বারা তাঁর সংসার করাচ্ছেন। তাই গুরুদেব বা মহাজন এখানে কৃষ্ণের সংসার পেতে বসেছেন সকলকে

কৃষ্ণের সংসার ঢোকাবার জন্য। ভগবান গুরুদেবকে "তোমার নিজের সংসার করো" একথা বলেছেন—তা নয়; তিনি বলেছেন—"তুমি সেখানে গিয়ে আমার সংসার পাতো"—তাই গুরুদেব কৃষ্ণের সংসার করেন—কৃষ্ণের ইচ্ছায়, তাঁরই আদেশে। তাঁর নিত্য স্বামী হলেন কৃষ্ণ। তাই তিনি কৃষ্ণকে নানারূপে সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে ভোগ করাচ্ছেন। আর যাঁরা তাঁর আশ্রিত, তাঁদেরও কৃষ্ণের সংসারে ভর্তি করিয়ে নেন। তাই গুরুদেব বলেন—কৃষ্ণের সংসার আমরা করছি; কৃষ্ণের ভোগের ইন্ধন যোগাচ্ছি—তুমি ঢুকে পড়ো। কারণ মহান্ত গুরুই কৃষ্ণের সংসার করেন। ভজনানন্দী গুরুদেব নিজে ভজন করেন। তাঁর যে নির্জন ভজন তা বেঠিক নয়। তাঁর নিজের পক্ষে খুবই ঠিক। কিন্তু সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব তাঁর কাছ থেকে কি পাচ্ছে? সকলকে কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করবার জন্য তিনি কি করছেন? সাধারণ জীবের জন্য তিনি কিছু করেন না। আর মহান্ত গুরু বহুলোককে সেবার সুযোগ দিয়ে তাদের অনর্থগ্রস্ততা থেকে উদ্ধার করে থাকেন। গুরুদেব নির্জনে বসে ভজন করতে পারেন। কিন্তু জীবকে সেবার সুযোগ দেবার জন্য তাঁর এ সব ব্যবস্থা। স্মরণ বা নাম-ভজনের দ্বারা কিছু যে হয় না একথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু গুরুদেব যে সেবার factory খুলেছেন তাতে বহুলোক সেবার সুযোগ পান; এই ব্যবস্থার ফলে অনেকে কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করতে পারে।

আপনি হরিনাম করছেন; কীর্তন করছেন; কিন্তু কৃষ্ণের সংসারে না ঢুকলে কি হবে? সেখানে প্রবেশ করতেই হবে। তাই গুরুদেব ডাকছেন—এসো—এসো—আমার সংসারে এসো। এখানে প্রবেশ না করলে কৃষ্ণের সংসারে না ঢুকলে অপরাধ নিয়ে লক্ষ হরিনাম করলেও তোমার অনর্থ যাবে না। এরূপ লক্ষ হরিনাম করেও বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না—হরিনাম করছেন ত অনেকে। কি ফল পাচ্ছেন? শুধু হরিনাম করে কি বৈকুণ্ঠে যাওয়া যাবে? গুরুদেবের সংসারে ঢুকে গুরু-গৃহের সেবা করলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবেন।

ভজনের গূঢ় রহস্য

গুরুর সংসার করব না। কেবল গুরুর কাছ থেকে কিছু নেবই; তা নাও। গুরুদেবের অনেক পেয়েছো। কিন্তু গুরুদেবের গৃহের সেবা না করলে কিছুই হবে না—তাই এসো—গুরুদেবের সংসারে ঢুকে পড়ো। গুরুদেব মহা সংকীর্তনকারী, মহাঅর্চনকারী, মহা—পরিক্রমণকারী। তাতে যোগ দাও। অনর্থ কেটে যাবে। কোন রকমে গুরুসেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারলেই হলো। মহান্তগুরু দ্বারে এসেছেন—তাঁর সেবা factory-তে লেগে যাও। তুমি যদি তাঁর factory-তে employee হতে চাও, গুরুদেব তোমাকে employment দিতে পারেন। সেবাযজ্ঞে যোগদান করতে না পারলে, গুরুগৃহের সেবা করতে না পারলে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না। শ্রীগৌরসুন্দর এ কথা আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন। তাঁর প্রেরণায় তাঁর ইচ্ছায় আমাকে এ সব ভজনের গূঢ় রহস্যের কথা বলতে হচ্ছে। সকলেই কায়, মন, বাক্য, অর্থ, বুদ্ধি, সামর্থ্য দিয়ে গুরুসেবায় এখন থেকেই লেগে যান। সুবিধা আপনাদের হবেই হবে। পরমার্থপথের যাবতীয় অসুবিধা মুহূর্তেই কেটে যাবে। এ জীবনেই আপনাদের সিদ্ধিলাভ হ'য়ে যাবে।

—❖—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুদ্ধভক্তি ও তাহার যাজন

পরমারাধ্যতম শ্রীল সূত গোস্বামীপাদ নৈমিষারণ্যে ষাট হাজার ঋষির সামনে যে-ভাবে ভক্তির সোপানগুলির নির্ণয় করেছেন, সেই ভাবেই শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ভক্তির স্তরগুলি প্রদর্শন করেছেন। যাঁর শুদ্ধভক্তি যাজন করতে চান, তাদের ভক্তি সাধনের স্তরগুলি ক্রমপন্থায় শ্রবণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ভক্তিসাধনের কথাগুলি শুনতে বেশী দেরী

লাগে না, কিন্তু আচরণে অনেক সময় লাগে। কেবলা ভক্তি বা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির সাধনা আরম্ভ করলে অন্য কোন সাধনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির কোন পৃথক চেষ্টা করতে হয় না। কেন না কেবলা ভক্তি নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির কোন পৃথক চেষ্টা করতে হয় না। কেন না কেবলা ভক্তি নিরপেক্ষ ভাবে ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির আশ্রয় না নিয়েই সিদ্ধি দিতে সক্ষম। ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও বৈরাগ্যাদির অনুষ্ঠানে সাধক জীব বিষয়সুখ পেতে পারে এবং তত্তৎ সাধনে 'সিদ্ধি' পর্য্যন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু এই ভুক্তি-মুক্তি আত্মার সুপ্রসন্নতা আনতে পারে না। অনেকে আবার ভক্তিসাধন করতে গিয়ে ভুক্তিমুক্তি চেয়ে বসে। এই সব ভক্তিসাধকের অধিকার বা যোগ্যতা আসে নি বুঝতে হবে। এই ক্ষুদ্র লাভের আশায় শুদ্ধভক্তি যাজন করা উচিত নয়। ভক্তির অনুষ্ঠান করতে হয়—ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্য নিয়ে। হৃদয়ে ভগবদ প্রীতির উদ্বোধনই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

ভগবদ প্রেমই আমাদের কাম্য, ইহাই ভক্তি যাজনের মুখ্য ফল। কেবল ভক্তি সাধন করতে গেলে প্রথম ভূমিকাটি কি? এই শুদ্ধ ভক্তিপথে চলতে গেলে শ্রীমদ্ভাগত প্রথম বিধি দিলেন— কৃষ্ণকথা শুনতে হবে, কৃষ্ণকথা বলতে হবে, তাঁকে এক মন দিয়ে নিত্যকাল পূজা করতে হবে, উপাসনা করতে হবে, প্রতিটি মুহূর্ত্ত কৃষ্ণের। সুখচিন্তায়, কৃষ্ণের প্রীতিকর সেবায় আত্মনিমগ্ন থাকতে হবে। কেবলা ভক্তির সাধনে কোন রকম বিশ্রামের কথা নেই—কৃষ্ণপ্রীতিকর অনুষ্ঠান একটার পর একটা করে যেতে হবে—**'তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।'**

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৪)

শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ তাঁর রচিত শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল সূত গোস্বামী কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের এই অপূর্ব্ব শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। এই শ্লোকটি কেবলা ভক্তি-সাধকের কণ্ঠহার করে রাখা উচিত। কেননা কেবলা ভক্তির মূল principle (নীতি)এই শ্লোকটিতে প্রতিধ্বনিত

হয়ে উঠেছে। এক মন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য শোনা, নিত্য বলা, নিত্য ধ্যান করা ও নিত্য পূজা করা—এ কথাটি যেন আমরা হৃদয়ে গেঁথে রাখতে পারি। কেবলা ভক্তির এই স্বরূপ অনুসরণ করার অধিকার সকলেরই আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, তিনি আমাদের সকলেরই প্রীতির পাত্র। প্রিয়জনকে প্রীতি করতে কার অধিকার নেই? জীবের নিত্য স্বরূপ ধর্মই হলো- প্রীতির ধর্ম্ম। তিনি সকলের প্রীতির আস্পদ, তাই সকলের right আছে – তাঁর সঙ্গে প্রীতির আদান প্রদান করার। যেমন সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক উপভোগ করতে সব প্রাণীরই অধিকার রয়েছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলো electric (light) ভোগ করতে হলে ট্যাক্স দিতে হবে। যারা গরীব তাদের পক্ষে বৈদ্যুতিক আলো উপভোগ করার সুযোগ অনেক সময়ই থাকে না। একমাত্র প্রীতির আস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে যারা প্রীতি করতে চায় না, তারা হতভাগা। জীবের পক্ষে ইহাই বদ্ধাবস্থা, ইহাই অস্বাভাবিক অবস্থা। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে জীব সংসার সমুদ্রে কেবল হাবুডুবু খাচ্ছে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সাধন আরম্ভ করলে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন এসে বাধা দেয়। কর্ম করতে হলে চাই অটুট স্বাস্থ্য ও অর্থ। জ্ঞান সাধন করতে হলে চাই প্রখর ধীশক্তি ও মনীষা, যোগ সাধন করতে হলে চাই কঠোর বৈরাগ্যদীপ্ত সুনিয়ন্ত্রিত জীবন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি যাজন করতে হলে এ সব কিছু না থাকলেও সাধন করতে পারে। ধনী-নির্ধন, পাপী-তাপী, বিদ্বান-মূর্খ, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, ভারতবাসী' আমেরিকাবাসী, রাশিয়ার অধিবাসী—এক কথায় সকলেই কৃষ্ণকথা শুনতে, বলতে, স্মরণ করতে পারে—শুধু যদি তার ইচ্ছা থাকে। কেবলা ভক্তির আর একটি স্বরূপ হলো কৃষ্ণতোষণ। শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রসন্নতা না আনলে আত্মার সুপ্রসন্নতা আসে না—এটা উপলব্ধি করতে হবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বৈরাগ্যের সাধনে আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয় না। কেন না কর্মজ্ঞান বৈরাগ্য সাধনে কতটুকু কৃষ্ণতোষণ থাকে? প্রায়ই আত্মেন্দ্রিয় তোষণই থাকে। তাছাড়া কর্মজ্ঞান বৈরাগ্য ভুক্তি মুক্তি দিতে পারে, জীবের পরমধর্ম্ম

বিমল কৃষ্ণপ্রেম দান করতে পারে না। ভক্তিমিশ্রিত কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। তার কারণ হ'লো এর মধ্যে কিঞ্চিৎ ঈশ্বর তোষণ থাকে বলে। কিন্তু কেবলা ভক্তির বৈশিষ্ট্য বা characteristics হলো প্রেমসম্পত্তি লাভ। কর্ম জ্ঞান বৈরাগ্যদির দ্বারা প্রীতির একমাত্র আস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। তাই তাঁর সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধের উদয় না হলে আত্মার প্রসন্নতা কিছুতেই আসতে পারে না। জীবাত্মার সঙ্গেই বিশ্বাত্মার সঙ্গেই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। এই প্রেম সম্পদ লাভের জন্যই কেবলা ভক্তির সাধন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ উদয়ের ফলে আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৬)

আত্মার সুপ্রসন্ন তাঁর দিকে কেবলাভক্তি সাধকের লক্ষ্য না থাকলে সাধনে শৈথিল্য আসবে। কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি ও আত্মার সুপ্রসন্নতা—এ দুটি লক্ষ্যকে স্থির রেখে ভক্তির পাথে চলতে হয়।

এই সাক্ষাৎ-ভক্তি সাধন বা কেবলা ভক্তি সাধন করতে হলে পৃথক ভাবে ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হয় না। কেবলাভক্তি সাধন আরম্ভ করলেই জ্ঞান-বৈরাগ্য তার পিছনে পিছনে ছুটে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম॥

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৭)

সাক্ষাৎ-ভক্তি নিরপেক্ষা। কিন্তু ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ভক্তির অপেক্ষা করে। ভগবদভক্তি মিশ্রিত না থাকলে এগুলি কোন ফল উদয় করাতে পারে না। ভগবদভক্তি মিশ্রিত থাকে বলে এবং গৌণভাবে ভগবদ তোষণ হয় বলে বহুদিন পরে এগুলির ফলস্বরূপ ভক্তির দ্বারে নিয়ে যায়। সাক্ষাৎ-তোষণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারে হয় না।

এখন স্পষ্ট বোঝা গেল— কেবলাভক্তি সাধন করতে হলে কৃষ্ণের কথা শুনতে হবে, বলতে হবে, স্মরণ করতে হবে। তাঁর কথার দ্বারেই শ্রবণ কীর্ত্তন হয়। এখন প্রশ্ন এই—কথা পাবে কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়— প্রেমিক ভক্ত ছাড়া কেউ কৃষ্ণকথা শোনাতে পারবে না। মুক্তগণও এই কৃষ্ণকথা রমণতার ভূমিকায় বিরাজ করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকভক্তগণ তাঁরই প্রসাদে এই কথার আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণ রসিক ও প্রেমিক ভক্তগণকে এই আনন্দ দিয়ে অহলাদিত করেন। এই কথার আনন্দ সমুদ্রে—নিমজ্জিত হয়ে মুক্তিকে তাঁরা পিশাচী বলে ধিক্কার করেন। ভক্ত ছাড়া তাঁকে কেউ জানাতে পারে না। স্বয়ং শ্রীবেদব্যাসও ভক্ত কৃপা পাওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণভাবে জানবার লীলা প্রকট করেন নি। দেবর্ষি শ্রীনারদের কৃপায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি – ভাবিত হৃদয়ে অবলোকন করেন। তাই তিনি বিশ্ববাসীকে আত্মার প্রীতির আস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে উদাত্ত কণ্ঠে জানাতে পেরেছেন। তিনি আরও জানালেন – সাক্ষাৎ ভক্তি ছাড়া তাঁকে পূর্ণতম ভাবে জানা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে জানিয়েছেন –

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু"।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবদগীতা ৯।৩৪

"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
সর্ব্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও—

এই বাণী তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বিশ্বমানব কে জানিয়ে দিয়েছেন। এ মর্ত্য জগতেও দেখা যায়—যাকে প্রাণের মত ভালবাসি তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধা হয় না, সমস্ত বাধা নিষেধকে অগ্রাহ্য করে, পদ-দলিত করে, প্রীতির পাত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। পরমার্থ— জগতেও এই একই কথা। যখন শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র প্রীতির পাত্ররূপে জানা যায়, তাঁকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ে বরণ করে নেওয়া যায়, তখন তার জন্য সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা হয় না। অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণের

আবেগে, প্রীতির টানে, শরীর, মন, আত্মা, সর্ব্বস্ব তাঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করে দেয়। এই প্রীতির পাত্রকে জানতে বা তাঁর সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ উদয় করাতে প্রেমিক ভক্ত সাধু ছাড়া কেউ পারে না—এমন কি কোন শাস্ত্রও জানতে পারে না। ভাগবত শাস্ত্রে এই প্রীতির পাত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। ভক্তসঙ্গে ভাগবত শাস্ত্র শ্রুত ও কীর্ত্তিত হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ উদয় করায় এবং জীবহৃদয়ে প্রেম—সূর্য্য উদিত হয়ে থাকে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

জ্ঞান-বৈরাগ্য কৃষ্ণে ভক্তি বা প্রীতি উদয় করায় না—ইহা মহাজনগনের উপলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ বাণী। প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ-কৃপায়, তাঁর পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গরূপা সেবায় এই প্রীতি উদিত হয়।

ভক্তের সঙ্গে, তাঁর আশ্রিত হয়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্তন করতে পারলে শ্রীকৃষ্ণ অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখনই তিনি নিজেকে দিয়েত দেন। শ্রীকৃষ্ণের হয়ে তাঁর এবং ভক্তগণের সেবা করতে করতে আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে, বলতে বলতে তিনি একেবারে বশীভুত হয়ে যান। যদি প্রীতির এই chord বা linkটা ধারণায় ও আচরণে আনতে পারে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের দিকে জীবাত্মা ছুটবে। শ্রীকৃষ্ণকে জানবার এই সাধন প্রণালী হ'লো শুদ্ধ ভক্তিযোগ। তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভক্তসঙ্গ এবং শ্রবণ-কীর্তনের উপর এত জোর দিয়েছেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে বলতে বলতে তিনি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যান।

শৃন্বতঃ স্বকথা কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম॥ (ভাঃ)
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ। (ভাঃ)

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— "ভক্তকে যদি আমার কথা বলতে পারো, তাহলে আমি অতি শীঘ্র প্রীত হই। আমার ভক্তের নিকট আমার কথা কীর্ত্তন করলে আমাকে যেমন সুখ দেয়, মনুষ্যলোকে তেমন সুখ, আর কেউ দিতে পারে না।"

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

বৈকুণ্ঠ অর্চনের স্থান, কেবল পূজা—কীর্ত্তন সেখানে নেই। যোগিরা ধ্যান নিয়েই থাকে। আর ভক্তগণ কীর্ত্তন রসে মগ্ন থাকেন। কীর্ত্তনই ভক্তদের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শ্রবা। তাই তাঁর মহিমা শুনলে বললে, তিনি শীঘ্র শীঘ্র প্রীত হন। এটি একটি গভীর secret। এই রহস্যটি স্বরূপ শক্তির দ্বারে প্রকটিত হয়। রাগমার্গ ভজনেও কীর্ত্তনই আশ্রয়। ব্রজ-বালকগণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কেঁদেছেন আর আকুল হয়ে তাঁর মহিমা ও গুণ কীর্ত্তন করেছেন; তাঁকে গান গেয়ে গেয়ে ডেকেছেন। প্রিয়জনকে সবাই ডাকে। শ্রীকৃষ্ণের মত কেহই ত্রিভুবনে প্রিয় নেই। সাধু সঙ্গে তাঁর কথা শুনতে শুনতে এই প্রিয়ত্ববোধ জীবের হৃদয়ে জাগে। সাধু সঙ্গেই প্রিয়ের প্রতি সেবা প্রবৃত্তির উদয় হয়। প্রীতির কার্য্যই হ'লো তাঁকে শোনা, তাঁকে বলা, তাঁকে ধ্যান করা। কতকগুলি নীতি শুনে গেলেই চলবে না। এ পথে চলবার দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে রস সৃষ্টি হলে তখন তাঁর কথায় রুচি হয়। এই রুচি বা রতির উদয় না হলে ভক্তিপথে কেউ চলতে পারে না। ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তাই কেঁদেছেন— "আমার মত দীন ব্যক্তির তোমার মধুর কথায় রুচি হ'লো না, তোমাকে কি ক'রে পাবো।"

যাঁরা শুদ্ধভক্তের সঙ্গে হরিকথায় রুচি লাভ করে নি, তারা সব সময় ভক্তি যাজন করতে পারে না। হরিকথার আশ্রয়ে জীবনযাপন করতে হলে মহামহা ভাগ্য চাই। কৃষ্ণকথাকে যিনি অন্তরের সঙ্গে

আশ্রয় করেন, তিনি বাস্তবিকই ভক্তির অধিকারী হন। তখন জীবনে ইতর বাসনা আর জাগে না। ভক্তসঙ্গে পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গের দ্বারা জীবের ভক্তিসংস্কার গঠিত হয়। তখনই সে পায় ভক্তিলতা বীজ।

এই ভক্তিবীজ সাক্ষাৎ হরিতোষণ। ভক্ত সাধুর কৃপায় সেই জীবকে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন জলে সেচন করতে হয়। তবেই কৃষ্ণ কথায় রুচি দিন দিন বাড়তে থাকবে। এই রুচি এলেই স্বচ্ছন্দে সে ভক্তিপথে চলে যেতে পারবে। ভক্তির প্রাণ স্বরূপ হরিকথায় রুচি এলে অন্যদিকে দৃষ্টি যাবে না। ভক্তির এই সংস্কার আনতে লেখাপড়া, কর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নেই। এই সব যোগ্যতা ভক্তির অধিকার আনে না। হরিকথায় রুচি নাহ'লে পাণ্ডিত্য, ধন, জন, বৈরাগ্য সব কিছুই নিষ্ফল। আর যদি হরিকথায় রুচি হয়, তাহলে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তির পথে ক্রমসোপান ধরে শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করবে। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবার জন্মমুল।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ অঙ্গ।

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য—২২।৮০

শ্রীভগবান ও শ্রীভক্তির স্বরূপ

শ্রীভগবান তাঁর স্বরূপশক্তির দ্বারে নিত্য চিদ-বিলাসবান এবং জীবের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার এই চিদ-লীলার প্রপঞ্চে যে অবতরণ, উহাও তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে মায়াগুণাতীত হইয়া বিরাজমান থাকিলেও আধ্যাক্ষিকগণ স্বরূপ শক্তির লীলা বৈচিত্রীযুক্ত শ্রীভগবানের এই অবতার লীলাকে মায়াশক্তির পরিণাম বলিয়া ধারণা করায় তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদ হইতে বঞ্চিত থকেন। তাঁহাদের এই কল্পিত ধারণাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জনুকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯।১১-১২

অর্থাৎ সর্বভূত মহেশ্বররূপ আমার পরম ভাব জানিতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে মানবতনু গ্রহণকারী বলিয়া প্রাকৃত বুদ্ধি করে। তাহারা নিষ্ফলাশাবিশিষ্ট, নিষ্ফল কর্মা, বৃথা জ্ঞানী ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশকারিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ আমাকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ যে স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা প্রাপ্তি—ইহা তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমারূপ পরম পুরুষার্থের বৈশিষ্ট্য কীর্তন করিতে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীপাদকে বলিতেছেন—

এইতো পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

—শ্রীচৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৪

অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি, প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবা প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন॥

—শ্রীচৈঃ চঃ ম ২০।১২৫, ১২৬

এই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থের একমাত্র সাধন যে শুদ্ধভক্তি, নিগুর্ণভক্তি তৎপ্রসঙ্গেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলিতেছেন—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই কথা কয়॥

—শ্রী চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৮, ১৬৯

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি সাধনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, এই ভক্তির মধ্যে কর্ম–জ্ঞান–যোগরূপ সাধনের কোন অঙ্গ মিশ্রণ থাকিবে না এবং তদ্ তদ্ সাধনের সাধ্য যে ভুক্তি–মুক্তি, তাহারও আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিকাম হইয়া সর্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল অনুশীলনই এই ভক্তির সাধন। এই কৃষ্ণ ভক্তি বা কৃষ্ণ প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী প্রধান স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ। এই সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ শ্রীভাগবত সন্দর্ভে ভক্তির তত্ত্ব ও স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"পরমসারভূতায়াপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হলাদিনী নাম
যা বৃত্তিস্তস্যা এর সারভূতো বৃত্তি বিশেষো ভক্তিঃ।"

—শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ ৯৩ অনু

শ্রী ভগবানের পরম সারভূত স্বরূপশক্তির সারভূত হ্লাদিনী নাম্নী যে বৃত্তি, তাহার বৃত্তি বিশেষই ভক্তি।

এই ভক্তি স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বলিয়া নির্গুণা ভক্তির ফল – প্রেম। এই নির্গুণা, আত্যন্তিকী, **অকিঞ্চনা ভক্তি সাধনের একমাত্র মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা**। সেই হেতু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ" ॥

এখানে শ্রীভক্তিলতাবীজ অর্থে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তির বীজ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভের মূল কারণ যে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা—ইহাই বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমা শ্রীকৃষ্ণ ও

শ্রীকৃষ্ণভক্তের মধ্যে নিত্য অবস্থিত। ইহা অন্যত্র থাকে না। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পাইবার উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শ্রীগোস্বামীপাদকে বলিতেছেন—

"কৃষ্ণভক্তি–জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮০)

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"
—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫১)

যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রাধান্য থাকে না অথচ ভগবানের অনুশীলন থাকে, উক্ত ভক্তির ফল ভুক্তি-মুক্তি পর্যন্ত। বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্মের পালন, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মফল দ্বারা কৃষ্ণের অর্চন বা জ্ঞান বৈরাগ্যের বলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরে কৃষ্ণভক্তি লাভের প্রচেষ্টা—এইসব সগুণা মিশ্র ভক্তির ফল ভুক্তি, মুক্তি বা প্রেম মাত্র প্রাপ্তি পর্য্যন্ত উদয় করাইয়া নিরস্ত হয়; ভগবানকে বশীভুত করিতে পারে না। যে ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন না, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভক্তির আদর করেন নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদে ইহা আমরা দেখিতে পাই। শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসার, ভক্তির-স্বরূপ নির্ণয় করিতে বলিলে শ্রীরায়-রামানন্দ প্রথমতঃ কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে "সাধ্যসার" বলিয়া নির্ণয় করিলে তিনি উহা বাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করায় শ্রীরায় রামানন্দ "জ্ঞান শূন্যা ভক্তি সাধসার"—ইহা কীর্তন করিয়া প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি বর্ণন করেন—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শোহজিতর্জিতেহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম"॥
—(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)

অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে কহিলেন—হে ভগবন নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্নরূপ দূর করিয়া যে ভক্ত গন আপনার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া সাধুমুখ বিগলিত একমাত্র আপনার কথা শ্রবণ করিবার জন্যই জীবন ধারন করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত থাকেন, ত্রৈলোকের মধ্যে আপনি অর্জিত হইলেও তাঁহারা আপনাকে জয় করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য কর্ম-জ্ঞান শূন্যা শরণাপত্তিময়ী কেবল সাধুসঙ্গ প্রাধানা ভগবল্লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাত্মিকা শুদ্ধা ভক্তিতে ভগবদ বশীকরণ রূপ কেবলাভক্তির মুখ্য ফলের উদয় দেখিতে পাইয়া উক্ত প্রকার সাধন-ভক্তিকেই প্রশংসা করিয়া উহা স্বীকার করিলেন। সেই হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু–প্রদর্শিত কেবলা-ভক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে—এই ভক্তির সাধনে কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যের চেষ্টার দিকে সাধকের লক্ষ্য থাকে না, কেবল মাত্র সাধুসঙ্গ ও তৎকৃপাজাত শরণাপত্তি ও শ্রীভগবল্লীলা কথা শ্রবণ কীর্তনে রুচি প্রাপ্ত হইয়া উহারই ক্রমোন্নত সাধনাবস্থায় নিষ্ঠা ও আসক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করেন। সেই রতি গাঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেম জন্মায়। প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ সেবা মাধুর্য্য লাভ করিয়া সাধক প্রেম সিদ্ধিতে ধন্য হন। শ্রীভগবানও তাহার প্রেম সেবাকৃষ্ট হইয়া তাহার বশীভূত হন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে—উহা কেবলা ভক্তির বৈধভক্তির দ্বারে প্রেম-প্রাপ্ত হইয়াও তাহার সেবা লাভ হয় না। একমাত্র রাগ–মার্গে ব্রজের শুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের আশ্রয় রাগাত্মিক ব্রজবাসি গনের ভাবের অনুসরণে লোভ প্রযুক্ত হইয়া তাহাদের অনুগমনে রাগ-চালিত হইয়া যাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সেবার অনুশীলন করেন, একমাত্র তাঁহারাই ব্রজের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সেবালাভের অধিকারী হন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কিশোর শেখর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্যান্য স্বরূপের অংশী ও অন্য শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্মে ধর্মী বলিয়া তাঁহার কৈশোরলীলা

তাঁহার অন্যান্য স্বরূপ ও বিগ্রহের যাবতীয় লীলা হইতে পরমোৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই কৈশোর লীলার মধুর রসের একমাত্র পরিকর হইতেছেন ব্রজের কিশোরী ব্রজাঙ্গনাগণ। কিশোর শেখর কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্য যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেই অপূর্ব মাধুর্য্য বিশিষ্ট কিশোর কৃষ্ণের সেবালাভের একমাত্র পরিপাটি হইতেছে – ব্রজের কিশোরী – সখীগনের শ্রীকৃষ্ণের মধুর সেবা পরিপাটিতে লোভ প্রযুক্ত হইয়া তাঁহাদের ভাবের অনুগমনে শ্রীকৃষ্ণের মধুর সেবা প্রাপ্তি। ব্রজগোপীগণের মধ্যে প্রেমের মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধাঠাকুরানীই তাঁহার প্রেম সেবা বৈশিষ্ট্যে কিশোর শেখর শ্রীকৃষ্ণকে অধিক বশীভূত করায়—তাঁহার প্রেমের উৎকর্ষতা ব্রজের অন্যান্য গোপীগণ অপেক্ষা অধিক। সেই হেতু, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাপ্রেমে বশীভূত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবালাভই পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা, ইহা সর্বতো ভাবে তাঁহার শিক্ষা ও লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শ্রীরাধা নিত্যজন শ্রীশ্রীগৌড়ীয় গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভাগ্যবান জন তাঁহার রাগানুগা সাধন পরিপাটিতে ব্রজে শ্রীরাধা কৃষ্ণের সেবা লাভে ধন্য হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়-রামানন্দের চিত্তে প্রেরণা দিয়া তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে কীর্তন করাইয়া ভাগ্যবান জনগণকে এই নিগূঢ় প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন—

‘সাধ্যবস্তু’ ‘সাধন’ বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি’ কহ, রায়, পাবার উপায়॥
রায় কহে, - যেই কহাও, সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল – মন্দ, কিছুই না জানি॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য, শুন, সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি–ভাবে না হয় গোচর॥

সবে এক সখীগনের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৯৬—২০৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষ লীলায় শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে গম্ভীরায় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ গনের সঙ্গে নির্জনে কৃষ্ণ বিচ্ছেদজনিত বিরহোন্মাদ শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া অন্তবাহ্যদশায় কিশোর শেখর শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, মাধুর্য্য আস্বাদনের যে প্রকার ও পরাকাষ্ঠা, এবং মধুর ভাবাশ্রিত রাগানুগ সাধকগনের ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা-আস্বাদন-পরিপাটীরূপ সিদ্ধি ভূমিকার যে আদর্শ তাঁহার শ্রীরাধা নুগা সখীর ভাবে বিভাবিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনে প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহাই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-গৌড়ীয় ভক্তগণেরই প্রেম শিক্ষার কন্ঠহার স্বরূপ। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির এই উন্নত উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমশিক্ষাদান রূপ মহাবদান্য লীলার স্মরণ করিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ভাগ্যবান জগদবাসীর প্রতি তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন॥"

—❖—

জীবের জীবনে সঙ্গ-প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য

পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং শব্দাবতার শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত এই দুই-এর মত উদার ও করুণার অবতার জগতে আর অবতীর্ণ হন নি। এঁদের মহা করুণার অবতার বলা হয় কেন? এঁরা কি দান করেছেন—এঁরা এক অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক বস্তু দান করেছেন, এঁরা বৈকুণ্ঠ বস্তুর সঙ্গ দান করে জগৎকে ধন্য করেছেন। প্রীতি থেকে সঙ্গ হয়। যেখানে প্রীতি সেখানেই স্মৃতি, সেখানেই সঙ্গ। চেতনের সঙ্গ ও আনন্দের অনুভূতি আছে। জড়ের চেতনা নেই আনন্দের অনুভূতিও নেই। চেতন স্বাভাবিক ভাবে সব সময় আনন্দই চাই। চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম হ'লো সঙ্গ চাওয়া। সঙ্গ চাওয়া চেতনের ধর্ম হ'লেও সঙ্গের বিচার চাতুর্য্যের প্রয়োজন আছে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—"সংগাৎ সংজায়তে কামঃ।"

সংগের থেকে কামনার উদয় হয়। কিসের কামনা? আনন্দের কামনা। জীবের যে জাতীয় সংগ ঘটে, সেই জাতীয় কামনার বা বাসনার উদয় হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেম-শিক্ষা দিতে গিয়ে ভক্ত ও ভগবানের সংগই শিখিয়েছেন। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভক্ত ও ভগদ্বিগ্রহের দর্শন, স্পর্শন, ভক্ত সঙ্গে ভগবদলীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরনাদি করলে ভগবদ সঙ্গ-রূপা-ভক্তি লাভ হয়। জীব শ্রীভগবানের এই লীলা শ্রবণ কীর্তনাদির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গ পায়, স্পর্শ পায়। তাই শ্রীশ্রী গৌর সুন্দর ভক্ত ও ভগবানের লীলা, শ্রবণ, কীর্তনাদি করে সঙ্গ করবার কুশলতা শিখিয়েছেন। সঙ্গই জীবকে বদ্ধ করে, মুক্ত করে, ভক্ত করে। বদ্ধাবস্থায়—জড়ের, মুক্তাবস্থায় আত্মার এবং ভক্তাবস্থায় ভগবানের সঙ্গ হয়। 'রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ' তিনি পরিকরগনের সঙ্গে নিত্য সঙ্গসুধারস সুখদান করেন এবং নিজে সুখী হন। সঙ্গের মধ্যে রস আছে। আনন্দের আস্বাদন সঙ্গের দ্বারাই হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজের নাম রূপ, গুণ, লীলা মাধুর্য্যের আস্বাদন করাইয়া নিজের

পরিকরগণকে আনন্দ দিচ্ছেন এবং নিজেও আনন্দ পাচ্ছেন। এই সঙ্গ সুধার আস্বাদন লীলা গোলোকে নিত্যকাল চলছে।

জীব জড় নয়, চেতন এবং ভগবানের বিভিন্নাংশ। শ্রীভগবানের তিনটি শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি। জীব তটস্থা শক্তি—সে অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির মাঝখানে আছে। জীব ইচ্ছা করলে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে অথবা বহিরঙ্গা শক্তি জড়ের সঙ্গও করিতে পারে। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি থেকে তটস্থা শক্তি পৃথক। অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে শ্রীভগবানের অনন্ত ধাম, অনন্ত পরিকর ও অনন্ত লীলা হচ্ছে। এই নিত্য লীলা প্রপঞ্চে মায়ামুগ্ধ জীবগণ দেখতে পায় না বা আস্বাদন করতে পারে না। সেই জন্য এই প্রপঞ্চে শ্রীভগবান কৃপা করে অবতার-লীলা পরিগ্রহ করেন। শ্রীভগবানের করুণার অবতার কার জন্য? মায়া-মুগ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য। জড়ের জন্য নয় কিংবা স্বরূপ শক্তির পরিণামের জন্যও নয়। তটস্থা শক্তির পরিণাম জীবের জন্যই প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়। তটস্থা শক্তির পরিণাম অণূসচ্চিদানন্দ জীবের স্ব-সুখানুসন্ধানই তার ধর্ম।

আর স্বরূপ শক্তির পরিণাম ভগবদ পরিকরগনের ধর্ম হলো ভগবানের সুখানুসন্ধান করা। জীব স্বরূপ শক্তি নয়—সে চিদংশ—তার আনন্দ আছে। যে শক্তির মধ্যে চেতনাটা নেই—সেইজন্য তার আনন্দ চর্চা নাই। জীব চেতন—তার আনন্দের চর্চা আছে এই আনন্দের চর্চা জীবের দুই দিকে যেতে পারে। যে সত্তার আনন্দ দুই দিকে যায়—সে তটস্থ জীব। যাদের আনন্দ একদিকে, যারা ভগবানের অংশ এবং ভগবানের আনন্দের দিকেই তাকায়, তাঁরাই হচ্ছেন ভগবানের পরিকর। তাড়া স্বরূপ শক্তির দ্বারে আনন্দ পান। জীব শক্তির আনন্দ অনুভব আছে, জড়ের আনন্দের অনুভব নেই। জীব শক্তির সঙ্গের অনুভূতি আছে কিন্তু জড়ের তা নেই। এ জন্য আমাদের গুরুবর্গ জীবকে বলেছেন 'চিদেকরস'। জীব শক্তি দুটোরই সঙ্গ করতে পারে,

সেইজন্য সে জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। কিন্তু স্বরূপশক্তির একমাত্র ধর্ম হলো ভগবানের সঙ্গ করা। জীব ইচ্ছা করলে জড় আনন্দ পেতে পারে চিদ আনন্দও পেতে পারে। এই জীব শক্তির জন্যই ভগবানের করুণা। স্বরূপ শক্তির জন্য করুণার বা অবতারের প্রয়োজন নাই। সেখানে নিত্য আনন্দ। জড়ের সঙ্গ করবার কোন শক্তি নেই। জীবের সঙ্গ লালসা আছে। এই সঙ্গের ফলে জীবের তিন অবস্থা হ'তে পারে। যখন জড়ের সঙ্গ করে, তখন সে বদ্ধ, যখন নিজের অর্থাৎ আত্মার সঙ্গ করে তখন সে মুক্ত ; যখন সে তার একমাত্র প্রীতির আস্পদ ভগবানের সঙ্গ করে তখন সে ভক্ত। জীবের ত্রিবিধ অবস্থা—বদ্ধ, মুক্ত ও ভক্তাবস্থা।

ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত অন্যের সঙ্গ করলে, জীব নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। যাদের মায়িক সঙ্গের বাসনা জাগে, তাদের নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। কারণ জীব অণু মায়া বিভু। বিভুমায়া দ্বারা অণুজীব আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। ভগবান গীতায় বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

—(গীতা ৭।১৪)

অর্থাৎ "এই দৈবী গুণ ময়ী আমার শক্তি, মায়া দুরতিক্রম্যা, তথাপি যাহারা একমাত্র আমার শরণাগত হন, তাঁহারা এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।"

সঙ্গই জীবন। সঙ্গ না বাছতে পারলে অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গ না করলে, ভগবানের অভিনিবেশ ছেড়ে অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ করলে জীবের দুঃখ ও ভয় হয়।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা"
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যযোহস্মৃতিঃ।
তন্মায়যাতে বুধ আভজেত্তং॥ —(ভাঃ ১১।২।৩৭)

সঙ্গের দ্বারাই সঙ্গের দোষ যাবে শ্রীকপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহুতিকে বলছেন—মায়িক সঙ্গ হইতে পার হওয়ার একমাত্র উপায় সাধু ভক্তের সঙ্গ।

"প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম॥"

—(ভাঃ ৩।২৫।২০)

জড়সঙ্গ রহিত হতে হবে। বদ্ধ হলে জড়ের সঙ্গ হয়। এই সঙ্গই জীবের দুঃখের কারণ। এই দুঃখ দেয় কে? ভগবান বা মায়া কেহ এ দুঃখ দেয় না। জীব ভগবদ বিমুখ হয়ে জড়সঙ্গ চায়, সেইহেতু মায়ার ধর্ম তাহাকে স্পর্শ করে। মায়া জড়া সে কি করে সঙ্গ দিবে? জীব মায়াতীত হয়েও যখন মনে করে আমি মায়িক তখনই তার জড়ের সঙ্গ হয়। সেই হেতু ভাগবত বলছেন—"পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে .... ভাঃ। জীব মনে করে – আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, অহংকার থেকে আরম্ভ করে ২৩টি মায়িক তত্ত্বের মধ্যে সে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। জড়ীয় মন, বুদ্ধি অহংকার দ্বারা সে সুখ পাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এটা লয় হয়ে যাবে। কারণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় মায়ার ধর্ম্ম। স্বরূপ শক্তির পরিণাম নিত্য বলে লয় হয় না। জীব বাসনানুসারে দুটি অবস্থায় থাকে। জড়ের সঙ্গ বাসনা করে বদ্ধ হয়, আর আত্ম সঙ্গ, ভগবৎ সঙ্গ করে মুক্ত ও ভক্ত হতে পারে। তবে সে নিজের চেষ্টায় পারে না জড় আসক্তিতেই সে জড়ের সঙ্গে বদ্ধ হয়ে পড়েছে। আবার সঙ্গের দ্বারাই আসক্তি ছিন্ন হয়। কে আসক্তি ছিন্ন করে দিতে পারে? সাধু,—সাধু কে? যে সৎবস্তু অর্থাৎ আত্মা বা ভগবানের সঙ্গ করে, সেই সতের সঙ্গ না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের বন্ধন যাবে না। সাধু আত্ম-সঙ্গকারী অথবা ভগবৎ সঙ্গকারী। আত্মসঙ্গকারী মুক্ত, ভগবৎ-সঙ্গকারী ভক্ত, মুক্ত সাধুসঙ্গ দ্বারা জীব মুক্ত হয়। ভক্ত সাধুসঙ্গ দ্বারা মুক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গ ও সেবা পেয়ে ভক্ত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলছেন "কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় ভক্তসঙ্গ" জীবের জড় সঙ্গ বাসনা সাধুর সঙ্গ দ্বারা যায়। ভগবানের একনাম 'সদনুগ্রহ'।

ভগবানকে ব্রহ্মা স্তব করছেন,—"সদনুগ্রহো ভবান" অর্থাৎ সাধুই আপনার অনুগ্রহ। জীবকে সাধুর দ্বারাই ভগবান করুণা করেন। ভগবানের করুণাই জীবকে ভক্ত করে। এই করুণা ভক্তের মাধ্যমে আসে। ভগবান জীবকে কৃপা করেন—নিজে অবতরণ করে অথবা ভক্তকে অবতরণ করিয়ে। ভগবানের এই করুণা লীলা ভাগ্যবান জীব যখন বুঝতে পারে, তখন ভগবৎ চরণে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শোধ করতে পারে না। ভগবান জীবকে সঙ্গ দিচ্ছেন এই করুণার দ্বারে। কিন্তু জীব স্ব-সুখ বাসনা বশতঃ ভগবানের সঙ্গ পায় না। ভগবান সেব্য, জীব সেবক। নিষ্কপট সেবা ব্যতীত সেবক জীব সেব্য ভগবানের সঙ্গ পেতে পারে না। ভগবান অবতার লীলা প্রকট করে তার নাম, বিগ্রহ, কথা ও তাঁর ভক্ত নিত্যকাল প্রপঞ্চে প্রকট রেখেছেন। জীব যখন সেবোন্মুখ হয়ে ভগবানের এই নাম, বিগ্রহ ও কথা ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে সেবা করতে পারে তখনই তার বিশুদ্ধা ভক্তি-লাভে যোগ্যতা আসে। সেইহেতু ভগবান ভক্তি-বিধি দিতে বলেছেন,—"মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শন-স্পর্শনার্চ্চনম পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহবগুণকর্মানুকীর্ত্তনম।। সৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধামদনুধ্যানমুদ্ধব।

শ্রীগৌর সুন্দর জীবকে প্রেম ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতার লীলা প্রকট করে ভক্ত ও ভগবানের অবতার কথাই সঙ্গই শিখিয়েছেন অন্য কিছু শিখান নাই। গৌর নিতাই দুই ভাই জীবের হৃদয়ের ভক্তি ইতর বাসনা দুর করে ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গ কুশলতা শিখিয়ে প্রেম ভক্তি জীবনের আদর্শ দেখিয়েছেন। সেইহেতু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলেছেন, **"দুইভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।। এক ভাগবত – বড় ভাগতবশাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রস পাত্র। দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ।।" —(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৮-১০০)**

শ্রীভগবান অর্জিত হলেও তিনি ভক্তির দ্বারে জিত বা বশীভুত

হন। ভক্তি অর্থাৎ প্রীতি—উহা প্রীতির বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে থাকে। ভগবান প্রীতির বিষয়, ভক্ত প্রীতির আশ্রয়। যেখানে প্রীতি সেখানে সঙ্গ বা স্মৃতি। প্রীতিই সঙ্গের জীবন এই প্রীতি থাকে ভক্ত ও শ্রীভগবানের মধ্যে। সেহেতু ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমান। ভগবান ভক্তভক্তিমান। এই ভক্তি ভগবানের নিজ অন্তঃরঙ্গা শক্তি হলাদিনীর বৃত্তি। ইহা ভক্ত-ভগবানের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ভক্তের দ্বারে ভগবানকে আহ্লাদিত এবং ভগবৎদ্বারে ভক্তকে আহ্লাদিত করিয়া পরস্পরকে বশীভূত করান। ভগবান স্বয়ং বলছেন ভক্তসঙ্গ আমাকে যে প্রকার বশীভূত করে আমার অন্য কোন স্বরূপ আমাকে সেইরূপ বশীভূত করতে পারে না, ভাগবত এই ভক্তির মহিমা তারস্বরে কীর্ত্তন করছেন। সেই হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে ভক্তির অমল প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। ভক্ত কর্তৃক ভগবান যেমন বশীভূত হন, ভক্তির প্রতি পাদক ভাগবত শাস্ত্রও ভগবানকে সেইরূপ বশীভূত করতে সমর্থ। সেইহেতু ভাগবত বলছেন – "ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" .... ভাঃ এই ভাগবত ভগবানের অবতারের মহিমা বা তার নাম, রূপ, গুণ, লীলার মহিমা তারস্বরে কীর্তন করে জীবকে এই লীলার শ্রবণ কীর্তন শুদ্ধা ভক্তি যাজনের শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলছেন—

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমূত্তিতীর্ষো।
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য॥
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ,
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য। —(ভা ১২।৪।৪০)

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার লীলা প্রকট করে ভাগ্যবান জনগণকে সাক্ষাৎ সংগ দান করে অন্তর্ধান লীলা করলেও তার পরবর্তী কালে ভাগবত রূপে স্বয়ং প্রকটিত থেকে নিজ নাম, রূপ, গুণ, লীলার সংগ অদ্যাপিও ভাগ্যবান জীবগণকে দিয়ে যাচ্ছেন— ইহাই তাহার অহৈতুকী করুণার পরিচয়। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তগনের দ্বারে ভাগবত আস্বাদন করে, ভক্ত

ও ভাগবতের সংগ দ্বারা প্রেম জীবন কি ভাবে পুষ্টি লাভ করে তাহা তিনি তার শেষ লীলায়, স্বরূপ দামোদর ও রায়-রামানন্দের নিকট প্রেমার্ত্ত হয়ে ভাগবত শ্রবনের লীলা প্রকট করে দেখিয়েছেন, তাঁদের মুখে ভাগবত বর্ণিত ভগবানের লীলা মাধুরী শ্রবণ করে প্রেমাবিষ্ট হয়ে তাঁহাদিগকে ভূরিদ ভূরিদ বলে প্রচার করছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অতি বিরহে কাতর থাকতেন তখন এঁরা দুই জন ভগবানের লীলাকথা কীর্ত্তন করে তাঁহাকে ভগবানের সংগ দিয়ে সুখী করতেন।

ভক্ত সঙ্গে ভগবৎ লীলা কথার আস্বাদনই প্রেমময় জীবনের আদর্শ—ইহাই গৌর সুন্দরের শেষ লীলার শিক্ষা। প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে প্রেমপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাবতের আস্বাদনই প্রেম জীবনের আদর্শ—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা।

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা যেন নিত্যকাল ভাগবত গুরু ও ভাগবত শাস্ত্রের জয় বন্দনা করতে পারি ভাগবত-শাস্ত্র ও ভক্ত-ভাগবত আমাদিগকে অমায়ায় করুণা করুন, শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

—❖—

সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে গোলোক—বৃন্দাবনে লীলা করছেন, সেই 'রূপের' ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। তাঁহাকে ভজন করবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তারস্বরে ঘোষণা করছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীগনের ন্যায় ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধির ভজন করতে বলেন নাই।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের চমৎকারিতা ও বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহাদের এই বিলাসের কাছে যেতে হলে, - সেই ভাব, সেই বেশ, সেই আচারে যেতে হবে; কর্ম্মী-জ্ঞানীদের এইভাব নাই, তাদের সে জ্ঞাণ ও

নাই; তাই তারা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। যাদের যেই ভাব সেই ভাবে সেই সেই দেব-দেবীর কাছে যায় এবং সেই সেই ফল পায়।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥"

—(গীঃ ৪।১১)

ব্রজের কৃষ্ণের কাছে যেতে হলে, সেইভাবে ভাবিত হ'লে—তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তাঁর কাছে আর অন্য সকলের কাছে যাওয়া এক নয়, যেমন বাবার কাছে যাওয়া আর কাকা-জ্যেঠার কাছে যাওয়া এক নয়।

জ্ঞানীগণ শ্রীকৃষ্ণকে মায়িক বুদ্ধিতে পূজা করেন। তারা জ্ঞানের প্রচারক। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তির প্রচারক—তিনি ঐ সকল বৈদিক জ্ঞানীদের কাছে ভক্তির কথা তুলে ধরলেন। ব্রহ্মানন্দী মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীসার্বভৌমের কাছে মহাপ্রভু ভক্তির কথা বললেন। পরাবিদ্যার দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করলে ভক্তিলাভ হয়—প্রেমলাভহয়, ঐ ভাবে সাধন না করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণিত—"গোপ কুমার–নারদ" সংবাদে জানা যায় যে,—দেব-দেবীকে পূজা করা,—বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণকে পূজা করা—এমন কি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করা এবং ব্রজেশতনয় শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করা এক নয়। ঈশ্বর ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলে, তাঁর ঈশিতা শক্তির কাছে সম্ভ্রম বুদ্ধি আসে—দূরগত সম্বন্ধ থাকে। দেবকীদেবী পুত্রকে ঈশ্বর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত দেখে সম্ভ্রমের সহিত পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করলেন। কিন্তু মাতা যশোদার কাছে সে মর্য্যাদা—সে সম্ভ্রম নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত পুত্র বুদ্ধিতে মারছেন—বাঁধছেন—শাসন করছেন; মর্য্যাদার বালাই নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও তাহা স্বীকার করে বাৎসল্যরসের আস্বাদন করছেন। ব্রজ সখাগণের নিকটে সখ্যরস এবং ব্রজগোপীগণের নিকট হইতে প্রেমবশ্যতা স্বীকার করে মধুর রসের আস্বাদন করছেন। ব্রজগোপীগণের সঙ্গে রাগচালিত

মধূর প্রেমে নিত্য আবদ্ধ। কিন্তু দ্বারকায় বিবাহ সম্বন্ধযুক্ত পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীগণের সে মধুর ভাব নাই। একমাত্র ব্রজে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মধুর রসের আস্বাদন করেন। ইহা অপ্রাকৃত প্রেম-রাজ্যের লীলা। শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজলীলার মাধুর্য্য চমৎকারিতা তাঁর অন্য কোন প্রকাশ বা বিলাস স্বরূপের মধ্যেও নাই। গোলোকপতি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর নিত্য পরিকরগণের সঙ্গে তাঁর চিন্ময় ধাম হইতে এই ভৌম প্রপঞ্চে শ্রীবৃন্দাবন ধামে অবতার লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত প্রীতিরস আস্বাদন করেন। তাঁহার এই লীলা নিত্য। দেবতাগণ আধিকারিক রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন, তাঁরা অবতার নন। রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মায়াবদ্ধ জীবগণকে অপ্রাকৃত প্রীতিলীলা পরিদর্শন করাইবার জন্য গোলোক হ'তে এই ভৌম জগতে নেমে আসেন। ইহা জীবগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশেষ করুণা। শ্রীশুকদেব—আদি ভক্ত মহাজন শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রে বলেছেন— ভক্তিসাধন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির কথা বর্ণিত আছে। সেই বিশুদ্ধ অমলাভক্তি লাভ করতে হলে ভগবানের গুণ-লীলা-আদি বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করতে হয়, শুধু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ বা পাঠ করলেও হবে না, কারণ উহাতেও কারও কারও বুদ্ধিনাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণলীলাদি শুনতে হবে, উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কথা 'বাচক' রূপে এ জগতে প্রকাশিত। তাঁর গুণাদি কীর্ত্তন করার মত তাঁর প্রীতিকর আর কিছুই নাই। আর্ত্ত ও অর্থার্থী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করা নিম্নস্তরের সাধন। কারণ উহাতে স্বসুখ হেতু যুক্ত থাকে, হরিতোষণ বৃত্তির অভাব আছে।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুনো হরিঃ॥"

—(ভাঃ ১।৭।১০)

শ্রীহরির এমন চিত্তাকর্ষকগুণ যে আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভজন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর এবম্বিধ ভাগবত ধর্মের কথা প্রচার করে মনুষ্য হ' তে পশু-পক্ষী পর্যন্ত সকলকে হরি ভজনে আকৃষ্ট করেছেন।

শ্রীনারদ গোপকুমার কে বললেন—"হে গোপকুমার! আমার হৃদয় গুহায় যে রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহা আমি এতদিন কাহাকেও প্রকাশ করি নাই, তোমাকে এখন জানাইতেছি, শোন। ভগবানের বিভিন্ন অবতার আদির অনেক 'গুণ' আছে সত্য, কিন্তু স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'গুণ' উহা হইতে অধিক, তাহা হইতেও সুমধুর। উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'গুণ'—রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের কথা শুষ্ক। ভগবানের 'হরি' কৃষ্ণ, 'রাম', প্রভৃতি স্বরূপে 'হরণ' 'আকর্ষণ' ও 'রমণ'—এই সব গুণ আছে। ঐসব ভাগবৎ স্বরূপের নাম শ্রবণ-কীর্তন করলেই জীবের মন তাঁর শ্রীচরণে আকৃষ্ট হয়ে যায় – এমন মধুর ভাব অন্য কোন উপায়ে হয় না। ব্রজের কৃষ্ণের যে কি গুণ, তাহা না শুনলে ভজনে প্রীতি জাগবে না। তাঁর গুণের কথা শোন। "ইত্থম্ভুতগুনোহরিঃ" তাঁর গুণে সমস্ত জগত মুগ্ধ হয়। তার গুণ শ্রবণই ভক্তির মূল কথা। হে গোপকুমার! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত গুণের কথা শোন—যাহা ভগবানের অন্যান্য স্বরূপে নাই। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পরিকরগণের সঙ্গে লৌকিকভাবে সখা, পিতা, মাতা ইত্যাদির সম্বন্ধে এবং গোপীগণের সহিত রাগচালিত সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বিচিত্র লীলা করেন। সেখানে বিধির কোন বালাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্য্যলীলা শুধু গোলোকেই আছে—অন্য কোথাও ইহা নাই। বদ্ধজীবগণ এই লীলাকে শ্রীকৃষ্ণের মায়িক লীলা মনে করে। কিন্তু তাঁর লীলা অপ্রাকৃত—দিব্য; প্রাকৃত নহে।

শ্রীকৃষ্ণ সেবায় প্রীতি হলে তাঁর গুণ শুনতে ভাল লাগবে। শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবনে রুচি না হলে, সেবায় প্রীতি হতে পারে না। যাঁরা কৃষ্ণভক্ত

তাঁরা শুধু কৃষ্ণ গুণগান কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করবেন। কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তিত হলে প্রেমের বালাই অমঙ্গল অনর্থাদি বিনষ্ট হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণ ছড়াইবার জন্য কৃপা করে 'বাচক' রূপে গোলোক থেকে এ ভূলোকে অবতরণ করেছেন, আবার ভক্তগণ তাঁর নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করলে তিনি অমনি গোলোক থেকে নেমে আসেন। শ্রীনাম স্বয়ং নামীরূপে দেখা দেন।

ভগবান বলছেন –

"মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

যেখানে আমার ভক্তগণ আমার গুণানুকীর্ত্তন করেন, সেখানে আমি অবস্থান করি।

বর্ণাশ্রম ধর্মপালন, জ্ঞান-বৈরাগ্যের সাধন বা ফুলচন্দনে শ্রীবিগ্রহের অর্চন-আদি করলে শুধু হবে না। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ আদি শ্রবণকীর্ত্তন না করলে সবই পণ্ডশ্রম হবে—তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁর কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করলেই তাঁর সুখ হয়। ইহাই তাঁর প্রতি বড় সেবা। মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই শিক্ষাই জগতে দিয়েছেন।

মহাভাগবত শ্রীযমরাজ বলছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগে ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

—(ভাঃ ৬।৩।২২)

একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায়। তাঁর নাম-কীর্তনাদিকেই "ভক্তিযোগ" বলে। শুধু কাঁসর-ঘণ্টা, করতাল আদি না বাজাইয়া, তাঁর গুণ-কথা কীর্ত্তন রূপ বাজনা বাজাতে হবে। কর্ণ দ্বারা তাঁর কথামৃত পান করতে হবে। খবরের কাগজে প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষের প্রশংসা সূচক সংবাদ প্রকাশিত হলে তাঁর বড় উল্লাস হয়,—সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুণ-মহিমা কথা শুনলে তিনি বড়ই উল্লসিত হন।

তাঁকে সুখী করার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারে তাঁর সেবা করতে হবে, —ইহাই সাধন-ভজনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাঁর গুণাদি শ্রবন বা কীর্ত্তন করলে তিনি ভক্তের বশীভূত হয়ে যান।

হে গোপকুমার! এখন গোলোকবিহারী অজিত ভগবানের গুণের কথা শোন। তিনি সাক্ষাৎ রূপে সর্বদা এই ভৌম জগতে মর্ত্ত্য জীবের নয়ন গোচরিভূত না হইলেও তিনি 'নাম' রূপে নিত্যকাল এখানে প্রকটিত আছেন। তাঁহার 'নাম' প্রীতিযুক্ত হয়ে কীর্ত্তন করলে তিনি কান খাড়া করে শ্রবণ কেন। তাঁর চতুর ভক্তগণ যখন সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁর পরিচর্য্যা করেন এবং তাঁর গুণানুবাদ করেন, তখন তিনি অজিত হ'য়েও ভক্তগণের কাছে জিত হয়ে যান। এইটাই ভক্তগণের ভজন–চাতুর্য্য।

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

মহাপ্রভুর ভক্তগণ বড় কৃপা করে, এই সব কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের এই অতুলনীয় দান জগৎ জীবের অমূল্য সম্পদ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তলীলার মধ্যে বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই লীলা তিনি যখন আস্বাদন করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি গোলোক ছেড়ে—তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বের পোশাক চেহারাদি পরিত্যাগ করে এমনকি বহুপ্রিয় পরিকরগণের সংগ ছেড়ে নরমূর্ত্তিতে ব্রজভূমিতে চলে আসেন। এখানে মা যশোদা কৃষ্ণকে দামের দ্বারা বন্ধন করেন, ব্রজবালকগণ তাঁর সঙ্গে খেলা করেন, তাঁর গোষ্ঠলীলার সঙ্গী হন। তিনি তাঁর প্রিয়গণের সঙ্গে প্রাকৃতবৎ লীলা করেন। তিনি ভক্তগণের প্রেমে বশীভূত হয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে আনন্দ আস্বাদন করেন। ব্রজের ভক্তগণ কৃষ্ণকে ছোট মনে করে—পাল্য মনে করে, তাঁর প্রতি প্রীতির ব্যবহার করেন। তিনি মথুরায় আবির্ভুত হলেও সেখানে ঐ প্রকার মধুর ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তিনি ব্রজে ঈশ্বর

হয়েও তাঁর ঈশিতা গোপণ করে মাধুর্য্যলীলা আস্বাদন করেন। ইহাই তাঁর অলৌকিক লীলা। ব্রজের পরিকরগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বুদ্ধি করেন না। মা যশোদা তাঁকে কখন বাঁধেন, কখনও আদর করে কোলে নেন। তিনি জানেন—"কৃষ্ণ আমার ছেলে" ব্রজভাব বিনা ব্রজের কৃষ্ণ সেবা লাভ হয় না। ব্রজের কৃষ্ণ স্বীয় পার্ষদগণকে কৃপা পূর্ব্বক নিজ সুখকর সেবা দান করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত রূপ-মাধুরী নিয়ে—প্রিয় পার্ষদগণসহ এই ভৌম–বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশের জন্য প্রকটিত হন। তাঁর শ্রীমূর্ত্তি—তাঁর স্বরূপ শক্তি যোগমায়া কর্তৃকই এই ভৌম-জগতে প্রকাশিত হন। উহা প্রাকৃতবৎ নশ্বর নহে। সেই মাধুর্য্যময়রূপে জগৎ মোহিত হয়। এমন কি তিনি নিজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—(৩।২।১২)

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভঃগর্দ্ধে পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

—❖—

পরিশিষ্ট

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
- শ্রীপুরীধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
- প্রকৃত উৎসের সন্ধানে
- রচনামৃত
- পরমানন্দময় ধামের ধন
- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত
- শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
- প্রেমময় অন্বেষণ
- শাশ্বত সুখনিকেতন
- সুবর্ণ সোপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- শ্রীশিক্ষাষ্টক
- অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের বহির্গর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর :

- শরণাগতি
- কল্যাণকল্পতরু
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়
- শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

বিবিধ

- শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
- শ্রীগৌড়ীয়-গিতাঞ্জলি
- শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালি
- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
- শুদ্ধভক্তি সাধন সম্পদ
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
- শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ
- শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ
- শ্রীগর্গ-সংহিতা

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের কেন্দ্রসমূহ

ভারত

আন্তর্জাতিক কার্য্যালয়

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোড,
কোলেরগঞ্জ, পোষ্ট অফিস ঃ নবদ্বীপ
জেলা - নদীয়া, পশ্চিবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২,
ভারত, ফোন : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

নৃসিংহপল্লী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৃসিংহপল্লী (দেবপল্লী), স্বুবর্ণবিহার,
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩১৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দম দম পার্ক (বিপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি, চিড়িয়ামোড়,
পোষ্ট - এয়ারপোর্ট, কলকাতা,
পিন - ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হাপানিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
পোষ্ট এবং গ্রাম - হাপানিয়া
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

বামুনপাড়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
গ্রাম - বামুনপাড়া, পোষ্ট - খানপুর
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুরী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌড় বাটসাহি
পুরী, পিন - ৭৫২০০১, ওড়িষ্যা, ভারত
ফোন : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০, ৯১২৪৪৩৫৪৭৪

গোবর্দ্ধন

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
দশবিসা, পোষ্ট - গোবর্দ্ধন
জেলা - মথুরা, পিন - ২৮১৫০২
উত্তর প্রদেশ, ভারত
ফোন : ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বৃন্দাবন

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও মিশন
১১৩ সেবা কুঞ্জ, বৃন্দাবন, জেলা - মথুরা,
পিন - ২৮১১২১, উত্তর প্রদেশ, ভারত,
ফোন : ৮২১৮৩৯৯৩০৯

শিলিগুড়ি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫, নেতাজী সরনি, শিলিগুড়ি,
পিন - ৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

একচক্রা ধাম

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম),
পোষ্ট অফিস - বীরচন্দ্রপুর,
জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২৪৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

নিউ দিল্লি

শ্রীলা শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তি যোগা
কালচারাল সেন্টার, ফ্ল্যাট - ৬ (টপ ফ্লোর),
হাউস ২৩৯৪, তিলক স্ট্রীট, (ইম্পেরিয়াল
সিনেমার পিছনে), চৌনা মাণ্ডি, পাহারগঞ্জ,
নিউ দিল্লি - ১১০০৫৫
মোবাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১

তারকেশ্বর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
ফোন : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

গঙ্গা-সাগর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চকফুলডুবি, পোঃ - সাগর,
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুবেড়িয়া
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কাজিয়াখালি, ৭১১৩১৫
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

মহিলা আশ্রম কালনায়
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার
গ্রাম - শাশপুর, পোঃ - কালনা,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

নাদনঘাট
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - নাদনঘাট,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

মেদিনীপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, পোঃ - মেদিনীপুর,
জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মুর্শিদাবাদ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাদিয়া, পোঃ - কান্দী,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - ইসলামপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

দিনহাটা
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ - দিনহাটা
জেলা - কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

বেতুড়
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
বেতুড়, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

নৈহাটী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৈহাটী, জেলা - উঃ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

পূর্ব বর্ধমান
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও সদাশিব আশ্রম
রতনদিঘি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল্লী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্লী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাটোয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - মেজিয়ারী, থানা - কাটোয়া
জেলা - পূর্ব বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

নোর্থ আমেরিকা

ইউ.এস.এ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৯০০ নর্থ রেডিও গালর্চ রোড
সোকোয়েট, সিএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
ফোন : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৬৯ই, সৈনত জেমস স্ট্রীট
সান হোসে, সিএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
ফোন : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মিশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ট সল্ট লেক সিটি,
উটাহ, ৮৪১০২

হাওয়াই

শ্রী চৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ মিশন
১৬২৫১ হালিয়াখালা হাইওয়ে, কুলা, মাউই,
হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
ফোন : ৮০৮৮৭৬৬৭২১

কানাডা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্ট্রীট,
স্যুরে, ভি ৩ টি, ৪ এম ৪, কানাডা
ফোন : ৬০৪৯৬৩০২৮০

মেক্সিকো

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে ৬৯-বি, নং ৫৩৭, ফরাসিসি, সানতা
ইসাবেল, কানাসিন, ইউকাটন সি.ডি. ৯৭৩৭০,
মেক্সিকো
ফোন : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
রিফরমা নং. ৮৬৪, সেক্টর হিডালগো
গুয়াডালাহারা, জালিসকো, সি.ডি. ৪৪২৮০,
মেক্সিকো,ফোন : ৫২-৩৩ ৩৮২৬-৯৬১৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
দিয়েগো দে মনটেমায়োর ৬২৯,
সেনট্রো, মনট্রেরারী, এন. এল.
সি. পি. ৬৪৭২০,
ফোন : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
এভিনিডা দে লাস রোসাস ৯
ফ্রাকিওনামাইএনটো ডেল প্যারাডো
তাইওয়ানা, বি.সি., সি.পি. ২২৪৪০
ফোন : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ দি ভেরাক্রুজ, এ.আর.,
জুয়ান দে দিওস পিজা ১৫৭
(এন্টার ইগনাসিও দি লা লিয়াভে নিগারেট)
ভেরাক্রুজ, ভেরাক্রুজ, সি.পি. ৯১৭০০
ফোন : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কোলোন পয়েন্ট ২১৩ - ইনট্রেরি ৭
কোল. সেনট্রো. সি.পি. ০৯৪৩০০, ওরিজাবা,
ভার., মেক্সিকো,
ফোন : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ফেমানডো ভিলালপ্যানডো নং. ১০০ - ইনটি.
১০৩ কোল. গুয়াডলুপে ইন. ডেলিগাসিওন
এ্যালভারো ওবারেগন, সি.পি. ০১০২০ মেক্সিকো
সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে জেড ইডিএফ. ৪০ আইএনটি ২২ কল. ইউ
এইচ আলিয়ানজা
পপুলার রিভোলিউসাইওনারিয়া,
ডেলিগাসিওন কোয়াওকন, সি.পি. ০৪৮০০
মেক্সিকো সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
জোয়াকুইন রিভাডেনিয়ারা নং. ৫০
কল. জারডিনেস দে গুয়াডলুপে
মোরেলিয়া, মিচ., সি.পি. ৫৮১৪০
ফোন : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ক্যারিটেরা টাইকুল - ছাপাব, কিলোমিটার ১.৪,
টাইকুল, ইউকাটন, মেক্সিকো

সাউথ আমেরিকা

ব্রাজিল
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
কৃষ্ণ শক্তি আশ্রম, পি.ও. বক্স ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডু জোরডাও, সাও পৌলো, ব্রাজিল,
ফোন : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এবং কেসা প্রেমা (রেস্টুরেন্ট)
এ্যাভেনিডা ইউসেবিও মাটোসো, ২৪৬
পিনহেয়িরোজ, সাও পাউলো - এস পি সেপ:
০৫৪২৩-০১০
ফোন: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ পোরটো এলিগ্রি
ইস্টাডা ছাপজু ডু সোল, ৬২০
পোরটো এলিগ্রি - সাউথ ব্রাজিল
ফোন : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এবং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭

ভেনেজুয়েলা
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম,
আবেনিদা টুয় কন আবেনিদা ছামা, ক্বিন্তা
পরমকরুণা, কারাকাস, ভেনিজুয়েলা
ফোন : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কল্লে ৭৭ এন্ত্রে আবেনিদাস
১০ ও ১১, ফ্রেন্তে অ এনেলবেন
ফোন : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯

পার্সেলামেন্ত মিরান্দ সেক্টর দে, কাল্লে তেহেরো
কন গুন্ত, কুমানা, এস্তাদো সুক্রে, ফোন:
৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইকোয়াডর

শ্রীলশ্রীধর স্বামী সেবা, আবেন্যু জেনেরেল
রুমিনাহুই, কাল্লে এ৭আ, ন৯-২৩৬, আর্মেনিয়া,
কোনোকোতো, ১৭০৮০১, কুইটো, ইকোয়াডর
ফোন : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১

কলোম্বিয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, বোগোটা, কার্রেরা ৭৪আ,
নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
ফোন : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩

শ্রীশ্রীল গোবিন্দ সেবা আশ্রম, কেএম ৪, পাইপা
বিয়, পান্তানো দে বারগাস, পিন-১৫০৪৪০-
১৫০৪৪৯,
ফোন : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউরোপ

ইংল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীণ স্ট্রীট
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.কে.
ফোন : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভক্তি যোগ ইনস্টিটিউট,
গ্রেভিলে হাউস, হাজেলমেরে ক্লোজ
ফেলথাম, মিডিলসেক্স, টি ডব্লউ ১৪ ৯পি এক্স,
ইউ.কে., ফোন : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com

আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাটেন: বরিয়ান টাইমোনি
(বালিনামোর কো. লেইট্রিম)
ফোন : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১
১৪, পার্কসাইড, ওয়েক্সফোর্ড টাউন,
কান্ট্রি ওয়েক্সফোআয়ারল্যাণ্ড
ফোন : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫

ইটালি
ভিলা গোবিন্দ আশ্রম
ভায়া রিগোনদিনো, ৫,২৩৮৮৭ ওলজিয়েট মোল
(এল সি) ফ্রাজ, রিগোনডিনো রোসো, ইটালে,
ফোন : ৩৯ ০৩৯ ৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোম
ভেদাভিলা যোগা স্টুডিও, ভায়া দি সন মাইচেলে,
১২০০০১৫৩ রোমা, ইটালে
ফোন : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬

মালটা
দি লোটাস রোম যোগা সেন্টার মঠ
ফোন : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫

নেদারল্যাণ্ডস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাজোরেনওয়েগ ৮০
১৩৩৯ ভি পি আলমেরে, ন্যাদারল্যান্ডস
ফোন : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০

হাঙ্গগ্রে

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানড্রাস নোভাক নাগিভানওয়ায়ি ইউ টি
৫২, এইচ-১০২৫ বুডাপেস্ট
হাঙ্গগ্রে, ফোন : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
ইন্ডোর সেজাপেসি— আনন্দ বর্দ্ধন ডি.
এইচ-১২২৩ বুডাপেস্ট
মুভেলোডস উটকা ১৮/বি, হাঙ্গগ্রে

টুরকে

শ্রী গোবিন্দ মঠ যোগা সেন্টার
আবদুল্লা কেভডেট সোকক
নং ৩৩/৮, কানকেয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টুরকে
ফোন : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এবং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২

উকরাইন

কাইভ. হারমাতনয়া স্ট্রীট, ২৬/২,
"রোস্টক" প্লেস অফ কালচার
ফোন : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
১১/৪, পানফিলোসেভ স্ট্রীট
জাপোরোজিয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
ফোন : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪

পর্তুগাল

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ দো
সোব্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো,
৩০২০-১৪৩,কোইম্ব্র

রাশিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কাল্চারেল সেন্টার
মস্কো, বলশয় কিসেল্নিয় টুপিক ৭/২
ফোন : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
সেন্টপিটার্সবার্গ, লাহ্টা
ফোন : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
তোমস্ক, াকাদেম্গোরোদোক, বাবিলোবা স্ত্রিট
১৬-৯০, ফোন : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবখাজিয়া

শেলো দ্জীঘুটা, ২য় আপ্সিল্স্কিয় টুপিক ১৫
ফোন : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮,
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এশিয়া

থাইল্যান্ড

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ মোওবান ওরাবোডিন
এসওআই ওয়াটসাডেট
পাটুমাথানি-রংসিট রোড, পাটুমাথানি,
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ফোন : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মালেয়েশিয়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা
আশ্রম, সাইটিয়ান
ফোন : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২-
৫০১২৮০৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সাধু সংগ্রাম খলঙ্গ.
নং ১৪, লোরঙ বেনধারা ৪৬এ,
তামান মেওয়া বারু, ৪১২০০ ক্লাঙ্গ,
সেলানগোর, মালেয়েসিয়া,
ফোন : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
পেটালিঙ জয়া সার্ভিস সেন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান
খানাগাপুরম, ৪৬০০০ ফেটালিঙ জয়া,
সেলানগর, মালেয়াশিয়া, ফোন : +৬০-১-
৬৩৩৮৬১৩০

সিঙ্গাপুর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সিংগাপুর
এবং গোকুল ভেজিটেরিয়ান রেসষ্টুরেন্ট
১৯ এবং ২১, আপার ডিকসন রোড,
সিঙ্গাপোর ২০৭৪৭৮, ফোন :
৬৩৪৩৯০১৮
মোবাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এবং
৯১৮৫৬৬১৩

ফিলিপাইন্স

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
প্রযন্তে : গোকুলানন্দ প্রভু
২৩, রুবি স্ট্রীট, কাশিমিরো টাউনহাউস,
টালন ইউনো. লাস পিনাস সিটি,
মেট্রো মানিলা, জিপ কোড ১৭৪৭,
ফোন : ৮০০-১৩৪০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফিলিপাইন্স ব্রাঞ্চ (ইসানি দেবী দাস)
লট ১৫ ব্লক ৮, উডব্রীজ সাবডিভিসন,
পোব্লাসিওন, প্যানডি, বুলাকান,
ফিলিপাইনস, ৩০১৪
ফোন : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউথ পেসিফিক

অস্ট্রেলিয়া

শ্রীগোবিন্দ ধাম
পি.ও. বক্স ৭২, উকি. ভায়া মুরউইলমবা,
এন.এস.ডব্লিউ. ২৪৮৪, অস্ট্রেলিয়া,
ফোন : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, বরিয়ান স্ট্রীট বরিয়ান্সমেড
চার্মস, কিউএলডি, অস্ট্রেলিয়া ৪৮৭০
ফোন : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

নিউজিল্যাণ্ড

১০৩০ কোটেসভাইল রিভারহেড হাইওয়ে,
রিভারহেড, অকল্যান্ড
নিউজিল্যাণ্ড, ফোন : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

ফিজি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
পি.ও. বক্স ৪৫০৭, লৌটকা, ফিজি
ফোন : ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭, ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭

আফ্রিকা

সাউথ আফ্রিকা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
৪৪৬৪, মৌন্ট রেইনে ক্রেসেন্ট
লেনাসিই সাউথ, এক্সটেন্সন ৪
জোহানেসবার্গ ১৮২০, ফোম : ০১১ ৮৫২
২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফেনিক্স ৪০৬৮, ডুর্বন, ক্বাজুলু নাটাল
ফোম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মরিশাস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ আন্তর্জাতিক
নবদ্বীপ ধাম স্ত্রিট, লোং মাউন্টন
ফোন : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওয়েবসাইট :
scsmathinternational.com

ইমেইল :
info@scsmathinternational.com

শ্রীগরুদেবই শিষ্যের একাত্র আশ্রয়। যে শিষ্য হয়েছে, সে তাঁর পূর্ণানুগত্যে থাকবে। স্বতন্ত্রতা থাকলে শিষ্যপদবাচ্য হবে না। মন্ত্র নিতে পারে, দীক্ষা নিতে পারে, যাদি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য বা শাসন স্বীকার না করে, তাকে প্রকৃত শিষ্য বলা হবে না। গুরুদেবের বহু সম্পত্তি আছে। তার বাংশে জন্মগ্রহণ করলে (তাঁর শিষ্য বা সন্তান হলে) তাঁর সম্পত্তি অধিকার লাভ করা যায়। গুরুদেবের সম্পত্তি বলতে মঠ, মন্দির, দালান-বাড়ী, টাকা-কড়ি নয় ; তাঁর সম্পত্তি হল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম।

দীক্ষার পর কি ? শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন ও সেবা করতে হবে। প্রিয়তার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে, প্রাণের রস মাখিয়ে তাঁর সেবা করতে হবে। তিনি কিসে সুখী হন, সে বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করতে হবে। তাঁর সুখবিধানে তৎপরতা এবং তাঁর সুখের দিকে নজর থাকা চাই। তাঁর সুখের জন্য স্বার্থত্যাগ, তাঁর সুখের জন্য সেবা।

সন্ন্যাসীরা চারিপাশে আগুন জ্বেলে মাঝখানে বসে থাকেন। পাঠকীর্ত্তান, হরিসেবা, গুরুসেবাই আগুন। এই সেবারূপ ধুনী জ্বেলে রেখে জীবনে সাধনার পথে অগ্রসর হতে হয়।